রচনাসমগ্র | ৪

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

এই খণ্ডের ৯টি গল্পের দুটি—"সন্তু" এবং "ঈদ"—ছাড়া বাকীগুলো *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* থেকেই নেওয়া। পূর্বোক্ত গল্প দুটি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার ছোটদের পাতা "মুকুলের মহফিল" থেকে সংগৃহীত। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এই গল্প দুটিই ইলিয়াসের প্রাপ্ত গল্পগুলির সবচেয়ে পুরনো। কবি-গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দ জানান যে, "শোষিত বকুল" নামে ইলিয়াসের আরেকটি গল্প বেরিয়েছিলো জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সম্পাদিত ছোট ম্যাগাজিন *পরিচয়*-এ। সম্ভবত ১৯৬০-৬২ সালের কোনো এক সংখ্যায় বেরিয়েছিলো তা। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এই পত্রিকার কোনো কপির সন্ধান মেলেনি।

এই লেখাগুলির অধিকাংশই ইলিয়াস গ্রন্থাকারে ছাপতে চাইতেন না; বস্তুত তিনি প্রবলভাবে বিরোধিতাই করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর লেখক আর তাঁর রচনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। বেগানা হাতে পড়ে তারা যেমন বিভিন্নভাবে পঠিত এবং বিশ্লেষিত হয়, তেমনি লেখকও হয়ে যান একীভূত তাঁর পাঠকের সারিতে। অশরীরী অবয়বে পাঠকের কি সম্পাদকের কি প্রকাশকের কাতারে দাঁড়িয়ে লেখক অসহায়ভাবে দেখেন তাঁর লেখা নিয়ে পাঠকের/সম্পাদকের/প্রকাশকের মন্তব্য।

(অপর ফ্ল্যাপে দেখুন)

ISBN 984 410 417 3

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ৪

সম্পাদনা ও ভূমিকা

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

দ্বিতীয় মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১৩
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৬৮৭৭৩ ৭১৭৫২২৭
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
 াকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 417 3

AKHTARUZZAMAN ELIAS RACHANASAMAGRA 4 (Complete works of Akhtaruzzaman Elias 4) edited and with an introduction by Khaliquzzaman Elias. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Two Hundred and Fifty only.

ভূমিকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-৪এ সেই সব রচনাই গ্রন্থিত হলো যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো কিন্তু দু একটি গল্প সংকলন ছাড়া ইলিয়াসের জীবদ্দশায় কোনো পুস্তকে স্থান পায়নি। বর্তমান খণ্ডের ৯টি অগ্রন্থিত গল্পের ৭টি বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারিতে অন্যান্য নানা ধরনের লেখার সঙ্গে *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* শিরোনামে প্রশান্ত মৃধার গ্রন্থন ও সম্পাদনায় প্রকাশ করেন ঐতিহ্য। এই খণ্ডের ৯টি গল্পের "সন্তু" এবং "ঈদ" ছাড়া বাকীগুলো *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* থেকেই নেওয়া। পূর্বোক্ত গল্পদুটি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার ছোটদের পাতা "মুকুলের মহফিল" থেকে সংগৃহীত। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত এই গল্প দুটিই ইলিয়াসের প্রাপ্ত গল্পগুলির সবচেয়ে পুরনো। কবি-গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দ জানান যে, "শোষিত বকুল" নামে ইলিয়াসের আরেকটি গল্প বেরিয়েছিলো জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সম্পাদিত ছোট ম্যাগাজিন *পরিচয়*-এ। সম্ভবত ১৯৬০-৬২ সালের কোনো এক সংখ্যায় বেরিয়েছিলো তা। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এই পত্রিকার কোনো কপির সন্ধান মেলেনি।

এই লেখাগুলির অধিকাংশই ইলিয়াস গ্রন্থাকারে ছাপতে চাইতেন না; বস্তুত তিনি প্রবলভাবে বিরোধিতাই করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর লেখক আর তাঁর রচনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। বেগানা হাতে পড়ে তারা যেমন বিভিন্নভাবে পঠিত এবং বিশ্লেষিত হয়, তেমনি লেখকও হয়ে যান একীভূত তাঁর পাঠকের সারিতে। অশরীরী অবয়বে পাঠকের কি সম্পাদকের কি প্রকাশকের কাতারে দাঁড়িয়ে লেখক অসহায়ভাবে দেখেন তাঁর লেখা নিয়ে পাঠকের/সম্পাদকের/প্রকাশকের মচ্ছব। জীবিত মানুষের মস্তিস্কে তিনি জারিত হন, আবার নতুন প্রাণও পান। এবং এভাবেই একাত্ম হন পাঠকের মননে। যে-কোনো গতায়ু লেখকের মতো ইলিয়াসের ভাগ্যেও এমনটিই ঘটছে। তবে কালানুক্রমিক এইসব রচনা প্রকাশের

অন্তত একটি গুরুত্ব আছে; আর তা হলো এ থেকে ইলিয়াসের ক্রমবিকাশের একটি মানচিত্র পাওয়া যায়। তরুণ বয়সের প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে লেখা, অবসর সময়ের লেখা, হেলা-ফেলা করে লেখা, আঙ্গিক শব্দচয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন থেকে লেখা, ছোটদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা মাথায় রেখে লেখা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লেখায় ইলিয়াসের মানসিক বিবর্তনের যে ধারা তারই একটি পরিচয় রচনা সমগ্র এই ৪র্থ খণ্ডে পাওয়া যাবে।

সংকলিত গল্পগুলোর দুটো—"সন্তু" এবং "ঈদ"-এ ইলিয়াসের প্রাথমিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। ভাষা এবং কাঠামোর, চরিত্র এবং সংলাপের একটা নড়বড়ে কিন্তু একই সঙ্গে সচেতন নির্মাণ প্রয়াস বেশ স্পষ্ট। এই দুই গল্পের পর সম্ভবত বিদেশী গল্প পাঠের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় "বংশধর" এবং "তারাদের চোখ" গল্প দুটোয়। কাহিনী-প্রধান হলেও এই দুই গল্পে কাহিনী এবং চরিত্র ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে এবং গল্পকারও কাঁপা হাতে তাদের আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন। এরপরের তিনটে গল্প—"অতন্ত্র," "স্বগত মৃত্যুর পটভূমি," "নিশ্বাসে যে প্রবাদ"—এক নুতন সম্ভাবনাময় লেখকের আবির্ভাব ঘটায়। ভাষা, বাক্যগঠন রীতি, শব্দ চয়ন ইত্যাদিই গল্পের কাঠামো ছাপিয়ে ওঠে। চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণেও ইলিয়াস হয়ে ওঠেন সক্রিয়। এই গল্পত্রয়ীকে ইলিয়াস কোনো সংকলনে স্থান না দিলেও সম্ভবত "নিরুদ্দেশ যাত্রা" গল্পটির সঙ্গে মিলে এরা একটি স্বতন্ত্র গল্পসংকলন তৈরি কতে পারতো। কিন্তু এই রচনা সমগ্রর কোনো গল্পই পরিণত ইলিয়াসের শৈলী, মেজাজ ইত্যাদি তেমন ধারণা করে না যেমন করে "চিলেকোঠায়" এবং "পরিচয়" গল্পদুটো। *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৪) উপন্যাসের তথা পরবর্তীকালের অনেক গল্পেরই প্রারম্ভিক রেশ পাওয়া যায় এই দুই গল্পে।

অগ্রন্থিত ছোটগল্প ছাড়াও এই খণ্ডে বিশ্ব সাহিত্য থেকে গৃহীত আরো ৯টি গল্পের স্কুলপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত হলো। *মৈমনসিংহ গীতিকা, মহাভারত, ইলিয়াড, শাহনামা, আরব্য রজনীর গল্প*, শেক্সপীয়রের *টেম্পেস্ট*, ডিকেন্সের *ডেভিড কপারফিল্ড*, জুলু কাহিনী, ও চাকমা রূপকথার গল্প নিয়ে সহজ ভাষায় বলা এই কাহিনীগুলো বেশ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি ইলিয়াসের যে ভালোবাসা তার পরিচয় পাই যত্নের সঙ্গে লেখা এই সব গল্পের পরতে পরতে। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠিত চিরায়ত সাহিত্যের কাতারে বাঙলা, জুলু এবং চাকমা লোককাহিনীকে স্থান দিয়ে ইলিয়াস হয়তো একথাই বোঝাতে চান যে মানুষের মুখে মুখে দীর্ঘকাল জুড়ে প্রচলিত যে কোনো কাহিনীই চিরন্তন সাহিত্যের অন্তর্গত।

সনাতন সাহিত্যের স্কুলপাঠ্য সংস্করণগুলির মতো আরো কিছু লেখা ইলিয়াসের টাইপ করা কাগজপত্রে পাওয়া যায়। এই সব রচনা আরো ছোটদের জন্য, সম্ভবত ক্লাস ফোরের শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছিলো। এই লেখাগুলির শিক্ষণীয়

দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। "মহানবীর কথা"য় যেমন হাদিসের একটি কাহিনী অবলম্বনে হজরত মোহাম্মদ-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানানো হয়েছে, তেমনি "বেগম রোকেয়া"র কাহিনীতেও মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তার কথা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। আবার "নাটোর ঘুরে আসি" এবং "ঢাকার চিঠি"তে আমাদের দেশের দুটো শহরের কিছু ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনের প্রতি শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর "বই পড়ার আনন্দ"য় তাদের কেবল রূপকথার গল্প পাঠেই নয়, কিংবা রবীন্দ্র-নজরুল-সুকুমার রায়ের কবিতার প্রতিই নয় বরং বিজ্ঞান পাঠেও আকৃষ্ট করা হয়েছে।

লিরিক (১৯৯২) পত্রিকার সাক্ষাৎকারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন যে তিনি মাঝে মাঝেই কবিতা লেখেন, বিশেষ করে সামাজিক অনুষ্ঠান, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়ের জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কবিতা, ছড়া লিখে তিনি আনন্দ পান। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলিয়াসের কবিতার সংখ্যা নেহায়েতই কম। ষাটের দশকে *স্বাক্ষর* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন হয়তো কিছু রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন। এ সময়ের একটি কবিতা "স্বপ্নে আমার জন্ম"-এ আঙ্গিক নিয়ে খেলা করতে দেখা যায়। কোনো কবিতায় হতাশা এবং নিজেকে নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপও লক্ষণীয়। এ ছাড়া *খোয়াবনামা*-য় তিনি পুঁথির অনুকরণে যে সব চমৎকার কাব্যকলার অবতারণা করেছেন তার সবই তাঁর নিজেরই রচনা। ওই উপন্যাসে কুলসুমের সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য দুটি চরণের খোঁজে গ্রামীণ কবি কেরামত আলি যে কষ্টকর পথে হাতড়ে পথ চলে এবং শেষে চরণদুটি অবমুক্ত করতে সক্ষম হয় তা যে কোনো কাব্যসৃষ্টিরই সনাতন পথ। এই পথে চলার অভিজ্ঞতা ইলিয়াসের সারা জীবনেরই। আসলে আলাদা করে ইলিয়াসের কবিতা লেখার প্রয়োজন হয় না; গদ্যে তিনি যেমন প্রচুর উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যক্ত করেন, যেমন কাব্যিক পরিমণ্ডল আর চিত্রকল্প নির্মাণ করেন বিশেষত *চিলেকোঠার সেপাই*, *খোয়াবনামা* আর ছোটগল্পে, তাতে তাঁর অন্তর্গত প্রাণে যে এক নিভৃত কবিরই অধিবাস তাতে সন্দেহ নেই।

অনুবাদকর্মে ইলিয়াসের উৎসাহ ছিলো কম। তবে ব্লেইক, ইয়েটস, এলিয়ট, অডেন, ডিলান টমাস, কামিংস, লাওয়েল প্রমুখের কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তিনি। জন ডান, টেনিসন—এঁদের কবিতার দু একটি চরণ তাঁর লেখায় আত্মীকৃত হয়ে প্রকাশিত হলেও খুব আগ্রহ নিয়ে তিনি কখনো কবিতা বা গদ্য অনুবাদে নিয়োজিত হন নি।

স্বাক্ষর পত্রিকায় ছাপা ডিলান টমাসের কবিতাটি এবং এই খণ্ডে প্রকাশিত "ঝড়" গল্পে এরিয়েলের গান ও প্রসপেরোর বিদায় বাণীর কিয়দংশ ছাড়া আর কোনো অনুবাদ তিনি ছেপেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ইলিয়াসের টাইপ-করা এবং হাতে লেখা কাগজপত্র থেকে পাওয়া গেল "বেহেশতের কুঞ্জি" নামে একটি উপন্যাসের প্রারম্ভভাগ। উপমহাদেশের স্বরাজ,

অসহযোগ, খিলাফত ইত্যাদি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সম্ভবত তিনি এই উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রথম দুই পরিচ্ছেদের পর লেখা আর বেশি এগোয়নি। তবে অনেকগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে পরিমার্জনার ধরন দেখে মনে হয় তিনি কাহিনীর একটি স্পষ্ট রেখা ফোটানোর এবং চরিত্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ পোক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় চরিত্রগুলো যেন নিজেরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, লায়েক হয়ে উঠতে পারে, তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। স্থান, কাল এবং চরিত্র ইলিয়াসের উপন্যাসে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। এই পাণ্ডুলিপির শুরুতেই বার বার ঘসামাজা করে তিনি হয়তো স্থানের মর্যাদা দেওয়ার জন্য স্থানবোধ কিংবা স্থানের কাব্য, কালের ধারণা, এবং চরিত্রের শৃঙ্খলা অর্জনের চেষ্টা করছিলেন।

"বেহেশতের কুঞ্জি"র খসড়া ছাড়াও ইলিয়াস আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামের এই উপন্যাস একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে খসড়া আকারে থাকায় তাকে আর এই খণ্ডে স্থান দেওয়া গেল না। ডায়েরির একটি দুটি পাতায় সেই পরিকল্পনার নিদর্শন থাকায় *রচনাসমগ্র* ৫ম খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত করাই যথার্থ বলে মনে হয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-৪ প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধনবাদ দিতে গিয়ে প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত মাহবুবুল আলমকে। ইলিয়াস সম্পর্কিত অনেক কিছুই জানার জন্য আমাকে শরণাপন্ন হতে হয়েছে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির। এছাড়া ইলিয়াসের এক সময়ের সহকর্মী অধ্যাপক শফিউল আলম তাঁর চিরায়ত সাহিত্য এবং ছোটদের জন্য লেখা দ্রুতপঠন সহপাঠ প্রকাশের বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আর একজন যিনি আমাকে নানা সময়ে তথ্য, ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি ইলিয়াসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিশিষ্ট কবি-গবেষক-কথাশিল্পী এবং বর্তমানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কলার-ইন-রেসিডেন্স অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ। দেশের বনেদি প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্সের আগ্রহ ও ঘনঘন তাগিদ ছাড়া এই খণ্ড প্রকাশিত হতো না। তাঁদেরও ধন্যবাদ।

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

ইংরেজি বিভাগ
নর্থ সাউস ইউনিভার্সিটি
বনানী, ঢাকা

সূচিপত্র

অগ্রন্থিত ছোট গল্প

সন্তু

ছুটিতে বাড়ি এসেছে আতিক। আসার দুদিন পরই আম্মাকে বলল, "আম্মা, আজ বেলা দশটার ওদিকে সন্তু নাপিত আসবে তো? আহসান উল্লাকে একবার পাঠিয়ে দাও না; 'গলাচিপা' থেকে সন্তুকে ডেকে আনবে।"

সন্তুই এ গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকের মাথার চুল কাটে। অবশ্যি পাশের গাঁয়ে আর একজন নাপিতও আসে যায়; কিন্তু আতিক ঐ সন্তু ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চুল কাটাবে না। অথচ, সন্তু নাপিত চুলও ফ্যাশন করে কাটে না।

শহরে কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হবার পর আতীকের বেশ-ভূষা, পোশাক পরিচ্ছদের চাক-চিক্য বেড়ে গেছে অনেক; জুতোও পরে খুব দামী, একটা কলমও থাকে তার বুক-পকেটে সব সময়ের জন্যই। কিন্তু কদম ছাট করে চুল-কাটা সে ছাড়তে পারল না। সেলুনে গিয়ে আয়নার সামনে বসে সে একদিন সখ করেও চুল কাটল না।

আতিক বোর্ডিং-এ দেখেছে তার রুম-মেটরা সব বাড়ি যাবার আগে আগে সেলুন থেকে চুল কেটে নেয়। অনেককেই সে বলতে শুনেছে, "এই ব্যাটা গাঁয়ের নাপিতগুলো চুলটুল কিছু কাটতে পারে না; না আছে ঢঙ, আর না আছে একটা স্টাইল। তাইত এখান থেকেই চুলটুল কেটে নিয়ে যাই!"

"আতিক ভাই যে গো! এসো, আমার আবার অনেক জায়গায় যেতে হবে।" সন্তু নাপিত এসেছে। আতিক একটা টুল নিয়ে বাইরে আমগাছটার নিচে গিয়ে বসে। এ জায়গাটা ভারি নিরব; একটু দূরে দেখা যায় বিশাল ধান ক্ষেত, তার উত্তরে একটা বিল।

সন্তু নাপিত কিন্তু খুব গল্প বলতে পারে। আতিক কত যে গল্প তার কাছ থেকে শুনেছে! অনেকদিন আগের সব কাহিনী, গপ্প।

২৫/২৬ বছর আগে কোন এক বিলেতি সায়েব এসে উঠেছিলেন গলাচিপার ডাক-বাঙলোতে। সায়েবের দরকার হল দাড়ি কামানোর। ডাক পড়ল সন্তু নাপিতের। বাবা! এ তল্লাটে কে আছে, যে সন্তু নাপিতের চেয়ে ভাল চুল কাটে?

সন্তুকে দেখে সায়েব খুশি হয়ে পরদিন ভোরে এসে তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেবার জন্য বললেন। সে সময় সন্তুর বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। খুউব ভোরে—শেষরাত থাকতেই সন্তু ঘুম থেকে উঠল। ক্ষুর-টুর খুব ভালরকমে ধার দিয়ে, গোসল-টোসল করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সে গেল সায়েবের কাছে। তখনও সায়েব ঘুম থেকে ওঠেননি। উঠতেও অনেক দেরি। কেবল রশীদ বাবুর্চি সায়েবের জন্য শাহী টুকরা করবে, পাউরুটির স্লাইস করে নিচ্ছে। সন্তুর কি খেয়াল হয়, চুপচুপ করে সায়েবের শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত সায়েবের গালে ক্ষুর লাগিয়ে মসৃণ করে কামিয়ে দেয় তাঁর মুখ; দিয়েই ভয়ে দৌড় দিল ঘর থেকে।

সায়েব ঘুম থেকে উঠে টের পান তাঁর দাড়ির অস্তিত্বহীনতার কথা। কে কামিয়ে দিল?

সবাই গিয়ে ধরে আনল সন্তু নাপিতকে। ভয়ে ভয়ে সন্তু এল। সায়েব খুব খুশি হয়ে দশ টাকার একখানা নোট ছুড়ে দিলেন তার দিকে।

"উঃ, কি নাপিত বাবা! এক ঘণ্টার কমে চুল কাটতেই পারে না। শুধু গপ্পই করবে, চুল কাটবে কখন?" বাড়ির চাকর আহসান উল্লাহ বলতে থাকে, "আতিক ভাই, আম্মা ভাত নিয়ে বসে আছেন, আরিফ ভাই, শহীদ ভাই, রীনা আপা এদের সব খাওয়া হয়েই গেল, আর আপনার গোসলই হল না!" আতীকের চুল কাটা শেষ, সে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

আতীকের বন্ধ ফুরিয়ে যায়, শহরে ফিরে যায় সে। রুমমেট মনোয়ারকে একদিন সেলুন থেকে চুল কেটে আসতে দেখে আতীকের কি মনে হল সেও ছাটবে ওমনি করে তার চুল। মনোয়ারকে দেখে তার চুল-কাটা ভালরকমে পরখ করে নিয়ে আতিকও স্থির করে ফেলে যে সেও এবার বাড়ি গিয়ে সন্তু নাপিতকে দিয়ে ঠিক অমনি করেই চুল কাটাবে।

"ক্যাচ ক্যাচ, কিচির মিচির করে" আতীকের চুল কাটছে সন্তু, আতিক শবেবরাতের সাতদিনের বন্ধে বাড়ি এসেছে কি না। চুল কাটার সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলে সন্তুর, "বুয়েছ কি না, আতিক ভাই, ষোল বছর আগেও আমি নিজে কুমড়োতলার হাট থেকে সাত টাকা মণ দরে চাল কিনেছি—মা গো! দুই পয়সা হালি পর পেঁয়াজ, আদা, মরিচ সবই কিনতি ...।"

"আহ্, ওরকম করলে কেন? বললাম না চীপ কেটে দিও না; দূর! তোমাদের এইসব গেঁয়ো নাপিত! আর চুলই কাটব না, যাও!" সন্তু অতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলে যায়। পথে তালুকদার বাড়ি থেকে বশির ডাকে, তাদের বাড়িতে চুল কাটতে হবে। সন্তু জবাব দেয়, "না গো! চুল-কাটা ছাড়ি দিইছি!"

* * *

এরপর শহরে গিয়ে আতিক সেলুনে যায়, আর সেখান থেকে সামনের দিকে বড় আর ঘাড়ের ওখানটায় ছোট করে এলবার্ট ছাট ছেটে আতিক ফেরে। ক্লাসের বন্ধুরা অবাক হয়; খুশি হয়ে বলে, "গুড্, গেঁয়ো চুল-ছাটা ছেড়ে দিয়ে আতিক আজ অনেকটা কালচারড (cultured) হয়েছে।"

আতীকের কিন্তু ভাল লাগে না। তার কেবল মনে পড়ে, যদিও চুলটা ছেটেছে ভালই, তবু সন্তুর কাছে কি যেন আছে। তার কথাগুলো ভারি সুন্দর, কত গপ্পই করে।

* * *

এরপর বাড়ি আসার সময় চুল কাটে না সে। সন্তুই কেটে দিক এবার; তার কাছেই ভাল। ট্রেন থেকে আতিক দেখে ধানক্ষেত, সর্ষের ক্ষেতগুলো খা-খা করছে। বড় আকাল হচ্ছে এবার।

স্টেশনে নেমে দেখে, উঃ! এই কি গাঁয়ের অবস্থা! কত লোক ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আসে। ঐ তো সন্তুর মেজ ছেলেটা আর তার মা, ভিক্ষের টিন হাতে। আতিক ডাকে, "বিশু!" তারা আসে না, চয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আতিক ভাবে আর কেউ বুঝি বা।

আসার দুদিন পর আম্মাকে বলে একবার সন্তুকে খবর দিতে, তার চুল বড় হয়ে গেছে। আম্মা বলে, "সন্তু? সেই সন্তু নাপিত, সে তো মারা গেছে, বাবা! তিন দিন কিছু খেতে না পেয়ে মারা গেল। ছেলেমেয়েরা তো ভিক্ষেয় বেরিয়েছে এখন।" "মারা গেছে! উঃ!" হাতে মুখ ঢেকে আতিক বলে, "খবরটাও দাওনি। টেলিগ্রাম করলে না কেন?" আম্মা অবাক। নাপিতের মৃত্যুসংবাদ কবে টেলিগ্রাম মারফত ...!

আতিক এখন সেলুনেই চুল কাটে। এখানে গেঁয়ো আলোচনা হয় না। আগন্তুকরা গল্প করে চলচ্চিত্র নিয়ে, কেউ কেউ ঝগড়া করে রাজনীতি [নিয়ে], আবার অনেকেই বা আলোচনা করে ওয়েস্টইন্ডিজের সঙ্গে প্রথম টেস্ট ম্যাচে হানিফ মোহাম্মদের অপূর্ব কৃতিত্ব নিয়ে। আতিকও সমভাবেই যোগ দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে পড়ে সন্তু নাপিতের কথা। তাদের বাড়ির সামনে যেখানে চুল কাটত সন্তু, সেই ত্রিমোহিনী গ্রাম, সরু পায়ে-চলা পথ, সামনে ধানক্ষেত, বিল, একটু দূরে সর্ষের ক্ষেত আর তার ওপারে কাশবন, যেখানটায় আকাশ আর ধরিত্রিতে অপূর্ব মিলন।

সন্তু নাপিত চলচ্চিত্র নিয়ে কিছুই জানত না, ক্রিকেটের নামও বোধহয় শোনেনি, প্রধানমন্ত্রি কে বলতে পারত না, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদের কথাও জানত না, দশ আনা-ছয় আনা করে চুল ছাটতে গিয়ে ভুল হয়ে যায় তার। কিন্তু কি যেন আছে তার কাছে চুল কাটানোর মধ্যে। কত কথা, গ্রামের পুরনো গপ্প, সাধারণ জীবনযাত্রা, সেসব শুনতেই যেন ভাল। এই সময় সেলুনের নাপিত যদি জিজ্ঞেস করে যে তাদের স্কুলের সঙ্গে আর্মানিটোলা স্কুলের হকিম্যাচটা কবে হবে, সে চুপ করে থাকবে, অথচ সে একজন বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড়।

সেদিন পড়াও ভাল হয় না। তুখোড় ছাত্র আতিকের কাছে শনিবারের টাস্ক সুদকষার সাধারণ অঙ্কগুলোও কঠিন মনে হয়। ভূগোলে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর নাম আর মুখস্ত হয় না, বাংলা পদ্যের ব্যাখ্যাটা বুঝেই উঠতে পারে না—যেন শব্দগুলোও বা কত শক্ত। সে পড়ায় মনই দিতে পারে না, কেবল মনে করে সন্তু নাপিত, ত্রিমোহিনী আর গলাচিপার কথা, সন্তু যেন এসে আবার চুল কাটতে শুরু করে আতিকের।

ঈদ

রজবের আম্মা ফাতিমা চাকরি করত এক বড়লোকের বাড়িতে। ঠিকা ঝি। ভোর হতে না হতেই ঘুম থেকে উঠে মোড়ের কল থেকে মুখ ধুয়ে চলে যায় মনিব বশির চৌধুরীর বাড়িতে। সারাদিন রান্নাবান্না কাজকম্ম সেরে রাত এগারোটার ওদিকে ফেরে বাড়িতে। বাড়ি মানে বস্তি এলাকার একটা স্যাঁতসেতে অন্ধকার খুপরি।

রজবের আব্বা খুরশিদ খুলনার এক মিলের শ্রমিক। ছুটিছাটার মধ্যে এখানে এসে থাকে।

সেদিন রমজানের শেষ দিন। তার পরদিনই ঈদ। অর্থাৎ, সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদের আনন্দের দিন, জাতীয় মিলনের দিন। চাঁদ দেখা অবধি রজবের মন আনন্দে উথলে উঠছে। কালকের কথা মনে হচ্ছে—নামাজ পড়া, কোলাকুলি করা—ওঃ! এইসব কল্পনা করলে এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় সমস্ত হৃদয়ের মধ্য দিয়ে। আব্বা এলে আরও আনন্দ হত।

সেদিন রাত্রে ফাতিমা আর ফেরে না। ঈদ উপলক্ষে চৌধুরীবাড়িতে কাজ অনেক বেশি ছিল কি না! ভোর হওয়ার আগে আগে সে ফেরে। রজবকে বলে, "রজইবা, বাবা, চলতো আমার লগে, ওহান থেনে খাইয়া দাইয়া সাবের পোলাপানের লগে নামাজ পাইড়া আসিস! তর বাপও আইল না।"

রজব ফাতিমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি যায়। মোড়ের কলটা থেকে দুজনেই মুখহাত ধুয়ে নেয়। একটু দেরিই হয়ে যায়। তাই চৌধুরী বাড়ি পৌছতেই গিন্নী বলে ওঠেন, "ইডা তুমার কেমন কাম গো! এতুক্ষণে আইলা, তাও পোলারে লগে লইয়া! জলদি কর, নামাজের ওক্ত তো অইয়াই গেল!"

রজব ভীষণ সংকুচিত হয়। আম্মাটাও কেমন—এত কথা হজম করতে পারল!

সবাই যখন ঈদগায় যেতে নতুন জামাকাপড় পরছে, ফাতিমা রজবকে নিয়ে গিন্নীর কাছে গেল। তাঁর কাছে রজবের জন্য একটা পুরনো কাপড় চাইল এত কাকুতিমিনতি করে যে রজবের ভয়ানক লজ্জা আর রাগ হতে লাগল। অনেক

আরাধনার পর গিন্নী বিরক্ত হয়ে একটা কলার-ছেঁড়া জামা দিলেন তার দিকে। সে সার্টটায় বোতাম ছিল না একটাও।

রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে রজবের আম্মা পরিয়ে দেয় তাকে সার্টটা—রজবের ইচ্ছা ছিল না পরার; কি দরকার ছিল গিন্নীর কাছ থেকে এত বকাঝকা শোনার! জামা পরিয়ে দিয়ে একটা বাটিতে একটু সেমাই দিয়ে বলে, "জলদি খা, বাবা। গিন্নীমা আইবো!" ছি! ছি! গিন্নীর ভয়ে খাওয়া চলবে না? কার টাকায় ধনী চৌধুরী সায়েব? এর মধ্যেই গিন্নীর পায়ের শব্দ শোনা যায়। "জলদি উঠ, বাইরে যা!" না, উঠবে কেন রজব? কি তার অপরাধ? তবু উঠতে হয়, আম্মা জোর করে উঠিয়ে দেয়। একরকম ঠেলেই বাইরে বের করে দেয়। গিন্নী ঘরে ঢুকে টের পান সমস্ত। ঝেঁঝে ওঠেন, "অ! এমন কইরা রুজই পোলার লাইগা খাবার লইয়া যাও, না?" আর শোনে না রজব। কৈ, ফাতিমা তো নিয়ে যায় না খাবার? এত বড় মিথ্যা কথা!

বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণটার দিকে গিয়ে হাজির হয় সে। সেখানে সায়েবের ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। সবাই নতুন জামাকাপড় পরে তৈরি, ঈদগায় যাবে। রজবকে দেখে হাততালি দিয়ে ওঠে সবাই। শাহেদ বলে, "দেখেছ সব? ওর জামাটায় একটা বোতামও নেই! ওরে ছোড়া, বোতাম ক'টা খেয়েছিস, না?" আর একজন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, "এঃ, কি চুলছাটা! টুপিও নিস নাই একটা?" জমিল তার পায়ে ল্যাং মেরে বলে, "হাফপ্যান্ট পরে কি নমাজ হয় রে ছোড়া?" এবার সমস্ত পুঞ্জিভূত রাগ বাধ ভেঙে পড়ে রজবের। লাফিয়ে পড়ে জমিলের ওপর—গায়ের শক্তি রজবের অনেক বেশি। ওপরতলা থেকে গিন্নী দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন। রজবের চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে থাকেন চড়—ঠাস, ঠাস, ঠাস। বাড়ির সমস্ত লোক ছুটে আসে, নির্দয়ভাবে মারতে থাকে তাকে। চাকরানির ছেলে হয়ে গায়ে হাত তোলে মনিবের ছেলের? এত বড় অপমান সহ্য করবে "বনিয়াদি" চৌধুরী পরিবার!

গণ্ডগোল শুনে ফাতিমাও আসে। এসে সব শুনে রজবকে মারতে থাকে। রজব বলে, "আম্মা, হুন না! আমার দুষ নাই!" শোনে না ফাতিমা। বলে, "মরস না তুই? মরলে আমার জান জুড়ায়!"

রজব বাড়ি ফিরে আসে। একটু নিরবতা চায়—যেখানে বসে কাঁদবে একটু। বাড়ি এসে জীর্ণ কাঁথায় মুখ লুকিয়ে অঝর নয়নে কাঁদতে থাকে। আম্মা এমন তার, তবু মনে হয় আম্মার কথাগুলো যেন তার হৃদয় থেকে নয়—মুখস্ত করা।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে ফাতিমা। মাটির পিদিমটা জ্বালিয়ে ঘুমন্ত ছেলের মুখটার দিকে চেয়ে দেখে কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়েছে সে। ফাতিমা শুয়ে পড়ে। রজবকে কাছে টেনে নেয়। হু হু করে কেঁদে ওঠে ফাতিমা। পেটের দায়ে তাকে ছেলের ঈদ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিতে হয়। রজব জেগে যায়। আম্মা কি আবার আগের আম্মাই হয়ে গেছে! তার আম্মা কেঁদেই চলে। ফাঁড়ি থানাটায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। বারোটার পর থেকে ঈদের দিন চলে গেল। ভালই হল। কোন দরকার নেই ঈদের। রজবেরও না, তার আম্মারও না।

বংশধর

মফস্বল শহরের মাঝারি আকারের হাসপাতালটা আবার এই অপরাহ্ণে হয়ে উঠল সরগরম। ডাক্তার, নার্স আর ঝাড়ুদারদের ব্যস্ততা বেড়ে গেল অনেক। আমাদের চলাফেরা হলো ত্বরিতবেগে।

শাড়ির উপর নার্সদের গাউনটা চাপালাম আরো এঁটেসেঁটে। অগ্রসর হলাম দুই নম্বর ক্যাবিনের দিকে।

স্ট্রেচারে করে আবার নিয়ে আসা হয়েছে রোগীকে। কপালের ব্যান্ডেজ রক্তে রঞ্জিত। রেশমের মতো কেশরাজির অগ্রভাগের কয়েকটা গুচ্ছও ব্যান্ডেজের আড়ালে।

খাটে শুইয়ে দেবার পর মুখমণ্ডল ভালো করে দেখবার সুযোগ ঘটল। ইন্টারন্যাশনাল জুট কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি জর্জ উইলিয়াম পেরিথের স্ত্রী মেরী পেরিথ। মাদ্রাজি ঢঙে রৌদ্রবরণ শাড়ি জড়িয়ে আছে দুগ্ধধবল মসৃণ শরীরে। অজ্ঞান লিপস্টিক-ঘষা বন্ধ ঠোঁট-দুটিতে যেন অব্যক্ত বাণীর ভাষাহীন প্রকাশ। হাল্‌কা গাছপাতা রঙের সুট আর জবাবরণ ডোরাকাটা টাই পরিহিত জর্জ উইলিয়াম পেরিথ উপবিষ্ট নিকটস্থ চেয়ারটায়। চোখে-মুখে আশা সংশয় প্রস্ফুটিত। জানা গেল ঘন্টাখানেক আগে বাথরুমের দরজায় পড়ে যাওয়ায় কপালটা ঠেকে চৌকাঠে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

ওষুধপত্র নিয়ে আসা হলো। সিভিল সার্জনের আগমন হলো অতি সত্বর। যন্ত্রপাতির ঠুংঠুং শব্দ বাড়তে লাগল ক্রমশ। ব্যান্ডেজ খুলে ওষুধপত্র দেয়া হলো। পুরু তুলোর ওপর। ব্যান্ডেজের পুনর্বন্ধন ঘটল। ইনজেকশন দেবার কিছুক্ষণ পর নিমীলিত আঁখি খুলে ফেলল মেরী। মুখ আর বুকের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেন মিস্টার পেরিথ। মেরী চমকে উঠল যেন। হাত দিয়ে ঠেলে দেয় তাঁকে আতংকভরা দৃষ্টিতে তাকায় চারদিকে। সিভিল সার্জন বললেন, 'মিস্টার পেরিথ, এখন কাইন্ডলি বাইরে যান। পরে আসবেন।' ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রীর পানে একবার করুণ দৃষ্টি দিয়ে বের হন ধীরপদে মিস্টার পেরিথ।

ডাক্তার সাহেব আর আধঘণ্টার মতো অবস্থান করে ওষুধপথ্য সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন আমাকে। ইঙ্গিতে জানালেন আঘাতটা আশংকাজনক কিন্তু!

ঘণ্টা দুয়েক পর উত্তপ্ত দুধ নিয়ে এলাম। মেরীর দৃষ্টি ছাদের কড়িকাঠে নিবদ্ধ। স্থির চিন্তায় মগ্ন হয়তো। স্মিত হাসির সাথে বললাম, 'মিসেস পেরিথ, এবার দুধ খাওয়ার পালা আপনার।'

—'দুধ।' মেরী চেষ্টা করে উঠে বসতে।

—'না, না, মিসেস পেরিথ, উঠতে হবে না। শুয়েই থাকুন না। একটু কাত হলেই চলবে।'

মিস্টার পেরিথ সেদিন রাত্রে ও পরদিন সকালে খোঁজ নিলেন দু'তিনবার।

আলাপে রত ছিলাম মেরীর সাথে। ভিজিটিং আওয়ারের ঘণ্টা হলো। পর্দায় উঁকি দিল উইলিয়াম পেরিথের মুখ। টুল ছেড়ে দাঁড়ালাম। পেরিথের সঙ্গে মেরীর ছোট ভাই জ্যাকসন পেরিথ। পনেরো বছরের ফুটফুটে কিশোর।

—'মেরী, দেখ কে এসেছে।' বলতে বলতে চেয়ারটায় উপবেশন করেন উইলিয়াম।

—'আপা! কাল টেলিগ্রাম পেয়েই ঢাকা থেকে চলে এলাম। কলেজও বন্ধ হচ্ছে শিগ্‌গিরই। কেমন আছ আপা এখন?' জ্যাকসন হাতটা রাখতে চেষ্টা করে ভগনীর হাতে। মেরী নির্বাক। মেরীর দৃষ্টি নিবদ্ধ জ্যাকসনের হাতটা রাখতে চেষ্টা করে ভগনীর হাতে। মেরী নির্বাক। মেরীর দৃষ্টি নিবদ্ধ জ্যাকসনের বিস্মিত মুখের উপর।

—'আপা।' বিস্মিত কণ্ঠ জ্যাকের।

—'মেরী।' স্নেহভরা সম্ভাষণ মিস্টার পেরিথের, 'সোসাইটির সবাই খুব দুঃখিত তোমার এ খবর শুনে। কাল বিকেলে রেভর‍্যান্ড জ্যাক আসছেন দেখতে! তোমার ফ্রেন্ডস্‌দের মধ্যে মিসেস ফস্টার, মিস উইলিয়ম আসছেন।'...

—'না, না। তুমি বারণ করে দেবে আসতে। কোনো ক্রিশ্চিয়ান যেন আসতে না পারেন।' সকলকে স্তম্ভিত করে জবাব দেয় মেরী। আবার চাইল স্বামী আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে, 'তোমরাও এসো না! তোমরাও না। আমি খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান নই। আই হ্যাভ'ন্ট কাম অফ পেরিথ ফ্যামিলি!'

—'আপনারা বাইরে যান, মিস্টার পেরিথ,' বলতে হলো আমাকে, 'মাথায় আঘাত পেলে এমনই হয়ে থাকে। এখন দয়া কোরে সামনে থাকবেন না।"

আরও কয়েকদিন পুনরাবৃত্তি ঘটল এই ধরনের ঘটনার। সিভিল সার্জন উপদেশ দিলেন জর্জ পেরিথকে তাঁর এবং আত্মীয়স্বজনের আগমনটা সাময়িকভাবে বন্ধের জন্যে। আমার ওপর বর্ষিত হলো আদেশ। সব সময়ের জন্যে উপস্থিত থাকতে হবে মেরীর পার্শ্বে। প্রয়োজন আন্তরিক সেবা।

অদূরেই গির্জায় বাজে ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি। কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসে প্রার্থনার কলি। যীশুর প্রশস্তি। মেরী যেন অস্বস্তি বোধ করে। দু'হাতে কান চেপে ধরে। শব্দটা না যায় কানে।

এক বর্ষণমুখর অপরাহ্ন। ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছিল সেই ঘণ্টাধ্বনি। আজকের শব্দটা যেন সিক্ত। সদ্যস্নাতার মতো কমনীয়। সেই রিমিঝিমি বর্ষণমুখর অপরাহ্ন মেরীর এক দুর্বল মুহূর্ত। আবেগময় কণ্ঠে ব্যক্ত হলো অব্যক্ত কথা—যা এতদিন গুমরে মরছিল অন্তরে।

লর্ড হেরিক পেরিথ। পেরিথ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিলেতে স্বীয়ধর্ম প্রচারকল্পে প্রচেষ্টা, এর প্রতি অগাধ আনুগত্য প্রভৃতির জন্যে রেভর‍্যান্ড পেরিথ হলেন সরকার থেকে লর্ড। সতেরোশ আটান্নর প্রথমার্থে মুখ্যত খ্রিস্টধর্ম প্রচারকল্পে আগমন এদেশে। লর্ড ক্লাইভের সাথে বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরই সাহায্যে আপনাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন এ দেশে। নিষ্ঠা ছিল। আত্মসংযমও। বিশেষত নিম্নশ্রেণীভুক্ত উৎপীড়িত হিন্দু জনতা গ্রহণ করল এ ধর্ম দলে দলে।

লর্ড পেরিথের দু'জন পুত্রের মধ্যে একজনের অপমৃত্যু ঘটে মাত্র একুশ বছর বয়সে। সাপে কেটে। কিংবদন্তি প্রচলিত জনসন পেরিথ চ্যুত হয়েছিল পিতার আদর্শ হতে। ধর্মকে আঁকড়ে ধরেনি নিবিড় করে। আবার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এক সদ্য খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী হিন্দু যুবতীর সাথে। তাই এ অপমৃত্যু।

এরপর কিন্তু পেরিথ বংশের ঐতিহ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। ধর্মে অটুট বিশ্বাস ধর্মের বিধিনিষেধ পালনে পেরিথ বংশের অপরিণত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে থেকে অশীতিপর বুড়ো পর্যন্ত যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা অবিস্মরণীয়। এখনো অটুট। পাদরিও মনোনীত হতো এ বংশ থেকেই।

প্রথম দু'এক পুরুষের প্রত্যেকের পরিণয় হল বিলেতে। তারপরের পুরুষগুলো আপনাদের বংশের ভেতরেই পরস্পরের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

রেভর‍্যান্ড হেরিক পেরিথ থেকে ষষ্ঠতম অধস্তন পুরুষ হলেন জর্জ উইলিয়াম পেরিথ। জর্জ আর মেরীর পিতা ওয়ালটার পেরিথ আর টমাস পেরিথের সম্পর্ক ছিল ভাইয়ের সম্বন্ধ।

কত কুয়াশাভরা হিমের শীতের প্রত্যুষে জর্জ জেগেছে। বারো বছরের জর্জ। সেই হিমেল ভোরে বারো বছরের বালক গেছে গির্জায়। করেছে যীশুর প্রশস্তি। বিধাতার বন্দনা। অনেকদিনই চমকে উঠেছে। দাদির সাথে মেরীর আগমন হয়েছে যে আরও আগেই। এত ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হলো মেরীর! আট ন' বছরের বালিকা। প্রভাতের সুন্দর প্রকৃতির সাথে আশ্চর্য সাদৃশ্য মেরীর সুপবিত্র সুন্দর কচি মুখের। কচি দু'টো ঠোঁটে উচ্চারিত হয় প্রার্থনার স্তবক।

গির্জা হতে বের হয়ে কোনো কোনো দিন জর্জ মেরীকে পায় তার কাছে। বলেও হয়তো একদিন, 'মেরী, এত ভোরে ঘুম ভেঙে যায় তোমার?'

—'আমি? আমি সে-ই কোন্ ভোরবেলায় উঠি। সূর্য ওঠবার চিহ্ন পর্যন্ত হয়তো নেই।' মেরীর জবাব চোখ দুটো বড় করে, 'দাদির সাথে খু-উ-ব ভোরে চলে আসি গির্জায়।'

—'আমাকে খুব ভোরে জাগিয়ে দিতে পারো মেরী?' বাইরের ঘরটায় আমি শুই। জানলা দিয়ে ডেকে দিও, কেমন?' জর্জের অনুনয়।

খুব প্রত্যুষে জর্জ আর মেরী এক সাথে চলত গির্জার পানে। কোনো ভোরে মেরী ডাকতে গেলে জর্জ বলেছে, 'আঃ! মেরী, আজ না হয় একটু দেরিই হল।' কাত হয়ে শুয়েছে জর্জ।

—'ছি! লর্ড পেরিথের বংশে জন্ম আমাদের। আমাদের কি মানায় ধর্ম পালন করতে ঢিলেমি করলে? জানো জর্জ, লর্ড পেরিথ কখনো ঘুমুতেন না। সারারাত সন অব গডের নাম করতেন।'

জর্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের একগাদা ডিগ্রি লাভ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে পাড়ি দিলেন 'হোমে'। এর মধ্যে মৃত্যু হলো টমাস পেরিথ আর ওয়ালটার পেরিথের। জর্জ এ দেশে ফিরে জুটিয়ে নিলেন উচ্চপদের চাকরি।

একদিন এক আনুষ্ঠানিক ঘটনা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়িত করা হলো। তাঁরা জানালেন শুভেচ্ছা। গির্জার পাদরির মন্ত্র উচ্চারিত হলো গম্ভীর কণ্ঠে। জর্জ উইলিয়াম পেরিথ ঘরে তুললেন মিস মেরী পেরিথকে।

এরপর সূত্রপাত এক সুখের জীবনযাত্রার। প্রত্যুষে রুটিনমাফিক গির্জায় যাত্রা। প্রাণ ঢেলে উপাসনা। তারপর বেলা হলে জর্জের অফিসযাত্রা। মেরীর নিঃসঙ্গ খাঁ খাঁ করা সমস্ত দ্বিপ্রহর। ঘর-দোর ঝাড়ে। বাঙালি গিন্নিতেই রূপান্তরিত হলো নাকি সে! মেরী ভাবে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির দিকে তাকায়, 'সন অব গড! আশীর্বাদ করো লর্ড পেরিথের বংশধর হয়ে যাতে ঠিক থাকি স্বীয় ধর্মে। সেভ দ্য পেরিথ ফ্যামিলি।'

কত রবিবারের আসা যাওয়া। দু'জনে বাড়িতে গল্পে রত থেকেছে দিনমান। গির্জায় গেছে। কোনোদিন-বা ভ্রমণে বেরিয়েছে। বাড়িতে ঐ দিনে কত ভিখেরির আগমন। সব জাতেরই। ভিক্ষে দানে ক্লান্তিই আসে না মেরীর। জর্জ অস্থির 'মেরী, কত দেবে কষ্ট করে? বয়টাকেও তো বলতে পার।'

'ছি জর্জ! যে বংশে আমাদের জন্ম।' ...মেরীর জবাবের সমাপ্তি ঘটেনি পেরিথের কথায়, 'ডার্লিং পার্ডন মি প্লিজ।'

এমনি এক 'সান-ডে'র অপরাহ্ণে ঘরদোর পরিচ্ছন্নে রত ছিল মেরী। রেভর‍্যান্ড জ্যাক পেরিথের আগমন হচ্ছে আজ। সাপারটা এখানেই হবে তাঁর। হঠাৎ একটা পুরনো সুটকেসের ওপর দৃষ্টি পড়ল মেরীর। স্মরণ হলো এটি তার মৃত পিতার। মেরীর কাছেই ছিল। খোলেনি সে কোনোদিন। একটু চেষ্টা করে খোলার জন্যে। সক্ষম হলো না। জর্জ ছিলো ড্রয়িংরুমে সোফায় উপবিষ্ট। মেরীর ডাকে তার সাহায্যের জন্যে উপস্থিত হয়। মেরীর অনুরোধ একটু খুলুক না সে। শ্রদ্ধার সাথে উভয়েই তারা দেখবে পিতার কতকাল পূর্বের জিনিসপত্র। বেদনা আর আনন্দের মিশ্রণে স্মরণ করবে পিতার কথা। মরচে ধরা সুটকেসের তালা খুলতে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। মেরী বলে, 'কিচেন থেকে প্যাস্ত্রি আর কেকগুলো ডাইনিং রুমে আনছি, একটু আসি। জাস্ট টেন মিনিটস।' প্রস্থান করে সে।

জর্জ সক্ষম হয় খুলে ফেলতে কিছু সময়ের মধ্যে। জোরে ডাকে, 'মেরী, দেখে যাও, সুটকেসের ভেতর ডায়েরি একখানা। তোমার আব্বারই বোধ হয়।' ড্রয়িংরুম

হতে এল গম্ভীর পদধ্বনি। রেভর‍্যান্ড জ্যাক পেরিথ। খাতা রেখে দিয়ে জর্জ অভ্যর্থনা জানায় ড্রয়িংরুমে গিয়ে। মেরী 'কিচেন' থেকে চলে আসে এ ঘরেই। রেভর‍্যান্ড বিদেয় নেন রাত দশটায়। জর্জ আর মেরী শুয়ে পড়ে। আগামীকাল তারা পাঠ করবে ডায়েরিটা।

নিঃসঙ্গ অস্বস্তিকর দ্বিপ্রহর মেরীর। করণীয় কিছুই পায় না আপাতত। শুধু পায়চারি ঘর আর বারান্দায়। ঘরটায় হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে পিতার সুটকেসটার পার্শ্বেই লাল মলাটযুক্ত খাতার ওপর। গতকাল পিতার ডায়েরিটা দর্শনের সুযোগও ঘটেনি। এটাই বোধ হয় ডায়েরি।

সোফায় ডায়েরিটা হাতে নিয়ে চিন্তা করে এখন পড়বে কি-না। জর্জের জন্যে প্রতীক্ষা করুক একটু। আচ্ছা মাঝখান হতে পড়ুক মাঝে মাঝে। জর্জ অফিস হতে ফিরলে সবটা পাঠ করা যাবে। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। খুব পুরনো তো নয়। তার পিতা ডায়েরি লিখতেন সেই কবে। হ্যাঁ সত্যি। যত্ন করে রেখে দিলে সবকিছুই ভালো থাকে। হঠাৎ করে মাঝখানে খুলল ডায়েরিটার। পিতার এ হাতের লেখার সঙ্গে সে অপরিচিত। বোধ হয় যৌবনের হবে। পড়তে শুরু করে তারিখের দিকে দৃষ্টি না-দিয়েই। তবে পাতার মাঝখান হতেই বলতে গেলে। মেরী পড়ে :

'আজ মেয়েটার সপ্ত জন্মবার্ষিকী পালন হলো। পাঁচ বছর আগে নিজের পুত্রকন্যার অভাবে ঘরে তুললাম দু'বছরের হিন্দুর মেয়ে। আজও এ মেয়ে জানল না তার ধর্ম কী! সাত বছরের মেয়ে অবিশ্যি কি-ই-বা এমন বোঝে। এত সুন্দর হচ্ছে দিন দিন!' মেরী পড়ে। স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। এ সব কী পড়তে হয় আজ তাকে! পাতা ওলটায়, 'অন্য জাতের মেয়ে। আমাদের ধর্মে এত ঝোঁক! মায়া পড়ে গেছে বড়। ছেলেটা হওয়ার পরও মায়া কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছি না। তবু, জাত ভিন্ন...'। খাতা পড়ে যায় হাত হতে। এ মেয়ে তো সে বই কেউ নয়। জ্যাকসন—তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যাকসনের কথাও উল্লেখ আছে! পেরিথ বংশের সে নয়। খ্রিস্টানও না। পেরিথ বংশের কেউ এদেশীয় যুবতী বিয়ে করলে তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ হবেই। মেরী তবে কেন বিয়ে করল জর্জ উইলিয়ম পেরিথকে! তার এতদিনের বিশ্বাস, নিষ্ঠা সবই কি ভঙ্গুর তবে? মেরী ভাবতেই থাকে। সে যে প্রতারণা করেছে পেরিথ বংশের সাথে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে প্রতারণা করল সে!

যীশুর মূর্তি সামনেই। দৃষ্টি দেবে কি? সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। না। স্পষ্ট বোঝে মেরী যীশু ব্যঙ্গ করছে তাকে। অন্য জাতের মানুষ—তুমি এসেছ পেরিথ বংশজাত হতে। লর্ড হেরিক পেরিথের আত্মা কী বলছে! তুমি আমার বংশের হতে এসেছ ভিন্ন জাতের মানুষ হয়ে!

জর্জ অফিস থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। দু'হাতে মুখ চেপে মেরী বসে। বেশ অবিন্যস্ত।

'মেরী! কী হলো ডার্লিং?' এগিয়েছেন জর্জ তার দিকে। হাত রাখেন মেরীর কেশে। ইলেকট্রিক সকাহতের মতো সোফা থেকে দাঁড়িয়ে যায় মেরী, 'জর্জ! ছুঁয়োনা আমায়! আমি প্রতারক!'

—'মেরী!' বিস্মিত জর্জ অগ্রসর হলেন।

—'আমি অন্য জাতের মেয়ে! আমায় ছুঁয়ো না জর্জ! আমি ক্রিশ্চিয়ান নই!' মেরী ছুটে বারান্দায় বের হয়।

—'মেরী! ডালিং!' ধরতে যান জর্জ পেরিথ। বামেই বাথরুমের চৌকাঠে পা লাগে মেরীর। পড়ে যায়। জর্জ তুলে ধরেন। রক্তাক্ত ললাট। অজ্ঞান।

থেমে যায় মেরী কিছুক্ষণের জন্যে। চেপে ধরে আমার হাত। তারপর আবার তার আবেগময় কণ্ঠ, 'পারভীন, আমাকে সবাই কবর দেবে পেরিথদের গোরস্থানে। সেখানে সবাই যে আমাকে ধরবে। সবাই যে জানবে আমার আসল জাত। জর্জকেও যেতে হবে শিগ্‌গিরই। আমাকে বিয়ে করার পরিণতি হিসেবেই আর কী। জর্জও কি বলবে না, মেরী আমাকেও প্রতারণা করলে? আমি মরার পরও শান্তি পাব না পারভীন!'

এর ক'দিন পরই মৃত্যু হয় মেরীর। আর সমাধিস্থ করা হয় পেরিথ-ফ্যামিলি গোরস্থানে। জাঁকজমকের সাথেই।

সপ্তাহখানেক পর সিভিল সার্জনের কোনো কাজে আমাকে যেতে হয়েছিল জর্জের বাড়ি। বৈঠকখানা ঘরে সোনালিবরণ মলাট দেয়া একটা খাতা হাতে জর্জ বসেছিলেন। প্রয়োজনীয় কথা শেষ হলে আমার এক কথার জবাবে তিনি বললেন, 'এটার কথা?' না, খাতা নয় এটা। বাইবেল সম্বন্ধীয় একটা বই। মেরীর বাবার এক সুটকেসে ছিল যেদিন প্রথম বের করলাম আমিও খাতাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, মেরীর আব্বার ডায়েরি হবে। সেদিন আবার পাতা না খুলতেই একজন গেস্ট এলেন। আমিও সুটকেসে এটি রেখে সুটকেস বন্ধ করে চলে এলাম।' ছলছল চোখ জর্জের, 'মেরী তার আব্বার বইটা পড়তে পারল না, মিস পারভীন।' জর্জ কোনো কাজে সাময়িকভাবে ভেতরে গেলেন।

এদিক ওদিক তাকাতেই শেলফের নিচের তাকে একটা লালরঙের চৌকোনাকৃতি খাতা পেলাম। কী ভেবে হাতে নিলাম খাতাটা। এই কি সেই ডায়েরি? মেরীর আব্বার এই ডায়েরিই পড়েছিল বুঝি মেরী! একবারে হঠাৎ খুলে ফেলতেই যে পাতাটা বের হল তা দুমড়ানো একেবারে। এ তো সেই সব লেখাই। এই সবই মেরী আমাকে বর্ষণমুখর এক অপরাহ্ণে বলেছিল। মেরীর আব্বার ডায়েরি!

হঠাৎ মিস্টার পেরিথের পুনরায় আবির্ভাব। আমার হাতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বললেন, 'আরে, খাতাটা এ ঘরে এল কী করে? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান গতকাল। রেখেছিলাম পাশের ঘরে সুটকেসের পাশে। যার খাতা সে ভদ্রলোক নিতে এসেছিলেন কাল।' জর্জ কী একটু ভাবলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, মার্চের বারোই। মেরী যেদিন পড়ে গেল। সকালে, মেরী তখন কিচেনে, এক ভদ্রলোক তাঁর এ খাতাটা রেখে যান আমার কাছে। তিনি কী এক কাজে কোথায় যাচ্ছিলেন!'

তারাদের চোখ

সান্তনা এবার বাইরে এসে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে খোলা আকাশের দিকে তাকাতেই অযুত তারার চোখের সাথে ওর দু'চোখের মিলন হলো। আকাশের কুটিল তারারা কোন্ দৃষ্টিতে সান্তনার ফুলো ফুলো লাল চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সান্তনা তা জানে না।

কে যেন এসেছিল খবর দিতে। বড়ভাই মিনিট কয়েক ওর সাথে কথা বলেই ছুটে এসেছিল ঘরের মধ্যে।

একটা শার্টের মধ্যে নিজেকে পুরতে পুরতে বড়ভাই বললে, 'কাইয়ুম মারা গেছে ঘণ্টা দেড়েক হলো, পুকুরে নেবেছিল গোসল করতে।'

পায়ের মধ্যে স্যান্ডেল গলাতে গলাতে বড়ভাই বেরিয়ে গেল চিত্রিত মানুষের গতিতে।

একটা বিশ্রী অনুতাপ এসে সান্তনার সমস্ত অনুভূতি ছেয়ে গেল। আশ্চর্য ধরনের একটা গ্লানি আর ধিক্কার ওর মাথার মধ্যে, বুকের ঠিক মাঝখানটায় কিলবিল করতে লাগল নোংরা পোকার মতো।

কাইয়ুম আত্মহত্যা করল অবশেষে। জলদৈত্যের ভয়ঙ্করতর কন্যা সান্তনা। জোর করে গলা টিপে ধরেছিল কাইয়ুমের। সান্তানার হাতে অকালমৃত্যু ঘটেছে কাইয়ুমের।

ভিড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়া ছেলের মতো সান্তনা দারুণ অসহায় আর ফাঁকা বোধ করল নিজেকে।

বিকেল চারটায় ও টেবিলে মাথা রেখেছে। আটটা পর্যন্ত একইভাবে থাকতে ওর ভয়ানক খারাপ লাগল। এই চারঘণ্টা সান্তনা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কাঁদবার জন্যে। গলা বেজায় শুকনো তখন সান্তনার। জিভটা যেন আগুনে সেঁকে নেয়া হয়েছে।

সান্তনা কাঁদতে পারলই না। কান্নাটা কোত্থেকে যাত্রা করে, কোন্ পথ দিয়ে এসে ফেটে পড়ে অবশেষে, সান্তনার এসব জানাই ছিল না। এই মুহূর্তে সান্তনা

আবিষ্কার করল, বুকই কান্নার আসল উৎস। গলা আর বুকের মাঝখানটিতে অনির্বাণ আগুনে কান্নার স্পর্শ উষ্ণ। শেষে সেই উষ্ণ অশ্রু হয়ে চোখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে।

কিন্তু সান্তনার বুকে যে তীব্র অগ্নিকল্লোল তাতে কান্নার জল বাষ্প হয়ে পড়ে। সেই বাষ্প তারপর বেরিয়ে আসতে চাইছে সান্তনার চোখের সাদা অংশ, চোখের মণি দিয়ে। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মতো মুঠো মুঠো গরম হাওয়া বেরিয়ে সান্তনার গাল, চোখের কাছে নাকের দুটো উপত্যকা গরম করে দিচ্ছে।

কেউ বুঝতে পারল না, আত্মহত্যা করেছে।

কেউ জানবে না কাউয়ুমের অপমৃত্যুর আসল রহস্য।

সান্তনাও আগে বুঝতে পারেনি। বড়ভাইয়ের মুখে ওর মৃত্যুর খবর শোনবার আগেও সান্তনা জানত না কাউয়ুম আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল সান্তনা। ও একাই বুঝতে পেরেছে—এ কথা মনে হতেই একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ ওর পায়ের মধ্যে প্রবেশ করল কীটের মতো। কিন্তু মুহূর্তেই বেরিয়ে গেল লিকলিক করে সাপের শৈত্য সান্তনার শরীরে রেখে দিয়ে।

পরশুও সান্তনা কাউয়ুমকে নিউ মার্কেটে দেখেছে। লম্বা পাঞ্জাবি পরা কাউয়ুম 'নলেজ হোমে'র দরজায় সাজানো ম্যাগাজিনে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর সেই সময়েই কামালকে নিয়ে সান্তনা ওর সামনে দিয়ে চলে গেল।

কাইয়ুম নিশ্চয়ই একবার তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে হলো সান্তনার, কাইয়ুম একবার তাকিয়েছে তার দিকে। ওরা তখন বেশ খানিকটা সামনে।

কাইয়ুমের সে দৃষ্টি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠল সান্তনার কাছে! কত করুণ কাইয়ুমের মুখের প্রতিটি রেখা। কাইয়ুমের দৃষ্টিতে রাজ্যের মিনতি।

কাইয়ুম ওদের বাড়িতে শেষবার কবে এসেছিল। ষোলো সতেরো দিন হতে তো নিশ্চয়ই।

বিকেলে শেষ রোদের সোনালি ঝিলিমিলি তখন ওদের বাড়ির ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলোর পাতায় পাতায়। সামনের লনে বেতের চেয়ারে তখনও গল্পে মেতেছে কামালের সাথে।

কামালের হাত ওর পিঠের ওপর। সান্তনাও মুখের সমস্ত অভিব্যক্তিতে একজন প্রেমিকাকে ফুটিয়ে তুলছে। এই সময় কাইয়ুম এল। ও নিশ্চয়ই দেখেছে এদের দু'জনকেই কিন্তু কোনো কথা না বলে বড় ভাইয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কাইয়ুম! তুমি না শিল্পী! তুমি না ছবি আঁক কাইয়ুম! কেন তুমি মানুষের মন বোঝো না। কেন তুমি আমাকে ডেকে নিলে না আড়ালে! কামালকে আমার সাথে দেখলে তুমি কষ্ট পাবে, আমাকে জানাওনি কেন কাইয়ুম! কেন তুমি তোমার বুকের মধ্যে নিয়ে আমাকে আদর করলে না!

য়্যামেরিকান কায়দায় উঁচু করে পরা ফুলপ্যান্ট আর জন্তু-জানোয়ার মার্কা হাওয়াই শার্ট গায়ে কামালকেই কি প্রথমে ওর ভালো লেগেছিল!

'ওয়াপদায় চাকরি পেয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিল।' আব্বার কথা শুনে ও যখন কামালের দিকে তাকাল, ওর সত্যি ভালো লাগেনি।

এর পরদিনের পরদিন। তার পরের দিন সান্তনা কাইয়ুমকে দেখল, তখন ওর সাথে একটা মেয়ে ছিল।

বিষ্টি দেখছিল সান্তনা একটা চেয়ারে বসে। বাড়ির সামনে যে প্রশস্ত রাস্তা তার ওপর দিয়ে একটা রিকশা চলে গেল ভিজতে ভিজতে। কাইয়ুমের পাশে সেই মেয়েটাও বসা ছিল। আর সান্তনা এই সুযোগে দেখেও নিল ওকে।

সান্তনা একটু হাসল।

উগ্র প্রসাধনীর একটা মেয়ে পিঠকাটা ব্লাউজের একটা মেয়ে। সামনের চুল ছোট করে ছাঁটা, পেন্সিল ভ্রূর একটা লিপস্টিক-ঘষা মেয়ে অবশেষে শিল্পী কাইয়ুমের প্রেমিকা।

বিষ্টি হচ্ছিল দুপুরে। আম্মা কেবল দোতলায় ঘুমিয়ে। আর কেউ নেই। এরপরও অনেকক্ষণ ধরে টিপটিপ করে বিষ্টি পড়ল সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া লনটায়, ইউক্যালিপ্টাসের মাথায়, বুকে আর পিচের রাস্তার ওপর।

একটা বিরাট গাড়ি চালিয়ে কামাল এল এই সময়।

সান্তনার একটা নিজের ঘর আছে। কামালকে নিয়ে সান্তনা সেই ঘরে গেল। নাবিস্কোর ক্রিম কেকার আর চা নিয়ে এল ওর জন্যে।

ঘরময় পায়চারি করতে করতে কাইয়ুম কথা বলল আর চায়ে শব্দহীন চুমুক দিল। যখন শুধু তলানিটুকু অবশিষ্ট রইল তখন কাপ আর পিরিচ রেখে দিল টেবিলটার ওপর।

কামাল গল্প করতে করতে এসে বসেছে খাটের ওপর পরিপাটি বিছানায়। বসেছে একেবারে সান্তনার গা ঘেঁসে।

সান্তনার মুখে তখন লাল আবিরের রঙ। সান্তনার নিশ্বাসগুলো দৌড়াদৌড়ি করে একে অপরের অত্যন্ত নিকটে এসে পৌঁছেছে।

সেই বিষ্টি দুপুরে নিজেদের রক্তিম করে তুলতে ওদের মন সায় দিল না কিছুতেই।

কাইয়ুম! যে ঐশ্বর্য কামাল আমাকে দান করল তুমি কি কল্পনাও করেছো আমাকে সেই একই ঐশ্বর্য দিয়ে রঙিন করে তোলবার জন্যে?

কামাল মাত্র আটদিন প্রেম করেছে আমার সাথে। আটদিন পরেই আব্বাকে বিয়ের কথা বলেছে। তুমি দীর্ঘদিন ধরে শুধু প্রেমই করেছ কাইয়ুম। তা স্থায়ী করার ব্যবস্থা করার চিন্তাও করনি।

সান্তনাই-বা কেন এত সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠল? একটা সাধারণ হালকা বিকৃত রুচির মেয়েকে কাইয়ুমের অভিসারিকা ভাববার মতো হীন মানসিকতা কেন হলো সান্তনার?

'আমাদের ছবির মডেল নিয়ে যে এত অসুবিধেয় পড়তে হয়। এখনো এখানে ভদ্রঘরের কোনো মেয়েই মডেল হতে চায় না...।'

কাইয়ুমের কথা সেদিন অসমাপ্তই ছিল।

'আমাকে মডেল হতে বলো তোমার ছবির?'

সান্তনা সেদিন বোঝেনি। কিন্তু আজ বুঝেছে ওর কথায় কী বিশ্রী ঝাঁজ ছিল।

সেই মেয়েটা ওর ছবির মডেল ছিল নিশ্চয়ই। আর তাকে দেখেই সান্তনা কী করে বসল।

সান্তনার আসন্ন পরিণয়ের কথা কি আর গোপন আছে কাইয়ুমের কাছে?

লাজুক, চাপা কাইয়ুম, স্বল্পবাক শিল্পী কাইয়ুম কোনো পথ পায়নি আত্মহত্যা ছাড়া।

যে কাইয়ুম সাঁতার জানে না, পুকুরে নামতেও যার তীব্র অনীহা তার হঠাৎ পুকুরে নাবার অর্থ যদি কেউ বোঝে সে একমাত্র সান্তনাই।

রাত্রে সকলের সঙ্গেই খেতে বসল। মাছের এক টুকরোর একটু অংশ চিমটে নিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সান্তনা। মুহূর্তের জন্যে ভাত চিবনোও বন্ধ হলো তার।

সান্তনার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আত্মহত্যা। কাইয়ুমের আত্মহত্যার জন্যে দায়ী ও নিজেই। নিজের প্রাণ দিয়ে ও সেই কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

এসব বিশ্বেস করে না সান্তনা।

তবুও ভাবতে ভালো লাগে যে, ও আর কাইয়ুম তারা হয়ে, নক্ষত্র হয়ে আকাশের প্রান্তে প্রান্তে ভ্রমণ করবে।

রাত্রি দেড়টাই হবে তখন। সান্তনা পা' টিপে টিপে আব্বার ঘরে ঢুকল। আব্বার মাথার কাছে বন্দুকটা দাঁড় করানো দেয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সান্তনার হাত বন্দুকটার ওপর।

এই ধাতব পদার্থটির শৈত্য আরো কিছুক্ষণ অনুভব করল সান্তনা।

সান্তনা যখন আবার নিজের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে তখন ওর কাছে একটা টোটাও।

এই ক্ষুদ্রাকৃতি শক্তিশালী দ্রব্যটি বন্দুকে পুরবার সময় খট করে একটু আওয়াজ হবে। সান্তনা চমকে উঠবে।

একটু পরেই গুড়ুম করে এক আওয়াজ। আর তাতেই সান্তনা নামের তরুণীটি পৃথিবী ছেড়ে যাবে।

আম্মা দৌড়ে আসবে। আর এসেই অজ্ঞান। 'সান্তনা, মা আমার'। বলে আব্বারও নিশ্চয়ই হবে একই অবস্থা। আর কামাল—

বড়ভাই, সেজভাই মাথা কুড়বে। 'আপা', 'আপা' করে কাঁদবে আভা আর মিন্টু।

আর কামাল আসবে ছুটে। ওর রুক্ষ চুলে হাত বুলাবে 'সান্তু, সান্তু আমার!'

অঝোরে কাঁদবে কামাল।

কামাল কোনোদিন বিয়ে করবে না। সান্তনার স্মৃতি বুকে করে কামাল চিরকুমার রয়ে যাবে।

কামাল আসবে খবর পেয়েই।

হয়তো সান্তনার মলিন গালে চুমো খাবে। 'সান্তু কেন তুমি ছেড়ে গেলে!' কামাল আবার চুমো খাবে।

সান্তনা আর ভাবতে পারে না। রুদ্ধ আবেগ, এক আশ্চর্য শিহরণ, গলার মধ্যে, বুকের মধ্যে, সমস্ত শরীরে আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়ল।

আব্বা খুব ভোরে ওঠে ঘুম থেকে।

পা টিপে ও আব্বার ঘরে গিয়ে বন্দুকটা রেখে এল ঠিক আগের জাগাতেই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ উলঙ্গ আকাশের পানে সান্তনা তাকাল।

পরদিন কামালের প্রশস্ত বুকে মুখ রেখে হাল্‌কা হয়েছে সান্তনার ভারাক্রান্ত হৃদয়। সান্তনার কষ্ট লাঘব হয়েছে।

কত সন্ধেই কাটায় কামালের সাথে। সদ্যস্নাত মেঘমুক্ত আকাশের পানে সান্তনা তাকিয়েছে। কামালের কোমরে, কোলে হাত রেখে এখনো তাকায় সান্তনা। অযুত অযুত তারার স্নিগ্ধ মিষ্টি দৃষ্টি মুগ্ধ করে সান্তনাকে। সান্তনার কবিতার খাতা ভরে ফেলবার অনুপ্রেরণা যোগায়।

এ গল্পটার একটা পরিশিষ্ট আছে।

সেটি সান্তনারও জানা ছিল।

কাইয়ুমের সাথের মেয়েটির নাম ডেজী—সান্তনা তাও জানত না।

মৃত্যুর দিনও কাইয়ুম আর ডেজী ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষার প্রেম করেছে প্রচলিত ঢঙে।

আরো অনেকের মতো এই মানসিক বিলাসটুকু কাইয়ুমের ছিল।

সান্তনা তৃতীয় আর ডেজী চতুর্থ—যারা এই বিলাসের পাইপে তামাক পূরত।

সান্তনা এসব জানত না।

সেদিন মতিঝিলে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাইয়ুম পূর্বেও দু'দিন অস্নাত। সর্বোপরি ডেজীর অনুরোধ।

দীর্ঘকাল পরে পুকুরে নেবে অশান্ত হয়ে উঠেছিল কাইয়ুম। সাঁতারে নিজের চরম অপটুতার কথা বিস্মৃত হয়েছিল সাময়িকভাবে।

গল্পের এ পরিশিষ্টটুকু সান্তনার জানা ছিল।

যদিনা সান্তনা জানত, তবে আকাশের পানে তাকিয়ে মিটমিট করা অযুত তারার চোখে কী দৃষ্টি দেখতে পেত—আমার জানা নেই!

অতন্দ্র

অবশেষে ব্যর্থ হয়ে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধে থেকেই স্লো-পয়জনের মতন অতি ধীরে ধীরে আসা অন্ধকারের অজস্র তরল কীটে সমস্ত বাড়িটাই আক্রান্ত। নিচের অপরিসর স্যাঁতসেঁতে উঠোনের সাথে মিথুনরত পোকার মতন নিবিড় করে সেই অন্ধকার ছড়ানো। আর রাত বাড়ার প্রতিটি মুহূর্তে অজস্র স্তব্ধতা আর ভীতি এসে সেই অন্ধকারকে ভয়ঙ্কর গাঢ় করে তোলার উৎকট বিজয়ে উল্লসিত।

'সারারাত্রি আমার ঘুম হবে না! সারারাত্রিই যদি আমার ঘুম না হয়!'

রাতটা দীর্ঘ—রাতটা অত্যন্ত দীর্ঘ—যেন এ রাত্রির চেয়ে দীর্ঘ কিছুই নেই—মৃত্যুও নয়। সকাল-দুপুর-বিকেল সব কিছুর অস্তিত্বকে ভুলে গেল, যেন কোনোদিন সকাল-দুপুর-বিকেল সন্ধে দেখেনি, ভবিষ্যতে দেখবার চিন্তা তো আগেই নিঃশেষ।

নিচের অপরিসর স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন থেকে যার শুরু এবং গোটা একতলার সীমা ছাড়িয়ে দোতলার বারান্দায় যার শেষ, সেই নিমগাছটা থেকে এক ঝোপ অন্ধকার নিজের শীর্ণ কিন্তু শক্ত আঙুলগুলো বাড়িয়ে ধরেছে চারদিকে। তিন নম্বর ঘর থেকে একটা অতি ম্লান আলো নেতিয়ে পড়েছে নিমগাছটার একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ জায়গা জুড়ে। প্রচণ্ড কদর্যতায় সেই জায়গাটা আচ্ছন্ন। আর গায়ে জলবসন্তের প্রায় শুকিয়ে আসা গুটিগুলো থেকে সুক্ষ্ম ও তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে সমস্ত চেতনাই ক্লান্তিময়। সমস্ত অনুভূতি কেবল একটি মাত্রা সদ্য-প্রাক্তন রোগের বেদনার আজ্ঞাবহ দাস হয়ে রয়েছে। সমস্ত অনুভূতির সংকীর্ণ ভাঙন জুড়ে একটিমাত্র শারীরিক কষ্টের প্রশ্রয়। পুরু শার্টটার বোতাম খুলতে খুলতে নিমগাছ থেকে চোখ তুলেছে যে মুহূর্তে, সামনের মসজিদ ও তার পরের কয়েকটি বাড়ি আর মিটফোর্ড হাসপাতালের মেন-বিল্ডিংয়ের টিবি ওয়ার্ডটা দৃষ্টির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেন-বিল্ডিং থেকে একটু দূরের এই পক্স-ওয়ার্ডের ভয়াবহতা কি টিবি ওয়ার্ডেও আছে? টিবি ওয়ার্ডের বারান্দায় আলো, টিবি ওয়ার্ডের বারান্দা কি নিমগাছ দিয়ে অবিরাম স্পর্শিত হচ্ছে?

আমার পক্ষ না হয়ে টিবি হলে এই বিল্ডিংয়েই থাকতে হতো। আমার যদি টিবি হতো!

হাসি পেল কিন্তু হাসলো না।

'না, না, টিবি হবে কেন! টিবি হলে চাকরি থাকবে কেন! না, না, টিবি হবে কেন!

প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে পেছনে আসার মতন একটুও না ভাববার অবসর দিয়েই টিবি ওয়ার্ড থেকে ফিরে এল আর অল্প রক্তওলা সাদাটে চোখের কালো মণিটা স্থির হয়ে রইল পশ্চিম দিকের ঘরটায়, যার পাশ দিয়ে লাল রঙের সিঁড়িটা নেমে গেছে। একটা তেলতেলে সবুজ নোংরা শীতল সাপ শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গেল নিজের জঘন্য অস্তিত্বটাকে দীর্ঘস্থায়ী করে রেখে। এও কি এই রাত্রিটার মতো দীর্ঘ? পৃথিবীর, পৃথিবীর বাইরের যাবতীয় বস্তুর চেয়েও দীর্ঘ?

হাত ছয়েক দূরের ঘরটায় যে লোকটা আজ দুপুরে মারা গেল তার জীবন্ত দেহের উষ্ণতা কি এখন ঘরটাকে ঠিক বরফের মতন ঠাণ্ডা করে রাখেনি? সারাটা জীবন অসহ্য দারিদ্র্যে ভুগেছে অই লোকটা। অনাহারে বিবস্ত্র কাটিয়ে রোগের সাথে যুদ্ধ করল। মেডিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তায় বসে লোকটা ওর সকাল-দুপুর-সন্ধেগুলোকে আকুল আগ্রহে ধরে রাখবার বাসনা করেছিল। সকাল ন'টা থেকে দুপুর দু'টো পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে মহাসমারোহে নিজের মৃত্যু হওয়ার সৌভাগ্যের কথা কি ওর পাতলা, সজারুর কাঁটার মতন খাড়াখাড়া আর লালচে চুলের নিচে, ঘায়ে ভরা বিবর্ণ খুলিরও নিচে ক্ষুদ্রাকার, পাণ্ডুর হয়ে আসা হলদে মগজে স্থান পেয়েছিল? লোকটার মৃত্যু হলো।—যে-লোকটা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে, মৃত্যুর চার পাঁচ ঘণ্টা আগে সরকারি গাড়ি তাকে মহাসমারোহে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল এখানে।—এই ঘরটায় পরেই যে ছোট্ট বারান্দা সেখানে লোকটার লাশ এখনো আছে।—কিন্তু ভেতরের মানুষটা মারা গেছে।

একটা তীব্র কর্কশ আর্তনাদের মতন সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকল। দরজার কাছে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে সুইচটা অন করল।

'একমাসও ভি হয় নাই সাব; এই বেডে একটা বুড়া মইর‍্যা গেছেগা বসন্ত হইয়া।'

সেই বিছানায় আপদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া জীবটার কম্পমান দেহটার দিকে তাকাতেই ভয়ে স্থির। এর পরের মুহূর্তটা এল স্বাভাবিকভাবেই যখন সেই চাদর-মোড়া একটু অস্ফুট শব্দ করে নড়ে উঠল আর আতঙ্কও প্রায় চূড়ান্তে উপনীত; কিন্তু চিৎকার করবার আগেই বুঝতে পারার উপলব্ধিতে আশঙ্কা থেকে মুক্ত যে, আলো জ্বালানোর ফলে নতুন রোগীটার অসুবিধে হচ্ছে। 'অসুবিধে হচ্ছে?' বলেই সুইচটা অফ করতেই কিছুক্ষণের জন্যে রাশি রাশি অন্ধকারের অবিরাম প্রবেশ।

'জ্বালাইয়া দ্যান। প্যাশাপ ফিইর‍্যা আসিগা।' সেই চাদর-মোড়া উঠে বসল।

বালিশের কাছে কয়েকটা বাংলা আর ইংরেজি সাময়িকী। শুয়ে পড়ে সেগুলো গুছোতে গুছোতে বিড়ি বের করে দেয়াশলায়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রাখল। আগুন নিভে যাবার পর কেবলমাত্র এক টুকরো স্ফুলিঙ্গ কাঠিটার সাথে ঠিক আঠার মতন জড়িয়ে রইল। আর একটা বিচিত্র ধরনের স্মৃতি অকস্মাৎ নিজেকে স্থাপিত করেছে যার দীর্ঘস্থায়িত্বের আকুল কামনায় তীব্র লোভের অশান্ত প্রচণ্ডতা!

ছেলেবেলায় বিকেলে যদি কোনোদিন শোলার মাথায় আগুন নিয়ে খেলা করত, মা বলত 'সন্ধ্যেবেলায় আগুন নিয়ে খেলতে নেই বাবা!' ওর কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ করে মা বলত, 'বিকেলে আগুন নিয়ে খেললে রাত্রিতে বিছানায় পেচ্ছাব করে।' সাত বছর বয়স পর্যন্ত বিছানায় মাঝে মাঝে পেচ্ছাব করত। আর ওর মা— স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে—কেমন স্বপন, বিকেলে আর আগুন নিয়ে খেলিসনি যেন!—আর রেগে গেলে—স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে; 'আমি পারব না বাপু, এ্যাত্তো বড়ো ধাড়ি ছেলের গু-মুত ধুতে পারব না আর।'

হালার এইডা হাসপাতাল না কসাইখানা—য়্যাঁ। হালার-ব্যাবাকটি রাইত নার্স নাই বয় নাই। রুগিরা মরল কি বাঁচল কোনো তালাশী নাই! একটু থেমে আবার, এক বিডা ফকিরের পচা লাশ রাইখ্যা দিছে হেই কহন—হালার খুশবাই ছাড়ছে তো ঘরের মইদ্যেই তেষ্টন যায় না! মানুষগুলান বাঁচবো ক্যামনে, য়্যাঁ।

বারান্দায় শেষ প্রান্তের ঘরটায় তিন নম্বর বেডের রোগীটার সশব্দ অভিযোগ শুনে ভাবল, কেউ তো নেই! কেবলমাত্র কয়েকজন রোগী।

আমি যদি মারা যাই। আজ রাত্রিতেই যদি মৃত্যু হয় আমার! সকালে ব্রাদার টেম্পারেচার দেখতে না আসা পর্যন্ত আমার মৃত্যু সকলেরই অনাবিষ্কৃত থাকবে। সকাল হতে আমার শরীর থেকে চাপ চাপ দুর্গন্ধ বেরিয়ে অন্যান্য রোগীদের কি বিরক্তির সৃষ্টি করবে।

ব্রাদার, ও ব্রাদার এট্টু উপরে আহেন না! জলদি আহেন না এট্টু! একটু অপেক্ষা করে, বারান্দার প্রান্তে পুনরায় কণ্ঠস্বর, 'আহেন না পাউল্যার ঘাও বিষায়, মইরা যামুগা।'

ব্রাদার একবার এ ঘরেও এল।

পাঁশের বেডের ড্রাইভারের নিশ্বাসের শব্দ ঝিঁঝি পোকার ধারাবাহিক কান্নার মতন। প্রত্যেকটি ঘুমন্ত রোগী এক‌েকটি প্রাগৈতিহাসিক শব। আর বিড়ির জ্বলন্ত আগুন হলো সেই জোনাকি গোরস্তানের বিভীষিকার তিমির দাহনে যাকে মনে হয় জল—কিন্তু আসলে কেরোসিনের চেয়েও শক্তিশালী।

সুইচটা অন করতেই সাদা য়্যাপ্রন পরা নার্স আশ্চর্য সামঞ্জস্যের সাথে দেখা দিল পাদরির পাণ্ডুরতা নিয়ে।

'বিড়ি খাচ্ছেন?'

'এখোন আর কিইবা হবে? গুটি তো শুকিয়েই এলো।'

'তবু না খাওয়াই ভালো ডাক্তার নিষেধ করে খেতে।' একটু থেমে, 'ঘুমোননি এখন? ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুমই আসছে না ব্রাদার। গুটিগুলো জ্বলছে বেজায়।'

'চেষ্টা করুন ঘুমুতে।' কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটা মার্কিন সাময়িকী হাতে নিল ব্রাদার। 'এইটে নিই একটু পড়তে। সারারাত্রিই ডিউটি আজ। সময় টময় কাটাব আর কি।'

আবার সেই নিশ্বাসের শব্দ থেকে উৎপন্ন অজস্র নীরবতা।

নিচের তলা থেকে কর্কশ একটা চিৎকার এই নীরবতাকে আরো ভয়াবহ করল।

মিটফোর্ড হাসপাতালের এই স্কিন ডিজিজ ওয়ার্ডে এজন মস্তিষ্ক বিকৃত বৃদ্ধাও থাকে।

নীল জামা পরে থাকা ধড়টা, লতিফ না কি যেন, বলে এ-শহরে অই মেয়েটার বিরাট বাড়ি ছিল। রায়টের সময়ে ছেলে আর স্বামীর মৃত্যু হলে পাগল হয়ে যায়। বুড়ি ঝি-টা বলে এ বাড়িটাই আসলে ওর। রায়টের সময় স্বামী আর ছেলের মৃত্যু হলে পাগল হয়ে যায়।

পুরনো ধরনে তৈরি এ বাড়িটায় আগে সে বাস করত। গেটে সাদা পাথরের ওপর সেই লোকটার নামও দেখেছে এখানে ঢোকার সময়। এস. এন. ব্যানার্জী এখন কোথায়? এস. এন. ব্যানার্জী এখন ইন্ডিয়ায়? এস. এন. ব্যানার্জী বি.এল, প্লিডার, জজকোর্ট; এস. এন. ব্যানার্জী বি. এল, প্লিডার জর্জকোর্টের বৌ. ছেলে-মেয়ে কি এখন কলকাতায় থাকে? তাদের আত্মাগুলো খণ্ডিত হয়ে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে না? ওদের নিশ্বাসগুলো অতৃপ্তির পিচকারি দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়ে ঘরটাকে বরফের মতন হিম করে ফেলছে না?

অথচ ওরা এখন কেউ নেই। গুষ্টিশুদ্ধ সব হিন্দুস্তান চলে গেছে। ওরা কলকাতায় গেছে। না বর্ধমান? না বহরমপুর? না বাঁকুড়া? না কাটোয়া?

কাটোয়ায় আমার এক ফারুক চাচা ছিল। কাটোয়ায় আমার যে ফারুক চাচা ছিল—আহা!—বেচারা টিবি হয়ে বিনি চিকিৎসায় মারা গেল। আব্বা শুনে বেজায় রেগে গেল; ওর ছেলেগুলোর কি ক্ষমতাও হল না বাপকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে ভালো চিকিৎসা করাবার। হতভাগারা পাকিস্তানে চলে এল না কেন? কিন্তু সেই বিনি চিকিৎসায় মরে যাওয়া জনৈক ফারুক চাচার বড়োছেলে আব্বাকে চিঠিও দিয়েছিল ঢাকায় সব ঠিকঠাক করে রাখতে। কিন্তু উত্তর পায়নি।—ইস! একথা তখন আব্বা ছাড়া আমরা কেউ জানতুম না। জানলে আব্বা অত রাগ কিছুতেই দেখাতে পারত না।—ভাগ্যিস জানতুম না!'

'দ্যাত্তোরি! এতক্ষণ মনেই হলো না! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এতক্ষণ আমার মনেই হলো না। কী আশ্চর্য! একেবারেই খেয়াল হয়নি আমার! কী আশ্চর্য! কী

আশ্চর্য! একটা অঙ্ক অতি সামান্য কোনো ভুলের জন্য সমাধান হচ্ছিল না। সেই ভুলটা ধরতে পেরে মনের প্রতিটি অংশ দুর্নিবারভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'দ্যুত্তোরি!' ভাবল সে, 'ঘুমোলেই তো সব কেটে যায়। সব কেটে যায়। জলবসন্তের শুকিয়ে আসা গুটির জ্বালা; জিভের, গলার বিস্বাদ, থুথুর অজস্র টুকরো আর এই ভয়াবহ পক্স-ওয়ার্ডের সুতীব্র তীক্ষ্ণ কশাঘাত সব থেকে মুক্তি পাব আমি! ঘুমোলেই তো সব কেটে যায়।'

'ঘুমের চরম ক্লান্তির অতল আনন্দে আমার কষ্টগুলো কেটে যাক!' পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে পাশের বেডের ঘুমন্ত মানুষটাকে না দেখবার প্রাণপণ চেষ্টায় সেদিকে বারবার তাকাতে তাকাতে বারান্দায় এল। অই ঘরটায় একজন লোক আজকেই মারা গেছে। এখান থেকে মাত্র ছ'হাত দূরের অই ঘরটায় একজন লোক যার টিবি ছিল আজকেই মারা গেছে। ঘরটার পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই ভয়াবহ ঘরটা আমাকে দেখতেই হবে। সিঁড়ি দিয়ে এখানে যেই আসুক না ঘরটায় জানালা দিয়ে ভেতরটা একবার দেখতেই হবে। আমাকেও, এখানে যারা থাকে সবাইকেই, এমন কি নার্সরাও, ডাক্তার, বয় কেউ সেই ঘরটা দেখা থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

সিঁড়ির রেলিং ধরে অতি ধীরে অতি সাবধানে নিচে নামতে লাগল আর প্রতিটি মুহূর্তেই দুপুর দুটোয় মৃত টিবি রোগে আক্রান্ত মলিনবেশ মানুষটা সমস্ত দৃষ্টি ও শরীরের অনুভূতিগুলো আচ্ছন্ন করে রইল। হঠাৎ, আর হঠাৎ সেই ঘর থেকেই জোরে জোরে, ভীষণ জোরে নিশ্বাস নেবার প্রচণ্ড শব্দে কিছুক্ষণের জন্যে অচেতন বলা যায়—পৃথিবীর সব গন্ধ, সমুদ্রের সব বাতাস এক সাথে গ্রহণ করবার ব্যাকুলতায় কে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে! সেই মলিনবেশ দরিদ্র যুবকের শেষ শয্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন্ বিভীষিকার আমদানি করল!

সিঁড়ির শেষেই একটা ঘর যার মধ্যে চারিদিকে দেয়ালের শেলফে বিভিন্ন আকারের পাত্রে তরল ওষুধ রাখা আর বড়ো একটা টেবিল যাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে কয়েকটা চেয়ার। হঠাৎ দেশের বাড়িতে নেড়ি কুকুরটা পায়খানার কুয়ো থেকে ডুব দিয়ে এসে মুঠো মুঠো গন্ধ ছড়াতে লাগল ঢেঁকিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে।—আর থমকে দাঁড়াবার আগে এবং পরে লক্ষ করল চেয়ারে উপবিষ্ট ব্রাদারের সামনে টেবিলের ওপর সেই মার্কিন সাময়িকীর একটি পাতা যেখানে সমুদ্রের তীরে অতি পাতলা কটিবাস পরা জনৈক মার্কিন মহিলা, যার ঠোঁটে আমেরিকার একটি বিখ্যাত সিগ্রেটের অংশবিশেষ। ব্রাদারের লোলুপ দৃষ্টি সে শরীরের প্রতিটি অংশ দুর্নিবাররূপে উপভোগের আনন্দে উত্তেজিত। সেই ছবিরই প্রেরণায় ব্রাদার নিবিষ্ট মনে আত্মরত্তিতে লিপ্ত।

'আপনি!' মলিন যন্ত্রনায় মুখের প্রতিটি রেখা করুণ করে ব্রাদার বলল, 'আপনি—এতো রাত্রিতে যে!'

কেউ দেখতে পায়নি জেনে টেবিলের নিচে হাত গলিয়ে পায়জামার ফিতে লাগাতে লাগাতে বলল 'আপনার বইটা বেশ। সময় কাটছিল ভালোই।'

হঠাৎ এসেছি। আমার এ রকম হঠাৎ না এলেও তো চলত। ওপরেই-বা যাব কী করে! সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যে-ই উঠবে পৃথিবীর সব গন্ধ আর সমুদ্রের সব বাতাস ভয়ঙ্করভাবে গ্রহণের জন্যে ভয়ানক ইচ্ছুক জনৈক ব্যক্তির (যে কি মানুষ?) সশব্দ নিশ্বাস একটি জীবন্ত শরীরে কি মৃত্যু এনে দিতে পারে না?

সেখানে কী আছে? পৃথিবীর সব গন্ধ, সমুদ্রের সব বাতাস, নিস্তব্ধরাত্রির কালো আকাশের সব বর্ণ নেবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় কে অমন মাঝে মাঝে উৎকট জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে ঘরের, ঘরের পাশ দিয়ে নীরবে বসে যাওয়া সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে অজস্র ভয়াবহতা ছড়িয়ে দিয়ে?

সিঁড়ির পাশের অই ঘরের মানুষটা জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে।—কী সাঙ ঘাতিক! —কী বিশ্রী!—আমার কাছ থেকে মার্কিন পত্রিকা নিয়ে এসে উলঙ্গ মেয়ের ছবি থেকে—কী সাঙ্ঘাতিক!—আমি ওপরে যাব কী করে? সিঁড়ির পাশের ঘরটা!

দুটো অনুভূতিই সমানভাবে আক্রমণ করতে লাগল, যার ফলে এবং যা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বলল, 'ঘুম হচ্ছে না ব্রাদার। ঘুমের ওষুদ দ্যান না!'

কিন্তু সেই সিঁড়িটা একটা ঘরের পাশ দিয়েই প্রবাহিত যেখানে একটা লোক আজ দুপুরে মারা গেছে এবং আরেকজন মৃত্যুর সাথে প্রচণ্ড হাতাহাতিতে ব্যস্ত!

আমার মার্কিন ম্যাগাজিনের একটা অশ্লীল ছবি, নার্স, খোলা পায়জামা!

হঠাৎ চোখের সামনে, মনের মধ্যে ধাঁ করে এক গ্লাস জল। কাচের গ্লাস ভরা জল—জলের মধ্যে বালুকণা বিক্ষিপ্ত—একগ্লাস জলে বালুকণাগুলো ধীরে ধীরে নাবছে। জলের সাথে, কী আশ্চর্য, একটি কণাও মিশে যায়নি। নিজেদের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব নিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে!

কী জঘন্য! এ লোকটা টেবিলের নিচে—আমি ওপরে যাব কী করে!—সিঁড়িটা—পাশের সেই ঘর—মার্কিন ম্যাগাজিন, ছিঃ! মুমূর্ষু মানুষের নিশ্বাসগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার কী সশব্দ কদর্য ভয়াবহ প্রচেষ্টা—! ওষুধটা খেয়ে নিয়ে—বলল-বলব কি ব্রাদারকে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে দেবার জন্যে বলব কি ব্রাদারকে? বলব? না, থাক। ক্লান্তিতে বেচারার সমস্ত শরীর ম্লান হয়ে এসেছে। আর মেজাজও নিশ্চয়ই এখন ভালো না। না থাক, একাই যাব। এই সিঁড়িটা, কতক্ষণের আর! এই সিঁড়িটা! আর সিঁড়িটার প্রথম ধাপে উঠে, উঠব কি? এই সিঁড়ি সম্পূর্ণই অতিক্রম করতে হবে আমাকে। একটি একটি করে প্রতিটি পদক্ষেপ আমাকে নির্মাণ করতে হবে, যেগুলো তাদের নির্মাতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেদের ভয়াবহ করে তুলবে।

দ্বিতীয় ধাপেও কোনো শব্দ নেই। তৃতীয় চতুর্থ ধাপে গাঢ় নিস্তব্ধতার জমাট বাঁধা শব্দ ছাড়া, শক্তিপ্রয়োগ করে কোনো নিশ্বাসের আপন অস্তিত্ব রক্ষার সশব্দ প্রয়াস নেই। আর কয়েক ধাপ ওঠার পর অদৃশ্য একটি প্রচণ্ড বিরোধী শক্তির জয় হলো, কারণ চোখ গেল অই ঘরটার জানালার দিকে আর দৃষ্টির সম্মুখে করুণ কিন্তু বিভীষিকায় ভরা আর্তনাদের আবরণে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সম্পূর্ণ ঘরটা। চোখটাকে জানালার বাইরে নিক্ষেপ করে লোকটা শুয়ে আছে। সে চোখের কোনো দৃষ্টি নেই

বলা যেতে পারে। কেননা, পৃথিবীর পাণ্ডুর ছায়াদের সগৌরব উপস্থিতি সে চোখের প্রতিটি অণুপরিমাণ কোণে।

সেখানে দেখলে কি কারো কিছু ভাববার থাকে? তাই ভয় পেল না। ভয় পেল নিশ্চয়ই কিন্তু মনে হলো না 'আমি ভয় পাচ্ছি।'

একমাত্র মৃত্যুর—কেবলমাত্র মৃত্যুরই তুলনা করা যায় এর সঙ্গে—কালো কালো মৃত্যুদের অস্বাভাবিক ভিড়ে তখন চেতনা ও প্রজ্ঞা শূন্যতায় ভরে গেছে। আর—আর অণুমুহূর্তেই সেই বিশাল শূন্যতায় যোগ হলো আরও অজস্র শূন্যতা—কালো কালো, সরু সরু, শীতল মৃত্যুদের অস্বাভাবিক শূন্যতা তখন উপচিয়ে পড়ল সমস্ত অনুভূতি, বুদ্ধিকে কষ্ট দিতে দিতে।

কারণ, পৃথিবীর সব সকাল সব দুপুর সব বিকেল সব সন্ধে আর সব রাত্রিকে ধরে রাখবার বিপুল প্রয়াসে মুমূর্ষু মানুষটার সশব্দ ভয়াবহ নিশ্বাস রোদের মতন অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত সিঁড়ি জুড়ে আর সেই সিঁড়িরই বহুজন ব্যবহৃত ধাপ তখন অতিক্রমরত।

সিঁড়িটা শেষ হয়ে গেলে একসঙ্গে বিস্মিত ভীত আনন্দিত হবার মহাসুযোগ লাভ করল।

আমি পার হয়ে এসেছি। একতলা থেকে দোতলায় আর দোতলা থেকে একতলায় খয়ে যাওয়া লাল রঙের এই সিঁড়িটা আমি পার হয়ে এসেছি। কী আশ্চর্য! আমি পার হয়ে এলাম এই লাল রঙের ভয়াবহ সিঁড়িটা যার উপকূলে একটা ঘর, যেখানে মৃত্যু এসে খেলা করছে।—কী আশ্চর্য! আমি পার হয়ে এসেছি—আমি যে ভয় পাচ্ছিলাম এ কিন্তু একবারও বুঝতে পারিনি! একটা লোক—পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে অথবা ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে একটা লোক ওখানে বাঁচবার সশব্দ প্রয়াস চালাচ্ছে। আমি! আমি! কী বিশ্রী! কী আশ্চর্য! আমি এখানে আছি! কী জঘন্য!—আমার ঘুমের ওষুধটা খেতে যাবার কী দরকার ছিল?—ভয় আর কী?—না, না ভয় কী?—মানুষটা তো আর মরেনি! মরলেই বা কি? না, আমার ভয় নেই। না, আমি মোটেই ভয় করি না।

আলো না জ্বালিয়েই নিঃশব্দে ঘরের ভেতরে বিছানায় বসল। আমি মোটেই ভয় করি না। মরে যাওয়ার পর মানুষের আর কিছুই তো বাকি থাকে না। মৃত্যুর পর আর মানুষ থাকে না।—(ভূত হয়?)।

আমি যদি বাড়ি থাকতুম!

কাঁদতে ইচ্ছে হলো। বাড়ির কথা মনে হলে বেশ কিছুক্ষণ আরামেই কাটানো যাবে।—মানুষটা তো অই বেডেই আছে—দুপুরেই তো একজন মরল।—এও কি মরবে!—দু'টো ফ্যাকাশে চোখ, পৃথিবীর কোটি কোটি পাণ্ডুরতার যেখানে সগৌরব উপস্থিতি!—ব্রাদারটা আমার মার্কিন ম্যাগাজিন নিয়ে—কী বিশ্রী!—পৃথিবীর সব পাণ্ডুরতা দু'টো ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে অজস্র মৃত্যুর দম্ভভরা পদচারণা।—আমার আম্মা!—অত জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে লোকটা!—আমার আম্মা—আমি মনে করবই

আম্মাকে—গুড় ভরা বড়ো বড়ো জালা, তক্তপোষের নিচে আলু আর রসুন, বেতের বেড়ায় পনেরো বছর বয়সে ক্লাস ফাইভে পড়া ছোটভাইয়ের আঁটা বিড়ির লেবেল।

—আমার মা।—'স্বপন, ঘুম হচ্ছে না বাবা? অমন ছটফট করছিস কেন? অনেক রাত্রি হয়ে গেছে বাবা, ঘুমো!' তন্দ্রায় কণ্ঠ জড়িয়ে আসে মা'র। তবু সন্তানের অনিদ্রার অনুভূতিকে স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছেন আম্মা।

'বাবা স্বপন, শত সহস্র দোয়া জানিবা। তুমি পত্র দেও না আমি কষ্ট পাই। বাবা, মায়ের উপর রাগ করিয়াছ। তুমি বেশি খাটাখাটি করিবা না। শরীল ঠিক রাখিয়া যাহা উপার্জন করো তাহাতেই আমাদের খোদা চালাইয়া লইবেন। তোমার শরীলের প্রতি যত্ন লইবা বাবা।'

'আম্মা, আমি তোমাকে নিয়মিত চিঠি দেবো আম্মা!' প্রায় স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, সামনের মাসে আমার যদি দশটাকা বেড়ে পুরো একশোতেই ওঠে তবে আম্মাকে ঢাকা নিয়েই আসব। আর দু'টো টিউশনি পেলে ছোট ভাইটিকেও আনতে পারব। গাঁয়ে থেকে মানুষ হবে না। পনেরো বছর বয়সে ক্লাস ফাইভে পড়ে ছেলেটা!

ডান হাতটা আস্তে আস্তে বিছানার একপাশে ঝুলে পড়ল। তর্জনী আর মধ্যমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিড়িটা স্থিরভাবে জ্বলছে। আর বাম হাতটা সোজা করে রাখা বিছানার ওপর। চতুর্দিক থেকে ক্লান্তি—তন্দ্রা এল—ক্লান্তি এল—চোখ দু'টো বন্ধ করেই সেই তন্দ্রায় আত্মসমর্পণ করতেই একজন বিরাট লম্বা লোক—আমি চিনি না একে!—একটা বোতল নিয়ে এল। কাচের বড়ো একটা বোতল।—তার মধ্যে জল—সেখানে একটা জলীয়, সবুজ রঙের দুর্বল লতা শীর্ণকায় হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত বোতলের দেয়ালে। বিরাট লম্বা লোক, আমি যাকে চিনি না, বলল, 'নাও রেখে দিও তোমার ঘরে।'

হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে—প্রায় নিয়েছিলই—কিন্তু ফসকে গেল—। বোতলটা পড়ে যেতেই বুকের ঠিক মাঝখানটায় যার চারদিকেই মাংসহীন হাড়, হাড়ের ওপর চামড়া তার ওপর লোম কিন্তু লোমের ওপর গেঞ্জি নেই, কেবল এই শার্টটা, ধড়াস করে উঠল।

তন্দ্রাটা কেটে যাবার প্রথমেই, কিছুক্ষণের জন্যে আমি কোথায় আছি? এটি আমার সাঁইত্রিশের দুই শরৎ গুপ্ত রোডের কেরোসিন টিনের তৈরি 'দি হ্যাপী মেস'? একটা বিড়ি ধরাবার পর, বারান্দায় লোকজনের চলাফেরা কী জন্যে? ডাক্তার এসেছে নিশ্চয়ই। নার্সকে ধমকাচ্ছে। নার্সরা আবার বয়দের।

লতীফ ঘরে ঢুকল। সুইচ বোর্ডে হাত দিতে যাবে, বলল, 'লাইট জ্বালিয়ো না, থাক।' লতীফ কাছে এসে দাঁড়াল। একটা বিড়ি দেবার পর, 'কী হয়েছে, লতীফ হই চই এত রাত্রিতে!' প্রায় নির্লিপ্ত দার্শনিকের ভঙ্গি লতীফের কণ্ঠে; 'অইবো আবার কী সাব? যা হওনের তাই!' একটু থেমে, 'দুই নম্বর ঘরের বুড়াটা মরছে। সিস্টার আছিল। খবর পাঠাইল এই এট্টু আগে। ডাক্তার আইতে আইতেই খতোম।—'

'সিঁড়ির পাশের ঘরের লোকটা?'

'হ' সাব—টিবিও ভি ধরছে, হাঁপানিও ভি ধরছে—বুড়ায় বাঁচবো ক্যামনে? উইহেনে বেশি যাইয়েন না সা'ব। হালার যত পচা-পুচা রুগী আইন্যা ফ্যালাইবো—আঠারো নম্বর।' তারপর বিড়িটা টান দিয়ে, 'মরবার একদিন আগে রাস্তা থাইক্যা মানুষ ধইর্‌য়া আনে—হালার বে-রহম ট্যাকটিস!—যুদিল দিল্লাগিই করিস তো মানুষ গুলানরে আগে আগেই ম্যাডিকেলে ভর্তি কইর‍্যা ল'।'

লতীফ বেরিয়ে গেলে প্রথমে দরজা দিয়ে বারান্দায় আলো, তারপর ক্রমাগত অন্ধকার, তারপর লোকটার মৃত্যু—চেতনার গন্তব্য। কী বিশ্রী! লোকটার মৃত্যু—বারান্দার আলো, অবিরাম অন্ধকার পেরিয়ে লোকটার মৃত্যু—আমার চেতনার গন্তব্য।

মানুষটা ওর সকালগুলো দুপুর-বিকেল সন্ধেগুলোর মধ্যে বন্দি থাকার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

অই অন্ধকারগুলোর মধ্যে, নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে হাজার হাজার মৃত্যু লুকিয়ে রয়েছে তার ভেতর থেকে কয়েকটা হাত ধরাধরি করে—দুর্গন্ধ পাঁচড়ার রসে তাদের হাত সিক্ত, নোংরা হাত,—পক্স-ওয়ার্ডে, এই আঠারো নম্বর ডি. সি. রায় রোডে এসেছে। সেই লাল সিঁড়ি বেয়ে অই ঘরটার কাছে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে ওরা। তারপর লোকটার অস্তিত্বের প্রতিটি চেতনায় নিজেদের বিক্ষিপ্ত করে দিল। পাশের বেডের ড্রাইভার ভদ্রলোক একটা অস্ফুট ধ্বনি করে পাশ ফিরল।

আঃ! বেজায় ক্লান্তি—আসছে চতুর্দিক থেকে। সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে সেই ক্লান্তিতে। অবসাদে বসন্তের শুকিয়ে আসা গুটির যন্ত্রণায় অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে তন্দ্রা কেটে যেতেই অন্ধকারে আঁকা আঁকাবাঁকা সিঁড়ি—ঘর, জানালা—দুটো স্তিমিত চোখ—বেঁচে থাকার জন্যে কী প্রচণ্ড চেষ্টা—পাণ্ডুর চোখ—ব্রাদার এসে আমার মার্কিন ম্যাগাজিন নিয়ে গিয়ে—একটা মেয়ে সিগ্রেট টানছে সমুদ্রের ধারে—মেয়েটার প্রায় সবখানি শরীরেই কাপড় নেই—দু'টো স্তিমিত পাণ্ডুর চোখের বেঁচে থাকবার প্রয়াস! একজন লোক তাকে আমি চিনি না, কোনোদিন দেখিনি, একটা বোতল—সে বোতলে কি ছিল আমার খেয়াল নেই।—ঘর জানালা, দু'টো স্তিমিত চোখ—লাল সিঁড়ি।

তবু ঘুম আসছেই।

এবং ঘুম আসবেই।

প্রথমে অজস্র কালো কালো বিন্দু চোখের চারপাশে স্তব্ধ হয়ে রইল। সেগুলো চঞ্চল হয়ে নিজেদের বিক্ষিপ্ত করে দিল অস্তিত্বের প্রতিটি চেতনায়। হৃদয়ের, বুদ্ধির সব অনুভূতিগুলোকে বাইরে ঠেলে দিয়ে মুঠো সেই বিন্দুগুলো স্থির হয়ে থাকে তারপর। তখন ঘুমিয়ে গেল।

স্বগতমৃত্যুর পটভূমি

সূর্যের প্রখর অন্ধকার ও অজস্র মানুষের ভয়াবহ নির্জনতায় গোরস্তানের গৃহস্থ শবেরা আর্তনাদ করে উঠল। এনসাইক্লোপিডিয়ার স্ফীতকায় অবয়ব এই আশ্চর্য সুযোগের সদ্ব্যবহারে আগ্রহশীল বলে অবচেতনতর সুড়ঙ্গে পথের প্রত্যাশী যেখানে এই শববর্গ সমুদ্রের সন্ধানী হবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যাপৃত।

সমুদ্রের সুসীমিত কিন্তু গভীর নীল অস্তিত্বের গৌরবে উত্তপ্ত। অস্তিত্বের গৌরবে মহান, না সমস্তটাই সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত এবং সুমার্জিত একটা ভান— মস্ত বড়ো কোনো প্রতারণা? বিশ্রামের ক্লান্তিতে নিম্নতম মর্যাদা দিয়ে সময়ের যে স্থূল অবয়ব প্রকাশিত হয় তাকেই কি মানবিক মূল্যবোধ বলে যার লৌকিক প্রতিশব্দ স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা—বলাটাকে সুসম্পূর্ণ করতে গেলে—ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি? সমুদ্রের এই নীল কি কোনো স্থান যেখান থেকে শেষরাত্রির গাড়ি ধরা যায়? না সারারাত্রি কামড় খেতে খেতে ট্রেনের ঘণ্টার জন্যে নিশ্বাস গুনতে হয়?

মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষ গোনে! কবিতায় সন্ধ্যার পাখি গোনে; কিন্তু নিশ্বাস গোনে না।

সময় কাটাবার জন্যে কাউকেউ তো নিশ্বাস গুনতে দেখিনি। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় একশ' না ষাট পর্যন্ত গুনতে এক মিনিট। নাকের মাথা দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরে গুনতে থাকো, স্যার ঢোকার সাথে সাথে ছেড়ে দেবে, 'আমি এক মিনিট থাকতে পারি।' আর সময় কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে নিজে নিজেই! পঞ্চাশের দিকে এসে সংখ্যাগুলো মৌন আবৃত্তিতে কেবলি পরস্পরকে চুমু খেত।

কিন্তু আমি আমার নিশ্বাস গুনিনি।

ভাগ্যিস আমি আমার নিশ্বাস গুনিনি।

তুমি তোমার গ্লাসের জলগুলোকে ফেলে দেবে কেন? তুমি তোমার গ্লাসের প্রত্যেকটি জলকেই না ভালোবাস। তুমি তোমার জলগুলোকে ফেলে দিও না।

(আমি আমার জলগুলোকে ভালোবাসি? আমার গ্লাসে কতটুকু জল অবশিষ্ট? আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমার জানা নেই কিছু, যেহেতু আমি প্রায় সবই জানি। সত্যি আমি কিচ্ছু বুঝি না।

বড় আয়নায় প্রতিবিম্বিত ছোট আয়নার আমি পুনরায় আশ্রয় নেই বড় আয়নায়। তখন কিছুতেই বলা যায় না এখানে ক'টা আমির মুখ উপস্থিত। ক'টা আমিকেই আমি দেখছি, অনুভব করছি।)

তুমি তোমার জলগুলোকে ফেলে দেবার প্রসঙ্গে কয়েকটি বাক্যই তো সাজিয়েছো এবং একটা প্রসারিত মধ্যভাগের পর নিপুণভাবে সঙ্কুচিত উপসংহারে পাখার বাতাস সেবন করলে। কিন্তু তিনটেমাত্র বাক্যের এই ক্ষুদ্র কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ প্রবন্ধেও ফাঁকি কেন? তোমার শিক্ষিত, সংস্কৃত ও মার্জিত প্রবৃত্তিকে (মার্জিত প্রবৃত্তি?) হত্যা করে তোমার প্রবন্ধকে সুসম্পূর্ণ কর।

আমার জলগুলো ভোরের শিশির জমানো সঞ্চয় নয়, রাস্তায় বারোয়ারি কল থেকে নির্গত—আমার বন্ধু এই উক্তিই করেছে।

শিক্ষিত প্রবৃত্তির নিহত দেহের নোংরা রক্ত আয়নার অনেকগুলো আমিতে বিক্ষিপ্ত হলো যার ঝাঁঝে নাকে-চোখে জ্বালা। সেই সমব্যবসায়ী বন্ধুর উক্তি, এই ব্যবহার জনৈক দালাল সহকর্মীর অবিরাম নীরব এবং শেষোক্তজনের কাছেই (হয়তো) অজ্ঞাত সাধনা আমাকে বিষণ্ণতার স্বর্গীয় বৃত্ত অতিক্রম করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

দ্যাখো সেই দালাল বন্ধুর সহায়তা প্রসঙ্গেও তুমি একটি অতিরিক্ত শব্দ 'হয়তো' ব্যবহার করেছো। যেহেতু তুমি এখনো সংশয়মুক্ত নও যে, সেই বন্ধুর সহায়তাও তার সচেতন প্রেরণার কাজ কি-না।

এই কদর্য কাজও করতে পারে না, আমার বন্ধু, আহসান আমার বন্ধু এবং আন্তরিক, ভাবতে গিয়েই তোমার পুনর্জীবিত মার্জিত বুদ্ধি এই সাহায্য ব্যাপারে তার অজ্ঞাত চেতনার কথা কল্পনা করতে তোমাকে বাধ্য করল।

প্রথমত বলা যেতে পারে যে, সন্দেহ করবার তীব্র বিষপূর্ণ বেদনাময়—বেদনাময় না বলে যন্ত্রণাদায়ক বলা উচিত, অনুভূতি থেকে মুক্ত হবার একটি প্রায়-সচেতন আকাঙ্ক্ষা এখানেও প্রবাহিত। দ্বিতীয়ত অনিষ্টকারীকে সকলেই নিজের ক্রোধ সৃষ্টির উপকরণ করতে ইচ্ছুক যা তার মার্জিত (?) প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তির মার্জিত ক্ষেত্রে অস্বীকৃত, অপমানিত (?) ও ধিকৃত (?) হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত সেই বন্ধুকে বলে ভাববার, তার চেয়েও বেশি নিজের কাছে প্রচার করবার একটি সচেতন প্রবণতা যার পিছনে এই দালালিতে তার বুৎপত্তি সম্পর্কে একটি ধারণা ক্রিয়াশীল।

জনৈক জ্ঞানী দালাল আমার বন্ধু, আমার বন্ধু, আমার বন্ধু।

(আরে রাখো হে, বিজনেসের তুমি জানো কী? একি তোমার সোনাডাঙার পাটের ক্ষেত? মান্ধাতার আমলের নিয়ম-টিয়ম তো ছাড়তে পারোনি, প্রফিট করবে

কী? আজকালকার বিজনেস হলো গিয়ে তোমার বাইরের বোলচাল, বুঝলে! খোলতাটাই এখন সবাই দেখে!)

এ্যামবিশনের গন্তব্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও যথার্থ নৈরাশ্য ও স্বাভাবিক কামনার আশা-হতাশা দ্বিতীয় পক্ষের মুখ থেকে নির্গত এই কথা সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য।

বিষণ্ণতার বৃত্ত থেকে আমার উত্তরণ ঘটেছে (ইচ্ছার প্রবল বিরুদ্ধে আমি বহিষ্কৃত হয়েছি) যার জন্যে উপরোক্ত বন্ধুর কাছে আমার প্রচণ্ডভাবে কৃতজ্ঞ থাকা একান্তভাবে উচিত।

[তোমার নিজের মধ্যে একটা বিষণ্ণতা তৈরি করে নাও না। তাকেই তোমার জৈবিক প্রয়োজনসমূহের মর্যাদা দিয়ে বৃদ্ধি করো; সেই বিষণ্ণতা তোমাকে আর কিছু না দিক সঙ্গ দেবে, সব সময়ের জন্যেই সঙ্গ দেবে যা তৃপ্তিদায়ক না হলেও চরম তৃপ্তির আগের মুহূর্তে যৌন উত্তেজনারই সমান্তরাল। আহা! আমারও একদিন ছিল।]

আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং তা একান্তভাবেই উচিত। যদিও এই বৃত্ত থেকে উত্তরণে আমার সম্পূর্ণই উপকার হয়নি যদিও বাল্‌বের আলোয় সিক্ত নীল, ধোঁয়ায় রূপান্তরিত এবং যদিও-বা সর্বোপরি ঘষা কাচ, পঙ্গু আলো প্রভৃতির প্রাধান্য।

[ছি! ছি! (এই ছি ছি কিন্তু কিছুতেই ছেলেবেলায় মার কাছে শোনা ছি ছি নয়, যার সঙ্গে লোকে কী বলবে, এত বড়ো ছেলে বুঝি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে প্রভৃতি সংযোজিত হতো) তোমার মার্জিত প্রবৃত্তির রূপ এই? তুমি না সুশিক্ষিত কামনার অনুগত বাধ্য প্রজা। তুমি একটি প্রাক্তন ডোবা থেকে (ডোবা? ডোবা? ডোবা?) অপসারিত হয়ে এখন অনভিজাত কোনো জলকীটের মতন সেই বস্তুরই চিন্তা করো! শেষ বাক্যটা গঠনেই কি তোমার 'আশযুক্ত ছাইস্পর্শিত পুচ্ছের ঝাপটানি অনুভব করা যায় না? কেবল কয়েকবার 'যদিও' শব্দ ব্যবহার করে আসন্ন প্রতিষেধকের কতটা আশা তুমি করতে সক্ষম?]

আমি আমার বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ যেহেতু সেই বিখ্যাত ও বহুজন কথিত বৃত্ত অতিক্রমের পর ব্যাপক গভীর অতএব শুকনো প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। বিশাল প্রান্তর যার শেষ নেই (কিন্তু সেখানে, আমি বলব না, আমি বলতে চাই না, আমি বলবোই না, সকলেরই শেষ আছে! কিন্তু সে শেষেরও অস্পষ্টতা কী ভয়াবহ স্পষ্ট!)।

গরু খুঁজতে খুঁজতে এদ্দূর এসে গরুও নেই, পথও নেই। গরু নেই কিন্তু গরুর দুধ জোগাড় নাকি হবেই। প্রান্তরের কোথাও সবুজ নেই, তাতে কী? প্যাক হয়ে টিন টিন পাউডার-দুধ তো আসছেই, চিন্তা নেই। বহুবার উল্লিখিত বিষণ্ণতার বৃত্ত হলো সেই আলো যেখান থেকে দুঃখের উৎস অর্থাৎ যেখান থেকে দুঃখিত হবার প্রেরণা প্রচারিত হয়ে থাকে।

আনন্দ-আশা প্রভৃতির মতন দুঃখ এসে আমাকে আঘাত করে। দুঃখ আমাকে সিক্ত করে, সহানুভূতি (আন্তরিক) সমবেদনার উত্তাপে আমি নিজেকে শীতল করি। আমি দুঃখকে অনুভব করি।

প্রেম করে বিয়ে হবার পর রোকেয়া চলে গেল কেন? বিয়ের ঠিক পরেই রোকেয়া চলে গেল। কামালের যৌথজীবন উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাহত হলো।

আহা! কামাল একা একা রইল।

রোকেয়াকে চলে যেতে হলো কেন? রোকেয়াকে চলে যেতে হলো।

আহা হা! কামাল!

আহা হা! রোকেয়া!

আমার বন্ধুটার টাইফয়েড। বেচারা মেসে থাকে! বাবা-মা কোথায়?

আহা! কাইয়ুমের স্বর!

রীনারে! রীনা! তুই কোথায়!

ভাই, লক্ষীটি, বোন, তুই কোথায়!

(খুব পাতলা করে দ্রুত গতিতে চিনচিন করে অল্প একটু চামড়া চিরে গেল আর একটু একটু রক্তের ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু চেরা চামড়ায় সুন্দর করে জমে রইল।)

কাইয়ুম একদিন কী জিজ্ঞেস করেছিল। আর জিভের এতটুকু বের করে 'আপনার মাথা' বলেই দৌড়ে ভেতরে পালাল।

'তোর ছোট বোন, না রে?'

'হুঁ সবচে ছোট আবার বড়ো আপার পর এইটেই একমাত্র বোন, তাই সকলেরি খুব আদুরে!'

এরপর যেহেতু পারিবারিক আলোচনা অসংস্কৃত; অতএব ক্লান্তিকর, তাই সিনেমার তরলিত আলোচনা।

এই বিষণ্ণতার বৃত্তে বাস করাকালে আমার মধ্যে একটা তরলিত উপলব্ধির অস্তিত্ব ছিলো যা কি না, আশ্চর্য, কখনও নিজের উপস্থিতিকেই সন্দেহ করেনি। আমার বেদনাবোধগুলো অত্যন্ত ঋজু কিন্তু সজল বিস্তৃত বলিষ্ঠতায় গ্রন্থিবদ্ধ ছিল।

আমি আমার মৃত অনুজার অনুপস্থিতিতে আমার গত দুঃখের যে কাহিনী বিবৃত করলুম সেই দুঃখ একটি অনুভবেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ যার জনক ওর অকাল মৃত্যু। ছোট বোনের স্মৃতিকে নিজের অংশে পরিণত করতে আমাকে যে অনুভব সাহায্য করল তা অনেকখানিই তরলিত যা না হলে কোনোমতেই পাতলা ও সরু করে চেরা সুন্দর চামড়ার উপর রক্তের ক্ষুদ্রাকার অজস্র শিশিরবিন্দু ভাবতে বা জানতে পারতুম না।

প্রথমে অভিজ্ঞতা, তারপর অনুভূতি এবং একেবারে শেষে উপলব্ধি।

ওপরে উল্লিখিত ঘটনাতেও এমনি বিবর্তন উপস্থিত। ওর মৃত্যু প্রথম স্তরে আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব (অত্যন্ত বাস্তব বলেই আমাদের কাছে অবাস্তব, অতএব নৃশংস এবং আরও নৃশংস) একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা; স্নেহ ভালোবাসা প্রেম প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত প্রবৃত্তিতে আক্রমণ করে যার ফলে অনুভূতির জন্ম হয়ে থাকে।

সেই অনুভূতি, আমার পরিণত প্রবৃত্তি, (পরিণত কিন্তু এই প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পর্যায়েও উপস্থিত ছিল) বাস্তবতা জ্ঞান প্রভৃতির সমবেত প্রচেষ্টায়

উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দেয়। একটা পর্যায় সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু এর ফলে ব্যাবিলনের কোনো নতুন উদ্যান সৃষ্টি হয় না, প্রত্যেকটি স্তরই এখানে পরস্পর সংযুক্ত। এই যোগাযোগের সূত্র হিসেবে সাধারণত বিষাদই ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার রঙ সবুজ আর যা তারুণ্যের প্রতীক। এই তারুণ্য বক্তৃতা বা উপদেশ বা ক্রীড়ামোদীদের তারুণ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

[এনসাইক্লোপিডিয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে এখানে প্রায় আশঙ্কামুক্ত (সুতরাং আশাহীন) হওয়া যায় যেখানে অনুজার প্রাক্তন মৃত্যুশোক অপারেশান থিয়েটারে গৃহীত রোগী।]

আমার এখন পর্যন্ত বিষণ্ণতার স্বর্গীয় (স্বর্গীয় কথাটা সব সময়েই স্থির নিশ্চিত ও দৃঢ় নিরাপত্তার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে যা কারো কাম্য নয় বলে এখানে সে অর্থকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে) বৃত্তের নাগরিক।

আমার উপলব্ধি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে অন্য কোনো নতুন ও বিষাদ অনুভবের মধ্যে কিছুদিন ধরেই যার রাজত্ব চলবে আবার।

কিন্তু এই বৃত্তেরই একটি আইন অনুসারে কিছুদিন আমি আমার সব রকম প্রবৃত্তিকেই যন্ত্র দিয়ে মাপা আরম্ভ করলুম। শেষের দিকে এসে দেখা গেল যে, যন্ত্রের আঁচে প্রবৃত্তিসমূহ একেকটি শবে রূপান্তরিত হয়েছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার মধ্যেও আমি আনন্দ অনুভব করলুম যে মাননীয় শববর্গ এখন আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রভৃতি কিছুতেই নিজেদের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না, কোথাও কোনো স্থৈর্য নেই, আমার গোটা অস্তিত্বটাতেই চূড়ান্ত উদ্বিগ্নতা।

চিয়ার আপ—হার্টি কনগ্রাচুলেশান্স। বিষণ্ণতার বৃত্ত থেকে গাড়িটা হুইসল দিচ্ছে আর তুমি লাফিয়ে সেই গাড়িতে উঠতে পারলে। তোমার সেই দালাল বন্ধুর কল্যাণেই তোমার যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয় এবং সেই যন্ত্রই এই ডোবা অতিক্রম করবার প্রেরণা।

এর পরের স্টেশনে পৌঁছতেই কেমন ধোঁয়া, চারদিক থেকে অজস্র ধোঁয়া। ধোঁয়া কিন্তু কোনো চিমনি নেই, ঘর নেই, এমন কি কোথায় দাঁড়িয়ে তা-ও জানা নেই। জানবার একমাত্র বিষয় হলো ধোঁয়া, আপনাদের বায়বীয় অস্তিত্বকে বিস্তৃত-বিকৃত (ও বিনাশ) করতে চায় তার নাম ধোঁয়া।

এই সময় আমার ভেতরের শববর্গ আর্তনাদ করে ওঠে এবং সেই আর্তনাদের স্বর অত্যন্ত ধীরে হলেও আমাকে আঘাত করল। শববর্গ আর্তনাদ করে, কিন্তু আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট টানি। আমি ভালো করেই জানি যে, শববর্গ আমার দাস এবং শববর্গ আমার দাসই।

আমি মানুষটা এই সময় পয়গম্বর হবার যোগ্যতা অর্জন করি। আত্যান্তিক ক্ষমতাশীলতা আমার শরীরের সঙ্গে মিশে থাকে (না সবগুলো প্রবৃত্তি বেরিয়ে গিয়ে ঘাম হয়ে তোমার শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকে?)। আবার এ সময় আমি এতটা ঈশ্বরত্ব লাভ করি যে, ক্ষমা না করে হলেও কাউকে শাস্তি দান করি। এও অবশ্যি ক্ষমাশীলতারই একটি পরিণত রূপ।

আমি তখন আমার বিশেষ ও সম্মানীয় বৃত্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়েও অনেকের সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক আচরণের প্রতিভূ। অনেকের ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহারের উত্তরে আমি তাকে শাস্তি দান করি ঐ একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমা করে বা ক্ষমা না করে।

'আনোয়ার তুমি মানসিক পরিণতির দিক থেকে অত্যন্ত শৈশবে বাস করছো। তোমার আর আমার বৃত্তি বাইরে থেকে একই মনে হয়, কিন্তু তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ। তোমার পরিণতি অত্যন্ত খর্ব। এত খর্ব যে, এ পরিণতি নিয়ে নির্মিত যে কোনো মানুষকে অনায়াসে ক্ষমা করা যায়। সেই ক্ষমাও তার শৈশবকে অতিক্রম করেনি যার জন্যে তার রূপটাও তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না এবং যা হলে তোমার অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত, তোমার আচরণ ও ব্যবহার ভালোর দিকে ঝুঁকত এবং এর সাহায্যেই তুমি আমাকে শব্দহীন ও প্রায় আকৃতিহীন কোনো অপমান করতে সক্ষম হতে।

আমি পরাজিত হতে ভালোবাসি না। তাই কোনো রকমেই ক্ষমতার রূপটাই আনোয়ারের কাছে স্পষ্ট হতে দিইনি। এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করবার জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাকে বিভিন্নপ্রকার শবের মুখে কাপড় চাপা দিতে হয়।

আমার সেই বিখ্যাত দালাল বন্ধু যে এর মধ্যে ব্যবসার ভেতরেও নাক গলাতে শুরু করেছে, আমার অন্য একটি শিকারে পরিণত হয়েছে! এই বন্ধুই আমার একমাত্র বিলাসকে অপসারণ করেছে, আমার দাসবর্গের শবে পরিণত হওয়ায় যার ক্রিয়া যথেষ্ট, ব্যবসায়ে আমার নির্বুদ্ধিতার কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছে এরই জন্যে। আমি মানুষটা মোটামুটি ভালো, সরল, গেঁয়ো; ব্যবসায় প্রতিভার দিক থেকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের, এমনকি আমার সঙ্গে মেশবার বিশেষ করে ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো আলোচনা করার বাধা পর্যন্ত মাঝে মাঝে ওর মধ্যে প্রকট।

আমি আগেই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যেখানে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি কী কী কারণে এই বন্ধুকে আমি কোনো প্রকার খারাপ নরকের নাগরিকত্ব দেবার প্রবৃত্তিকে বারবার অবদমিত করেছি। এর ফলে বহুবার আমাকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সে বিদ্রোহ সহজেই অন্ধকারের নীর শান্তিতে মিশে গেছে। এর জন্যে আমাকে কোনোরকম শারীরিক (মন জিনিসটা, ছেলেবেলায় ইলা আপা বলত, ঠিক বুকের মাঝখানে থাকে) সাহায্য প্রয়োগ করতে হয়নি, আমার সৌভাগ্য; ওরা আমার দ্বন্দ্ব সরব পরিচয় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল।

আমি এখন দ্বন্দ্ব উপভোগ করি না। আমার দালাল বন্ধু সমগ্র মানবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এর জন্যে কৃতিত্ব লাভের অধিকারী।

তুমি একেবারে গবেট, আহসান, তুমি একটা গবেট। তোমার ভেতরে একজন ফাঁপা মানুষ প্রাসাদ নির্মাণে ব্যস্ত, যার প্রধান পরিচয় হলো সঙ্কীর্ণতা। সেই ফাঁপা মানুষটা তোমাকে সঙ্কীর্ণতর করে তুলতে ব্যস্ত। তুমি একজন জীবন্ত ফাঁপা মানুষ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছ এবং এই জীবন্ত ফাঁপা মানুষের একমাত্র শূন্যহীনতা হলো সঙ্কীর্ণতা।

সুতরাং তোমাকে নিয়ে এদ্দিন মাথা ঘামানোটাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে পর্যন্ত তোমার সঙ্কীর্ণতম সঙ্কীর্ণতা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছি। (এখন আর করি না।)

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার সঙ্কীর্ণতা আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আহসান।

অবশ্যি এই মুক্তিলাভের জন্যে আমার সাধনা সার্থকতা লাভ করল, এই শুধু। আমার বন্ধুর মানসিক ব্যাপ্তিহীনতা এখানে একটা ঘটনামাত্র।

আমার শববর্গের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেও এখন আর আশঙ্কা নেই।

আমি ওর জঘন্যতম ও হীন কোন দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে অত্যন্ত অমায়িক হাসি স্প্রে করলুম। এখানে কিন্তু সেই ক্ষমাশালীতার মনোভাব শূন্য! আসলে যা ক্রিয়াশীল তা ওকে পরাজিত করবার জন্যে নয় বরং আমার নিজের কাছেই ওর সঙ্কীর্ণতাকে স্পষ্ট করে তোলা।

'না না ও খুব গরিব।'

'ও খুব সঙ্কীর্ণ, আসলে গরিবের জন্যে নয়।'

'ও খুব হিংসুটে, না?'

'হু!'

'তবুও তো তোমার বন্ধু!'

'তাতে কী? ও বেজায় হিংসুটে, কিন্তু হিংস্র নয়।'

'ভাগ্যিস ও হিংসুটেই, ভাগ্যিস ও হিংস্র নয়।'

'ভাগ্যিস!'

'আর ওর বুদ্ধি কিছু নেই। সব ব্যাপারেই ভাসা ভাসা জানে।'

'এই ব্যবসায় সম্বন্ধেও ওর জ্ঞান অত্যন্ত হাল্‌কা!'

'ঠিক বলেছো, ও নিজে কিছু করতে পারবে না।'

'ছি ছি পারলেই বা ক্ষতি কী? কতটুকু ও পারবে? ওকে যতই চিন্তা করবে ওর ইম্পর্ট্যান্স ততই বাড়ানো। ওকে এবার বাদ দেয়া যাক। ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা যাক। আমি ওর জনৈক বন্ধু, ক্ষতি কী?'

(এখানে যুক্তির সাহায্যে একটি তর্ক এবং তর্কই দেখানো হয়েছে, এ তর্ক থেকে কোনরকম দ্বন্দ্ব অনুমান করা ভুল হবে। এই তর্ক ভবিষ্যতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমি বা প্রস্তুতিও নয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্ম বেদনাকে স্মরণের সাহায্যে একটি বিশেষ পুরনো চেতনাকে অনুভবের প্রয়াসমাত্র।)

আমার বর্তমান সিদ্ধান্তে পা দেবার জন্যে যে বিবর্তন তার ধাপগুলো অত্যন্ত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই ধারাবাহিকতার গতিতে বাধা যত না এসেছে তার চেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে অজস্র যন্ত্রণা, যন্ত্রণার উৎকট গন্ধ এর অনুকূলে প্রকটভাবে সহায়তা করেছে। উল্লিখিত যন্ত্রণায় কেবলমাত্র যন্ত্রণাই নেই, ভোঁতা ছুরির কর্কশ বন্ধুরতা আর অপরাধ প্রবণতার সূচিভেদ্য শূন্যতায় অজস্র নেপথ্য; কিন্তু বাঙ্ময় কাঁটার কলঙ্কিত আয়োজন। এই কাঁটাগুলোই এক একটি শিবির। শিবিরগুলোতে মলিন শববর্গের করুণ বসবাস। করুণ বলেই এই আস্তানার জঘন্যতা ডাস্টবিনের মতন প্রায় দৃশ্যমান।

মাছের আমিষ, তরকারির খোসা, ইঁদুর ও বেড়ালের পচা শব প্রভৃতির সমবেত দুর্গন্ধে সমস্ত বাসাবাড়ি লেনটাই তন্দ্রাচ্ছন্ন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ক্ষমাহীন উদাসীনতাকে বারবার ঘৃণা করলেও এবং ঘৃণা করা কালেও দুর্গন্ধের প্রতিষেধকের চেয়ে দুর্গন্ধের কারণবর্গকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভাবি। মাছের আমিষের উৎপত্তি মাছ থেকেই, মাছ আমাদের একটি খাদ্য বিশেষ। প্রাক্তন বেড়ালের গৃহপালিত শিষ্ট রূপ স্মরণ করলেও অবিশ্যি ইঁদুরকে ক্ষমা করা দুঃসাধ্য। ইঁদুর আমাদের ক্ষমা করল না। কিন্তু ইঁদুরবিদ্বেষী যে-কোনো ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন যে, ফিনাইল বস্তুটার চেয়ে ইঁদুর আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত আপনার; যেহেতু ইঁদুরের (জ্যান্ত ইঁদুরের) জীবন আছে, যে জিনিসটা আমাদের মধ্যেও থাকে এবং ফিনাইলে যার অভাব।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে শববৃন্দের শাকুনিক অস্তিত্বকে আমি নষ্ট করতে চাই, আর মৃত মিসরীয় সম্রাটের বিলুপ্ত নিশ্বাসে পিরামিড গড়ার করুণ আকাঙ্ক্ষার মতন তার বিস্তৃতি ততই ব্যাপক; ভয়াবহ ভেবে আমি বারবার শঙ্কিত হই।

শববর্গের আর্তনাদ এখন আর নেই। কিংবা করলেও তাদের সেই লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও দুর্বল কণ্ঠস্বর আমার নিকট না-ও পৌঁছতে পারে। কিন্তু নিজেদের নীরবতা ও অচেতনতার মধ্য দিয়েই তারা আমার বিস্মৃতির মধ্যে বিস্তৃতি ছড়ায়।

আমার সেই দালাল বন্ধু, আমার আরেকজন বন্ধু, আমার অফিসের উর্ধ্বতন কর্মচারী, আমার বাড়িওয়ালা, আমার মা-বাবা ভাই-বোন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দ্বীপ একটিমাত্র সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আরম্ভ ও সমাপ্তিহীন অথচ সঙ্কীর্ণ একটি কঠিন শীতল নিশ্বাসে জীবিত থাকে।

লাল আলোর পশ্চাতে উদ্ধত কৃত্রিম ছুঁচলো স্তন, কালো রেখায়িত নোঙরা গাল আর মধ্যবয়স্কার ঘোলাটে চোখে যৌন আবেদন, কোনো বালকের সঙ্গে মিথুন করবার অস্বাস্থ্যকর কল্পনা, এ্যারোপ্লেনের প্রতারক ধ্বনি, বেতারে সুকৌশলে সংবাদ পরিবেশন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সেই নিশ্বাস প্রসার লাভ করে, ক্ষিপ্র গতিতে তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে গৌণ করে দিয়ে কেবলমাত্র একটি অনুভবে পরিবর্তিত হয়। এই অনুভব হলো সেই বস্ত্রখণ্ড—যা দিয়ে শববর্গের মুখ এখন অনায়াসে চাপা দেয়া যায়। চাপা দিতে এখন আর প্রয়োজন হয় না। তবে এই বস্ত্রখণ্ড নির্মাণে যন্ত্রের কত স্তর অতিক্রান্ত। তার স্পর্শের কোনো লক্ষণই তো অস্থির শববর্গকে নির্বাক করে দিতে যথেষ্ট। এরা স্টেশনের প্রচণ্ড ধোঁয়ায় আবদ্ধ। সেই ধোঁয়া সংশয়বাদীর ঈশ্বরে অস্পষ্টতা, দৃশ্যহীনতা অথচ শ্বাসযন্ত্রণায় নির্মিত। এবং সেই ধোঁয়া নির্মিত। সেই নির্মিত ধোঁয়ায় শববর্গ আবদ্ধ, ধোঁয়াসমূহের দৃশ্যহীনতা ও শ্বাসযন্ত্রণায় শববর্গ কেন্দ্রীভূত।

আমার সেই দালাল বন্ধুর সাথে অত্যন্ত মার্জিত অথচ প্রাণবান ও উৎফুল্ল হয়ে আলাপ করাকালে এমন কি তার স্ত্রীর দ্বারা আপ্যায়িত হবার জন্যে স্থূল অনুরোধকে

কৃতার্থ হয়ে গ্রহণ করতে করতেও পায়ের কাছে কোনো পিঁপড়ের গতিকে আমার অসহ্য মনে হয়।

রজনীগন্ধা ফুলের সরু, টুকরো টুকরো গন্ধময় তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য আমার হাতের মধ্যে তার দেহকে নিষ্পেষিত হবার সুযোগ দেয়। হাতের তালুর আঙুলের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাক্তন রজনীগন্ধার ধর্ষিত রূপ দেখতে দেখতে তার তেতো স্বাদ কল্পনা করে প্রথমে মুখের ভেতরে বিস্বাদ শীতলতা অনুভব করি। এই বিস্বাদ শীতলতা কোনো সংক্রামক রোগের মতন অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে ও ঐ বস্তুরই একটা অংশবিশেষ মনের বিভিন্ন কেন্দ্রে। অতি দ্রুত ও অতি প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে বলেই এই শীতলতার আয়ু সাধারণত ষাট মিনিটের একটি ঘণ্টাকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় এবং এর মৃত্যুর পর, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, আমার মনে হয়, আমি স্বাভাবিক ও সুস্থ।

তুমি তোমার শিক্ষা, কালচার, মার্জিত বুদ্ধি ও সর্বোপরি এনালিসিস দিয়ে চারদিকের সঙ্কীর্ণতা, হীনম্মন্যতা ও আনন্দকে নিম্নতম গুরুত্ব দাও, তা হলেই রজনীগন্ধার নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়ে শববর্গ নীরব বিদ্রোহ করতে ব্যর্থ হবে।

কিন্তু বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে বসে ও আমাদের একই পণ্যের ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অসাধুতা প্রসঙ্গে দলাল বন্ধুর একঘেয়ে আলোচনা শুনতে শুনতেও কোনো জনবহুল শহরের নোঙরা বস্তির জঘন্য ড্রেনের পাশের বসে মৃত কুকুরের পোকাধরা মাংস রেস্টুরেন্টের গেলাসের জলে খেতে বাধ্য হয়ে শববর্গের আর্তনাদ উপভোগ করি।

শববর্গের প্রকট বীভৎস আর্তনাদ মানসিক বিবর্তনের অজস্র স্তর অতিক্রমের পর ম্লান, বিকৃত গন্ধ ও দুর্বল হয়ে আমার রক্তে অতি ক্ষীণ একটি শব্দে প্রকাশিত হয়।

আমি অত্যন্ত ভীত হই। আমি ভয় পাই; ভয়াবহ, ধূসর, বোবা, এক চোখ কানা কিন্তু নিয়মিত জনৈক আতঙ্ক সমগ্র আমার প্রত্যেকটি অংশকে দুর্নিবাররূপে উপভোগ করতে করতে আমার প্রচণ্ড অনিচ্ছায় আমাকে ধর্ষণ করে। আমার পুরুষ, স্বামী, জনক প্রভৃতি পরিচয় এবং চেতনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তার ধারালো নখ দিয়ে আমার বিশাল স্তন চিরে ফেলে। আমার তেত্রিশ বছরের পুরুষের ভাঙা ব্রণসঙ্কুল গাল যুবতীর মসৃণ, মাংসল গাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেখানে তার মুখের যথেচ্ছ ব্যবহার। তার নোঙরা, লবণাক্ত নিশ্বাস আমার অনুভূতির অবিচ্ছিন্নতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

আমার শববর্গের যে প্রকট আর্তনাদ তার ম্লান বিকৃত গন্ধময়, দুর্বল ও ক্ষীণ শব্দ আমাকে আতঙ্কিত করে।

আমি অতি দ্রুত আমার ব্যবসাসংক্রান্ত একটি জটিল দুরুহতম কোনো হিসেবের দুরাধর্ষ শরীরের ওপর আতঙ্কের উল্লিখিত ভূমিকা নেবার জন্যে মদের সন্ধানে বের হই।

নিশ্বাসে যে প্রবাদ

গোরস্তানের এই কাহিনী আমি প্রথম করে শুনেছি আমার মনে নেই। ওরাও জানে না।

গোরস্তানকে ঘিরে এই দেয়াল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা শ্যাওলায় আবৃত। এই শ্যাওলা কোনো করুণ অনুল্লেখ্য নিশ্বাসের মতন যার উৎস হলো সূর্য, গোলাপ, নরক ও আকাশ থেকে কেবলি পলায়ন। এই দেয়াল যথেষ্ট পুরনো ও সকলের অনিচ্ছিত চেষ্টায় ক্রমশ প্রাগৈতিহাসিক। এই দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসি আমরা রোজ বিকেলে। এখানে বসে রোজ গোরস্তানের একটি প্রাচীন প্রবাদকে আমরা আন্তরিক করি।

এই অতি প্রাচীন গল্প গঠিত হয়েছে গোরস্তানকে কেন্দ্র করেই ও গোরস্তানের বিভিন্ন অবস্থা ও দৃশ্যে এই গল্প কেবলি নির্মিত। আসলে এই গল্পের আরম্ভ যেমন ধোঁয়াটে, বিস্তারও তাই। বিকেল হলেই আমরা এখানে আসি, রোজ। দেয়ালে বসি পিঠ দিয়ে, আর সেই প্রবাদ বারবার বলে আর শুনে আলোড়িত হই। এই গল্প অবশ করে না আমাদের। প্রবাদের প্রাত্যহিত মিথুনে আমাদের ক্লান্তি নেই। ক্লান্তিহীন আমরা বিরক্তহীন, বিরতিবিচ্ছিন্ন। প্রবাদের সত্যিকার অনুভবে উত্তরোত্তর আগ্রহী হই গোরস্তানের নিরাকার মাংসে। গল্প করি আমরা কেবলি; আমাদের শহরে প্রচলিত প্রবাদকে আন্তরিক করবার জন্যে কেবলি অস্থির, আমরা অস্থির, আমরা।

যখন সন্ধ্যা, বিকেলের পর, এ রাস্তায় প্রায় বন্ধ হয় লোকচলাচল। ক্রমশ নিচু হয় আমাদের কণ্ঠস্বর। নিটোল একটি আতঙ্কে আশ্রয় প্রায় কাঁপা কাঁপা শীতল কণ্ঠে। সমগ্র কাহিনীর ওপরে বয়ে যাওয়া প্রধান নদী, কয়েকটি অলৌকিক আশঙ্কার জন্যে ভয়ের দগদগে রেখা, অন্ধকারে রাস্তায় বিজ্ঞাপনের আলোর মতন তিনজন ভিতু ছেলেকে স্থিরদৃষ্টি করে। আমরা তখন গোরস্তানের প্রবাদকে ভয় পাই। নিজেদের একটুও প্রতারিত না করে আমরা ভীত হই। আমরা তখন কেউ

কাউকে চিনি না। সব বন্ধুদের নাম ভুলে যাই অন্ধকারের স্থির অলৌকিকতায়। আমরা কেউ কারো নাম জানি না। প্রবাদের অলৌকিক নিশ্বাসেরা অন্ধকারে আমাদের এক একটি নির্জনতম দ্বীপ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি, কিন্তু সবাই আমরা বিচ্ছিন্ন। তবু, একটি মাত্রই উৎস আমাদের ভয়ের। আমাদের প্রহার করে একটি সমুদ্রের জল। আমরা জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাছাকাছি আসি, মিশে যাই না যদিও। তবু আমরা আসি, তবু; মিশে যাবার জন্যে আমাদের প্রচ্ছন্ন কিন্তু সত্য কামনা আমরা কত আন্তরিক, কী বিষণ্ন আমরা আর কী ভালো। সকলেরই পরিজনদের নিশ্বাসকে স্পষ্ট অনুভব করি প্রবলভাবে চিহ্নিত ক্রুশগুলোর দিকে না তাকিয়েও। অন্ধকারের এই নির্জন ভীত মুহূর্তে মৃত পরিজনদের জন্যে, লুপ্ত (তাই কি হতভাগ্য?) সব নিশ্বাসের জন্যে স্নিগ্ধ আমরা বিষণ্ন ভালোবাসায়। কী ভালো আমরা, কী আন্তরিক। তিনজন অপরিণত বালক সকলের জন্যে ব্যাকুল হয়। গভীর অন্তরঙ্গতার একটি তৃষ্ণীভূত সময়শূন্যতায় বাপ মা ভাই বোন সবাই সেই বালকদের স্পর্শ করে, নরম, প্রবল।

বাড়ির পারিবারিকেও সেই অলৌকিকতা সংরক্ত হয় আমিতে। গোরস্তানের প্রাচীন প্রবাদ আমার রক্তে তখনো বিস্মৃতিতে ওঠে। প্রবাদের প্রাণবান জিষ্ট হামাগুড়ি দ্যায় আমাকে, আর, আর কোথায় তাকে জীবিত করবার জন্যে আমার সাধ হয়।

নীনাও খুব ভালো আমাদের মতন। আমার কেবলই মনে হয় নীনা খুব ভালো, তাই খারাপ ভালো ওর জন্যে। আমার কেবলই মনে হয় নীনা যে ধরনের ভালো, সে ধরনের ভালো হলে তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই সে ধরনে ভালোদের। নীনা খালি থাকতে চায় আমার সঙ্গে। নীনা সব সময় থাকলে আমার স্কুলের পড়া তৈরি হবে কী করে? তবু নীনা ভালো। নীনা গল্প শুনতে চায় আমার কাছে।

গোরস্তানের বহুব্যবহৃত প্রবাদের কাহিনীকে বারবার শুঁকতে, নিশ্বাস নিতে ভালোবাসে নীনা। নীনা এই প্রবাদকে ভালোবাসে। যে-কোনো জিনিস শুধুমাত্র শোঁকায় তৃপ্তি নেই। যতক্ষণ না সেই জিনিস একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলা যায়। (খুব সুন্দর স্কাল্পচার দেখলে মেজোআপা ভেঙে ফেলতে চায়, গভীর চাঁদের অসহ্য রাত্রিকে আমি ম্যাগ্নোলিয়া রজনীগন্ধাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আর গোলাপের পাপড়ি চিবিয়ে আমার শান্তি)। নীনা কি চেপে ধরে, অবিরাম টিপে পিশে ফেলতে চায় প্রবাদকে?

এই গল্প, বারবার শোনা অথচ অস্পষ্ট, অপরিচিত জীবনের এই অলৌকিক কাহিনী শোনাতে আমার এত ভালো লাগে। গল্প বলতে বলতে আবেগ আর আতঙ্ক এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আমাকে এমনভাবে ইস! হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাই রুদ্ধ হয়ে যাই আমি। আর বলতে পারি না, আর না। প্রত্যেকটি শব্দ আমার সত্যতম, হৃদয়তম আতঙ্ক, আনন্দ বিষণ্নতা আর অতৃপ্তি দিয়ে প্রবলভাবে অঙ্কিত। গভীরভাবে তখন একটি ঢেউয়েই ডুব দিই আমরা, একটিমাত্র স্রোতে। তখন

আমরা একটি জলস্তম্ভের মতো সজল, শূন্যতাহীন; অতি ভরা একটি ডিমের মতন। সূর্যের ছাড়া ছাড়া শুকনো রোদ, চাঁদের ছোপ ছোপ গলানো আলো—কিছু নয়, কিচ্ছু না, কেবল মেঘরাত্রির গভীর জলে অন্ধকার মিউজিক আমাদের, উপমা নয়, একমাত্র পরিচয়।

আমাকে আরো উদ্বেলিত করে গোরস্তানের ঝরে পড়া বিষণ্ণতাদের জন্যে নীনার এই নীরব, অন্ধকার, শান্ত দীর্ঘশ্বাস। এই কাহিনীর শেষ নেই, নীনা কি জানে? এ গল্পের প্রথম কি মনে আছে ওর? নীনা আমাকে কোনো প্রশ্ন করে না। কিন্তু ওর স্বগত দৃষ্টি আমার চেতনায় কাহিনীকে কেবলি প্রশ্নে আর জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত করে তুলতে চায়। নয় বছর বয়েসের নরম আলোড়নে নীনা কোন দীর্ঘশ্বাসের দুরূহ ব্যবসায়ী? ঈশ্বরের এই সুদীর্ঘ, দুরুহ দীর্ঘশ্বাস নীনাকে এত শেষ করে কেন? এত পূর্ণ? নীনা, লক্ষ্মী নীনাটি আমার, এত ভালো! সবাই ভালোবাসে আমাকে। এ শহরের সবাই, সবাই এ কাহিনী শোনে আর বারবার বলে, বারবার শুনতে চায়। আরো জানতে চায়, আরো।

মেজোআপাকে প্রায়ই মনে হয় আমার। ঝড়ের দিন হলেই বুকের নিচে বালিশ, কোনো ছেলেকে নিজের হৃদয় জানাবার জন্যে? (না নিজেই জানবার জন্যে?) মেজোআপা চিঠি লিখত। সমুদ্রে রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডকে বয়ে আনা বাতাসের এক ডাল থেকে আরেক গাছে, গাছের শীষ থেকে নৌকার কোনো মাস্তুলে আশ্রয় নেবার প্রবল শোঁ শোঁ আওয়াজ। সমুদ্র চেতনার গন্তব্য দেখার জন্যে মেজোআপা কতদিন কাচের জানালা তুলে দিল চিঠি লেখা বন্ধ করে। ভারি খারাপ লাগে আমার। মেজোআপা, তারা হয়ে গেলে সেই গন্তব্যকে দেখা যায়?

মেজোআপা অনেকবার আমাকে বারণ করেছে গোরস্তানে যেতে, কতবার। আমি একবারও মানিনি। এ নিয়ে কোনোদিন রাগ করেনি আমার মেজোআপাটা, আহা! কেবল বারবার বারণ করা। আর আমাকে শুধু মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে যে অলৌকিকতায় ঘেরা, প্রখর বেদনায় অঙ্কিত কোনো দীর্ঘ জটিল কাহিনী আমার অস্তিত্ব। বিশাল, চারদিকে আকাশের মতো মজবুত করে প্যাক করা কফিনের মধ্যে আমি এক হারানো আত্মা। সমুদ্রে মাছের মতো কাহিনীতে ডুবে থাকি আমি। এই অনুভব ম্যাচ্যুর্ড হতে থাকে, হাত পা শরীরের মতোই। মেজোআপার করুণ আত্মহত্যা সমুদ্রের লবনাক্তকে অতিক্রম করে প্রখর করে তোলে আমার রক্তের প্রবাহ। আমরা তিনজন বন্ধুই এই লবণাক্ত কাহিনীকে স্বাদি। দিন দিন আরো বেশি করে আমাদের মুখ চোখ ঘষা গোরস্তানের নিরাকার মাংসে। ক্লান্তিহীন আমরা তিনজন বন্ধু বিরক্তিবিচ্ছিন্ন, শ্যাওলায় ঢাকা সেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে অলৌকিক কাহিনীকে শুনতে শুনতে জন্ম দিই আরো অজস্র শব্দের, অযৌক্তিক, উল্লসিত জন্ম। ভাসতে থাকা শব্দদের জন্ম দিয়ে আমরা চেটে দেখি পিতৃত্বের স্বাদ, অবৈধ পিতৃত্ব। মেজোআপার আত্মহত্যা আমাদের সম্পদ। এই সম্পদ মৃত্যুকে ডেকে নেবার অভিশপ্ত সাধ, মৃত্যু, ঈশ্বর সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, পরলোকের ওপর

নতুন নতুন কথা তৈরি করতে সাহায্য করে। মেজোআপার আত্মা নিজেকে সহ্য করতে পারল না। মেজোআপা নিজের আত্মাকে সহ্য করল না, করল না। সবাই কি হারিয়ে যায়? আমি অনেকদিন আগে মামাবাড়ির গ্রামে হারিয়ে গিয়েছিলুম। কতদিন আগে, কতদিন। মামাবাড়ি, মামাবাড়ি, রেলগাড়ি চলে। সারারাত রেলগাড়ি সারারাত ধরে। ভোরে উঠলে মামাবাড়ির স্টেশন। ছবি কোথায় এখন? ছবি? রেণু? ববিদা?

আমরা শুধু কথা দেখি রোজ, নতুন নতুন কথা। বেশির ভাগই চিনি না, অনেক কথায় মানে বুঝতে পারি না। তবু সব কথা আমাদের কাহিনীর গঠনে আত্মলুপ্ত। আমাদের ধারণায় সম্ভব সবকিছুকে আশ্রয় দেয় এ কাহিনী। মাঠের বাঁশির মতো মৃত্যু, মধ্যরাত্রির নির্জন সঙ্গীত, নিষিদ্ধ অনুভব, অনুচিত আবেগ— সবই আছে এ গল্পে, সবাই। বিষাদ, ক্লান্তি, আনন্দ, সুখ সব, সক্কলে, সকলে।

মেজোআপার আত্মহত্যার পর কেমন যেন নীনা আর আগ্রহ দেখায় না গল্প শুনতে। নীনা এমন কেন হলো? নীনাকে কেমন দুধের মতো দেখতে চাই আমি, মিল্কি বাল্‌বের ঘর আলোর মতন। নীনা এত ভাবে কেন? বিষণ্ন, ছোট্ট, খুব ভালো লক্ষ্মী বোন আমার, নীনা এত কান্না কেন রে? নীনা গল্প শুনতে চায় না আর, আর চায় না। নীনার আর আগ্রহ নেই। নীনা, মেজোআপাও কি আসেনি আমাদের গল্পে, আসে না? গাদা গাদা গল্পের বই আর প্রায়ই বদলে যাওয়া নতুন নতুন ছেলেতে মেজোআপা আর অতৃপ্ত উদ্বেলিত নয় নিজেকে জানার জন্যে।

আর আমরা, কোনো কদর্য শিল্পীর নিজেকে বোঝার অতলতায় কাহিনীর শেষকে জানবার, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, শেষতম ক্রন্দকে নিশ্বাস নেবার জন্যে প্রবাদকে কেবলি হাতড়াই, কয়েকজন ভীরু, ইন্টিমেট ইনোসেন্ট, এত ভালো ছেলে।

আমাদের করুণ সাধ হয় আমরাও এ কাহিনীতে থাকব। আমি থাকব, থাকব ভাই, আমি থাকব। গোরস্তানের সেইসব লুপ্ত নিশ্বাসদের সঙ্গে ক্লান্ত হবার কী ইচ্ছা আমাদের। কিন্তু হায়, আমাদের জানা আছে, রক্তের সঙ্গীতে লেখা আছে, তোমরা এ কাহিনী থেকে কোনোদিন নির্জন নও। আমাদের অবচেতনে আমরা প্রবেশ করেছি এ কাহিনীতে, কেউ জানে না হায়! স্বাভাবিক নিয়মের নিয়মে আমাদের ঢোকানো হয়েছে—আমরা কেন জানি না—হায়! এক জটিল, ঝাপসা আমাদের বহুকালের বাস এখানে। আমাদের যে অংশ কাহিনীতে নির্মাণ করেছি আমরাই, তারও কত আগে থেকে সেই সব ঝাপসা চেতনাদের আশ্রয়। কত আগে থেকে কেউ জানে না। স্নিগ্ধ, ইনোসেন্ট, লাভলি আমরা এক ঝাঁঝালো মিষ্টি নেশার ঝাপ্টা অনুভব করি।

আমার ইচ্ছে হয় আমার এক ঝাঁঝালো নেশাকে ছড়িয়ে দিই নীনার অনুভবে নীনায় নীনায়। আমাদের এই অসহায় উপলব্ধিতে নীনা আরো দিগভ্রান্ত হোক কিন্তু নীনা কক্ষনো আমাকে গল্প বলতে বলে না, কক্ষনো না। শীতল মেজোআপার

নিশ্বাসকে শোঁকার বাসনায় নীনা এখন মেজোআপাকে নতুন নতুন তৈরি করে, নির্মাণ করে ধাপে ধাপে।

একদিন নীনা একজন বন্ধুকে মেজোআপার কথা বলল। নীনার সেই এতটুকুন লাজুক বন্ধু মেজোআপার কথায় অসহায়, করুণ হলো। নীনা, আরো বিষাদকে ফেস্ করে মেজোআপাকে গাইল ক্লান্ত মিউজিকের গভীর আর্তনাদে। কান্নার একটা অমোঘ ক্রান্তি এল যখন নীনা পৃথিবীর, পৃথিবীর বাইরের সমস্ত হারানো আত্মাদের জিজ্ঞাসিত অশ্রুতে স্পেসলেস। নীনা তারাদের ঝাপসা পতনের কথা বলল, অনেক পুণ্যবানদের (লুপ্ত আত্মারা সবাই নীনার কাছে পুণ্যবান) সঙ্গে মেজোআপার চিরকালের শান্তিলাভের কথা। নীনা কখন যে অন্তরঙ্গ করল গোরস্তানের প্রাচীন প্রবাদকে, প্রথম থেকে শোনা সত্ত্বেও কিছু ধরতে পারলুম না আমি। অলৌকিক ক্রুশগুলোর নীরব মহিমা অবয়ব পেল নীনার কণ্ঠে। গোরস্তানের অলৌকিক অবয়বী নিঃশব্দ সঙ্গীতেরা সজল ধ্বনিত নীনার কণ্ঠে। সেখানে সব আছে গোরস্তানের। ভোরের সবুজ ঘাস, প্রতিধ্বনি আজানের, দুপুরের নীরব রোদেরা, মধ্যরাত্রির নির্জন মনোডি—নীনার কণ্ঠে সব আছে, সবই আছে।

সেই সঙ্গীত একসময় রুদ্ধ হলো। সেই সজল সঙ্গীত যখন কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়ছে আমার বুকে ও শরীরে, ছড়িয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো অংশে, স্তব্ধ হলো। 'নীনা, নীনা! কথা বলো আরো কথা বলো নীনা! আরো কাঁদো ভাই! নীনা! নীনা!' আমি লাফিয়ে বারান্দায় এলুম, আমি শেষ-নেই-জিজ্ঞাসাদের যন্ত্রণাক্ত আবেগকে দেখলুম বারান্দায় এসে। নীনা, নীনার বন্ধু দু'জনেই জ্বলছে—বাল্বের আগুনে প্রবলতম আন্তরিক। এই শহরের অধিবাসী নীনার বন্ধু এই গল্পের সঙ্গে নিশ্চিত আত্মীয়। ওরা সহ্য করতে পারেনি এই গল্পকে। নীনার সজল সঙ্গত যখন ক্রমেই ঝাপসা থেকে ঝাপসাতরো, ওরা সহ্য করতে পারেনি শেষ অতলতায় পৌঁছাবার অনন্ত ব্যাকুলতা। নীনা আর ওর বন্ধু দু'জনকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরেছে। নরম ঘাসের জন্মের মতো নীরব, শবনম-টলটল দু'টো উন্মোচিত শরীর জীবনের প্রথম মিথুনে, মৃত্যু-নিটোল, সত্যতম কাঁদছে অসহায় সব যন্ত্রণাক্ত জিজ্ঞাসাদের। আমি দেখলুম, কাঁপাকাঁপা—আমি, আমি।

সময়কে কেঁদে বলা এই কাহিনী সমাপ্তিনির্লিপ্ত।

তোমরা এই গল্পকে সহ্য করতে পারোনি। সবচেয়ে কাছে, আরো কাছে এসে, নিজেদের আরো কাছে টেনেই কি এই অসহ্যতাকে অতিক্রম করতে চাও তোমরা? নীনা, লক্ষ্মী নীনা, প্রবাদকে তুই এড়াতে পারলি না ভাই?

নীনা আর নীনার বন্ধু, তোমরা অস্থির হবে কেবলই। তোমরা এত করুণ, এত বিষন্ন, এত ইনোসেন্ট, এতো ভালো কেন? তোমরা কেবল অসহায় হবে, অস্থির।

আমার অস্থির হই। আমরা পৌঁছব ধোঁয়াটে গল্পের শেষ অতলে যা গঠিত গোরস্তানকে ঘিরেই। অলৌকিক কাহিনীকে কেঁদে কেঁদে আমরা হাতড়ে বেড়াই

কেবলই। প্রবাদকে মিথুন করি আমরা প্রবাদের অলৌকিক মিশে যাবার প্রচ্ছন্ন সাধে। কাহিনী দিন দিন ঝাপসা থেকে ঝাপসাতরো হতে থাকে।

রাত্রি আরম্ভ হয়, আমরা রাত্রির সূচনাকে দেখি শ্যাওলায় ঢাকা দেয়াল থেকে। আমাদের হৃদয় আরো ঘন আর অস্থিরতা কেবলি দ্রুততর। দ্রুতশ্বাস আমরা শুনছি রাত্রিকে। রাত্রির আতঙ্ককে শুনছি আমরা, শুনছি। কাঁপা কাঁপা, আমাদের মন্থর কথাগুলো বহুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মতো ছাড়া ছাড়া, নেই নেই। বেশিরভাগ মুহূর্তেই কেবলি শব্দলুপ্ত, সময়শূন্য, স্পেসলেস, নিরাকার। এমনি একটি শব্দলুপ্ত মুহূর্তে আমি অন্ধকারে বিবিক্ত বন্ধু দু'জনের দিকে তাকালুম ও তারপর রাত্রির কঠিন ক্ল্যাসিক গ্রিক ভাস্কর্যকে অতিক্রম করলুম স্বল্পতম সময়ে। কোমরে মৃদুতম আঘাত দিল ছোটো দেয়ালটার স্যাঁতসেঁতে মাথা। সামনের পেছনের ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি অন্ধকার। তখন আমার কোনো দৃষ্টি নেই যেন। সন্ধ্যার ঝাপসায় অন্ধকার আমি, অন্ধকার আমি। আমার শরীরকে ঘোরালুম গোরস্তানের দিকে।

অসহায় চোখে অতর্কিত অপরিমিত বিস্ময় ঝুলে উঠল স্থির হয়ে। আতঙ্কিত, কাহিনীর সমাপ্তিবিলাসী, আমি নিঃশেষ, আমি ক্ষুদ্রতম একটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অনুভবকে হারিয়ে সময়ের মতো নিস্তেজ। একেবারে এক কোণে ম্লান একটি ঈশ্বরিত ক্রুশের ওপরে উঠে দাঁড়াল, সোজা এক অলৌকিক আত্মা প্রবাদের প্রাচীনতম কোনো। জীর্ণ সাদা কাফনের ওপর ছোপ ছোপ রঙ, মাঝে মাঝে ছেঁড়া, গম্ভীর বিশাল পোশাক। সমগ্র মুখে সাদা দাড়ি বিস্তৃত রহস্য আরো ঘন হয়ে উঠেছে। চুলের কথা মনে নেই আমার। আর ঘন ভ্রূর কদর্য অন্তরালে ওর চোখ লক্ষ করিনি। ভাগ্যিস করিনি, ভাগ্যিস!

সোজা তাকাল সেই অলৌকিক প্রাচীন অন্ধকার এবং দাঁড়াল ঘাসে ঢাকা রাস্তার ওপরে ঈশ্বরিত ক্রুশগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। আমি এখন নিরানুভব, কোনো অনুভব নেই, সময়শূন্য, স্পেস্‌লেস আমি নিরাকার দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমি কম্পিত; আর মানুষটা যাত্রা করল দক্ষিণ থেকে সোজা উত্তরের হমেল বাতাসের দিকে। একটা ঝোপে উঠল ছোট্ট আবেগের মতো ঢেউ। তারপর সব আবার নিয়মিত শান্ত। আর গোরস্তানের উত্তর দেয়াল পর্যন্ত যাবার পর অলৌকিক সেই অন্ধকার অদৃশ্য, হারিয়ে গেল কোথায়। শেষ হলো ফুল ফোটার স্বাভাবিক নিয়মের মতো, আস্তে আস্তে। আমি নিজেকে অবিশ্বাস করতে পারলুম না, পারলুম না, পারলুম না। আমি চিন্তা করতে ব্যর্থ, কথা বলতেও, ভাবতেও, আমি অনুভবহীন সময়ের মতো। আমি আজ একটি লুপ্ত আত্মাকে দেখেছি, আমাদের প্রবাদের লুপ্ত একটি আত্মা ঝাপসা অন্ধকারে প্রবলভাবে চিহ্নিত ক্রুশগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেখেছি একটি অন্ধকারতম নিশ্বাসকে, প্রবলতম অন্ধকার। সেই গাঢ়তম অন্ধকার, এই ঝাপসা সন্ধ্যায় ছায়া ফেলেছে আমার চোখের মণিতে, একাই দেখতে পেলুম আমি, একা সেই নিশ্বাস একটি ঝোপের আধ্যাত্মিক

ঘনতায় ঢেউ তুললো ছোট, আবেগের মতো। আমি আজ দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি। আজ আমি দেখলুম একটি অলৌকিক নিশ্বাসকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে একজন অন্ধকার গতি, দেখেছি, আমি, আমি। কী প্রবলভাবে অসহায় আমি, কী প্রবলভাবে। আমার, দুঃস্বপ্নের অসহায় দৌড়ের মতন দুর্বল ভয় পাওয়া আমার এমন সুযোগ এল না যে অনুতাপ করি গোরস্তানে যাবার জন্যে আমি ভয় পেয়েছি। আমি আজ দেখেছি, আমি আজ।

আব্বা, নীনা আর আমি পৌঁছলুম শহরের সবচেয়ে কেন্দ্রে। এই জায়গা কেবলই আলোকিত। এখানে আলোর উৎস অজস্র বলে সব জায়গাটাই তাই মনে হয়। শহরের এই কেন্দ্রে বড়ো বড়ো দোকানের লাফানো প্রসাধন। একেকটা দোকানের হৃদপিণ্ড বিরতিহীন স্পন্দিত। আমরা শুনতে পাচ্ছি শব্দমান, সীমিত উল্লাসে দায়িত্ববান আলোদের। আমি আজ সন্ধ্যায় শহরের পুরনো রাস্তায় বাড়ি ফিরেছি, পুরনো কদর্য রাস্তায়। আমি এক অলৌকিক রহস্যকে দেখে ম্লান ইলেকট্রিক আলোর কুৎসিত সৌরভে বাড়ি এসেছি। আমি ভালোবাসি না এ ধরনের রাস্তা। আর এখন আমরা আলোর আর্তনাদে, উল্লসিত আলোর বিস্তারে। 'এই যে, আব্বা, এখানে পাওয়া যাবে।' নীনা বললো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই তো।'

আমরা জ্বলজ্বল করা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে পৌঁছতেই লোকটা হঠাৎ তাকাল প্রবেশপথে, তারপর আব্বাকে দেখল এবং গম্ভীর উঁচুগলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যালো, মিস্টার ইলিয়াস, হ্যালো!' আব্বার পেছনে নীনা। লোকটাকে তাকালুম এবার আমি। এবং বিশেষ ধরনের সব প্রশ্নে আমি জর্জরিত মুহূর্তের মধ্যেই। সাদা আলখাল্লার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ক্রুশ? মানুষটার কণ্ঠস্বর প্রাচীন কেন এত, গম্ভীর, শান্ত?

লোকটার সঙ্গে দোকানের এককোণে সোফায় বসলুম আমরা। 'ইওর চিলড্রেন, নাইস!'

লোকটা চুমু খেলো নীনাকে। ওর ভারি, বড়ো হাত আমার মাথায়, 'গড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড!' আমার আব্বা এই শহরের একজন প্রাক্তন মেয়র। আমার আব্বা এ শহরের অনেকের পরিচিত। এই গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সাদা গাড়ি, গভীর লোকটাও আব্বাকে চেনে।

'বব কোথায় এখন?' আব্বা জিজ্ঞেস করল।

'কালকেই রাজধানীতে গ্যালো'।

'অ্যান্ড ইউর সেকেন্ড সান? ইজ হি হোম?'

'হি ইজ নো মোর!' থরথর করে কাঁপা সেই শব্দিত ডিমার্টমেন্টাল স্টোরের একটি আলোকিত কোণ দেড় কি দু'মিনিটের জন্যে অসহায় নীরব, উদ্বিগ্ন, করুণ। 'পিটি হিম, পিটি হিম, মিস্টার ইলিয়াস, প্লিজ পিটি হিম।' অসহিষ্ণু হলো লোকটার ভয়াবহ শান্ত চোখ। নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে গুটিয়ে নিল। দৃষ্টি ও মুখের রেখাকে পরিপাটি করে তাকাল আমাদের সবাইকে, তারপর কেবল আব্বার দিকে।

'আপনি জানেন,' বক্তৃতায় প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দেয়ার মতো ওর বলবার স্টাইল, 'আমাদের ধর্মের নির্দেশ হলো এই যে যদি কোনো মানুষ নিজের দৃষ্টিতে চিহ্নিত করে অলৌকিক কোনো আত্মার ছবি, তবে,' লোকটার স্বর গম্ভীর ও বিশ্বাসী হলো, 'বিচ্যুত করা হবে তাকে তার সম্পত্তির অংশ থেকে; সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে, বহিষ্কার, চিরকালের জন্যে, এমন কি মৃত্যুর পরও।'

লোকটার দীর্ঘ বাক্য শেষ হলে প্রশস্ত ঘরটায় আমরা দেখলুম কেবল সেই স্বরকেই।

'আমার মেজোছেলে আজ গোরস্তানের সবচেয়ে আগেকার একটা কবর থেকে উঠে আসা একজন অলৌকিক আত্মাকে দেখেছে। প্রত্যেক দিন বিকেলে গোরস্তানে বেড়াতে যায় ও একা, রোজ যায় একা একা। আজ সন্ধ্যার পর সেই প্রাচীন অন্ধকার শরীরকে অনুভব করে লুকিয়ে পড়লো একটা ঝোপের আড়ালে। ছোট্ট ঝোপটাকে বুকের মতো কাঁপিয়ে সেই অন্ধকার চলে গেছে একেবারে উত্তরের দিকে। রোজ রোজ একা বসে থাকত গোরস্তানে। পুওর বয়! বড্ড বেশি বুঝতে চেয়েছিল সব কিছুই, বড্ড বেশি।'

সম্পত্তি মানে কী? সমাজ থেকে বরে করে দেয়া বলে কাকে? কী আমাদের ধর্ম? আমাদের ধর্মেও কি এ রকম লিখিত আইন আছে, কিংবা অলিখিত? ভয় পেয়েছি আমি আজ। খুব ভয়। আমি আজ ছোট্ট আবেগের মতো কেঁপে ওঠা ঝোপ দেখেছি, কিন্তু কোনোদিন আমরা কেউ ওখানে লক্ষ করিনি কাউকে। আমরা কাউকে জানতুম না। সন্ধের পর নিজেদেরও না। আমরা কিছু জানিনি, কোনোদিন না। গোরস্তানে তিনজন বন্ধু আমরা রোজ বসি। আমরা তিনজন অন্তরঙ্গ, ভিতু ছেলে প্রতিদিনের বিকেলগুলোতে সংরক্ত করি আমাদের শহরে প্রচলিত একটি প্রাচীন প্রবাদ। এই প্রবাদ আমাদের গোরস্তানের নিরাকার মাংসের সাজানো পাহাড়। আমরা একদিনও কাউকে গোরস্তানের ভেতরে দেখিনি, একদিনও না। প্রবাদের শেষতম অতলে, অজ্ঞাত সীমান্তে পৌঁছবার জন্যে কী ব্যাকুল আমরা রোজ এই কাহিনীকে অন্তরঙ্গ করি, আমরা প্রবাদকে আরো জানতে চাই, আরো। আমি একটি অন্ধকার নিশ্বাসকে দেখলুম আজ। দক্ষিণ থেকে যে সোজা চলে গেল উত্তরের হিমেল হাওয়ায়। সেই গোরস্তানে আমাদের কত পরিজনদের শীতল স্পর্শ। গোরস্তান আমাদের অন্তরঙ্গ, কত আন্তরিক। আমরা গোরস্তানে যাই, রোজ যাব আমি। আমাদের ধর্ম কী? আব্বা কি আমাদের ধর্ম জানে? আমাদের ধর্মে কি অমন নিয়ম পাওয়া যায়? সেই ছেলেটা কেমন যাকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো? তার বয়েস কত! অই অন্ধকার নিশ্বাসের? ওর বয়েস কি গোনা যায়? আমার ভারি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। অই কথাগুলো জানতে চাই আমি, জানতে। প্রবাদের আত্মাকে কি দেখা যায়? সেই অলৌকিক সময় শূন্যতার আত্মা ছিল কোথায়? ওকে দেখেছি আমি। কেউ যদি জানতে পায়! যদি কেউ জানতে পায়। জানতে পায়, জানতে পায় যদি! আমাকেও কি বের করে দেয়া হবে! কোনোদিন জানতে পারবো

আমি? যে কোনোদিন বা কোনো একটি দিনে? আমার এ কাহিনীও কি প্রবাদে যোগ করা হবে? যদি করা হয়, কী হবে তবে? নীনা, নীনার বন্ধু, মেজোআপা সবাই ঘুরছে আমার সামনে। আমি একা একা কী করব? ঈশ্বর, কী করব আমি একা! করব? প্রবাদের শেষ কোথায়? আমাদের ধর্ম কী। বের করে দেয়া হবে কি আমাকেও! কোনোদিন জানতে পারব আমি, কোনোদিন! আমি তো বড়ো হয়ে যাচ্ছি; কবে জানবো হায়! আব্বা জানে? আম্মা? নীনা ও নীনার বন্ধু? সেই লোকটা, সাদা দাড়ির সেই? কবে, কবে, কোন দিন?

চিলেকোঠায়

এই বিরতিহীন ব্ল্যাক আউটের সময় কতকাল পর আজ জ্যোৎস্নার আলো দেখে বেশ ভালো লাগল। রেস্টুরেন্টে কাগজে মোড়া বাল্বের নিচে তুমুল আড্ডা থেকে ছিঁড়ে এসে নবাবপুরে দাঁড়ালে মনে হয় এ যেন জ্যোৎস্না নয়, বাতাস, এই আলোকরঙের হাওয়ায় চওড়া রাস্তা, দোকানপাট, লোকজন, ডাস্টবিন, সাইনবোর্ড, অন্ধকার বিজ্ঞাপন, নিদ্রিত ইলেক্ট্রিক তার সবই যেন ডানা ঝাপটায়। ল্যাম্পোস্টের নেভানো ঠাণ্ডা বাল্বে জ্যোৎস্না মৃদু সৌরভ হয়ে ছুঁয়ে থাকে। সূর্য থেকে চাঁদ যেমন আলো গ্রহণ করে, ঠাণ্ডা ল্যাম্পোস্ট তেমনি জ্যোৎস্না থেকে আলো মেখে মেখে নিচ্ছে। এই জ্যোৎস্নায় পিচ্ছিল হয়ে গেছে সব রাস্তাঘাট। অন্ধকার গাড়িগুলো চলে যায় যেন বরফের ওপর দিয়ে, সোজা ও দ্রুত, প্রায় কোনো শব্দ না করে। রিকশার পিঠে আলো, ঘাড়ের কাছে একটু একটু অন্ধকার, মাথায় ফের জ্যোৎস্নার মুকুট।

মুকুটের উজ্জ্বল আভায় এলিফ্যান্ট রোডের মাথায় বিকেলবেলার শেষ রোদ ঝিকমিক করে ওঠে। বাসের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অসহ্য লাগছিল। অবশেষে বাস এসে দাঁড়াল যখন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘ গ্রীবা ও পিঠের একটুখানি সাদা অংশ ওর সব বিরক্তি শুষে নিল। হাসান বাসে উঠে দেখে বসবার জন্যে কোনো জায়গা নেই, তবু একটুও কষ্ট হয় না। প্রথমে মনে হয়েছিল পেছনটা ভালো লাগলেও মুখ নিশ্চয়ই সুন্দর নয়। সব সময় এমনই তো ঘটে থাকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, না জিনিসটা ভালো। ক্লান্ত দুটো চোখ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ড্রাইভারের স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। নিচের ঠোঁট একটু একটু ভেজা, অল্প ভাঙা নোনতা গালের ওপর তিনটে শুকনো চুল আস্তে আস্তে দুলতে থাকে। মেয়েটা উঠেছে কোত্থেকে? এত লোকজন এই বাসে, কারো দিকে তাকায় না, কী খুঁজে বেড়ায় স্টিয়ারিং হুইলে? সোফিয়া লোরেনের সঙ্গে এর অনেকটা মিল দেখা যাচ্ছে। এ কি জানে তা? তবে কি সোফিয়া লোরেন কোনো ছবিতে বাসের স্টিয়ারিং হুইলে অমনি তাকিয়ে ছিল? মেয়েটা বোধহয় তাই নকল করছে। ড্রাইভারের কালো শক্ত প্রশস্ত হাত দ্বিগুণ প্রেরণায় মোড় ঘোরাতে লাগল। হাসান কেমন যেন নিশ্চিন্তির

সঙ্গে মেয়েটাকে দেখতে লাগল। ওর অজ্ঞাত গভীরে কেন যেন মনে হয়, ওদের দু'জনের গন্তব্য বোধহয় একই। গুলিস্তান থেকে হেঁটে ওরা একসঙ্গে নবাবপুর যাবে। রেস্টুরেন্টে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবে। মেয়েটা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও হাসান ওদের আড্ডার বিষয়বস্তু বদলাতে পারল না। ওর কণ্ঠ থেকে যথার্থ পুরুষের স্বর বেরুচ্ছে—মোটা, ভরা ও দৃঢ়। তর্কে সে সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছে। পলাশীর কাছে এসে বাসটা প্রবল রকম ঝাঁকুনি দিচ্ছে, সবাই বাসের মধ্যে একেবারে ঝুঁকে পড়ল আর হাসান দেখল মেয়েটা চমকে উঠে যাত্রীদের মুখের দিকে দেখছে, হাসানের দিকেও একবার চাইল, কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে নয়। তবু হাসান ফের নতুন উৎসাহে সবাইকে তর্কে হারাবার জন্যে মনে মনে যুক্তি খুঁজতে লাগল। এ রকম খুঁজতে খুঁজতে হাইকোর্টের সামনে এসে মেয়েটা নেমে পড়ল বাস থেকে। এখন অই সিটেই বারো তেরো বছরের একটা ছেলে। হাসান দেখল ছেলেটার চুল একটু লালচে। সুন্দর মুখের একটা দিক দেখা যায়, আরেক দিকে রোদের আভা লেগেছে। ছেলেটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তায় কী যেন দেখছে। হাসানের ইচ্ছে করে, বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নেবে মেয়েটাকে, কোনোদিকে যায়। কিন্তু এই বাসে, বাসের গেটে বড্ডো ভিড়।

তখন বাসের ভিড়ে দেখা যায়নি, এই জ্যোৎস্নায় হাসান দেখতে পাচ্ছে সেই মেয়ে স্টেটবাসের লেডিজ সিটে বসে বাসের মোড় ফেরানো দেখতে দেখতে ওর সঙ্গে বাড়ি চলেছে। হাসানের ভারি ভারো লাগছিল, এত ভালো যে কখন সে নবাবপুর থেকে মদনমোহন বসাক রোডে এসে পড়েছে, সেখানে থেকে ফের জোড়পুল লেনে—কিছুই স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি। জোড়পুল লেন থেকে যখন চাপা উপগলিটায় ঢুকবে তখন সে ভুলেই গেল যে এখানে নিশ্বাস বন্ধ করা দরকার—ডাস্টবিনে, রাস্তায় জ্যোৎস্না ও ময়লা উপচে পড়ছে। মড়া বিড়ালের গন্ধ হঠাৎ নাক, গলা ও বুকের মধ্যে স্বাদ ছড়িয়ে পেটের মধ্যে সেঁধে যায়। স্যান্ডেলের ফাঁক দিয়ে নালার পাশের তরল ময়লার একটুখানি পায়ের আঙুলের ফাঁকে কিলবিল করে। হঠাৎ ভয় করে, এই ময়লা কি কারো পরিত্যক্ত কৃমি? রোজকার বমি বমি ভাবটা আছে, তবে কয়েকবার পাতলা থুথু ফেলতেই ঘিনঘিনে ভাবটা প্রায় সেরে গেল। কিন্তু আজ হোসানের কী হলো, আকাশ ভরা জ্যোৎস্না, মড়া বিড়ালের ঝড়ে পড়া লোমের ফাঁকে ফাঁকে সাদা জ্যোস্না, নালার দুর্গন্ধে ভাসে ফিকে হলদে রঙের পাতলা জ্যোৎস্না, এই চাপা গলির মধ্যে বিরাট বেঢপ বাড়ি—সবই বেশ লাগে, অন্তত কম খারাপ লাগে। ঘোরতর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দোতলায় বাড়িওলার ঘ্যানঘ্যানে বৌটার কাকে যেন খানকির বেটি বলে বকাবকি, তিনতলায় রেডিও পাকিস্তানের গান—হাসান যেন এসব শুনতেই পায় না। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ছাদে উঠল। তারপর ওর ছোট চিলেকোঠার সামনে দাঁড়িয়ে চাবি বার করবার জন্যে প্যান্টের পকেটে হাত দিল।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানা, চেয়ার টেবল, শার্ট, বিছানার ওপর শূন্যতা, জুতো, কাগজপত্র সবকিছু একেবারে ভিজিয়ে ফেলেছে। এই চিলোকোঠা

যেন সমস্ত বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে থাকে। দিনের বেলা কতদিন জানলা দিয়ে লোকজন, গাড়ি, রিকশা দেখতে দেখতে মনে হয়েছে অইসব বোধহয় চেষ্টা করলেও স্পর্শের বাইরে থেকে যাবে, অইসব বোধহয় গাড়ি নয়, লোকজন নয়—চলচ্চিত্রের পর্দা। কতদিন হঠাৎ দুপুরবেলা বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে ওঠে : এই চিলেকোঠা বোধহয় শূন্যে ভিত্তিহীন একা ঝুলছে। চাঁদের আলো কি মস্ত বড়ো একটা জাল? জ্যোস্না কি আজ এই বাড়ি থেকে, জোড়পুল লেন থেকে এই চিলেকোঠাকে ছেঁকে নিতে এসেছে? আজ সবকিছু অন্য রকম মনে হয় কেন? লোমকূপ থেকে শিরশির শোনা যায় : এ ঘর আমার যেন একার নয়, এ আমার একার ঘর নয়। এ ঘরে আরো কেউ বসবাস করে। এ আমি একা থাকবার জন্যে ভাড়া নিইনি। আমার সঙ্গে আরো কেউ থাকে। সে কে? কে সেই লোক?

হলদে রঙের ঠাণ্ডা চাঁদ এই জানালা থেকে দেখা যায় না। সেই অদৃশ্য চাঁদের সৌরভ, তারই নাম হলো জ্যোৎস্না, রক্তের মধ্যে ছমছম ভয় খেলিয়ে যায়।

সমস্ত পাড়া রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর সব স্বপ্নের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো উৎকর্ণ কান সাইরেন শোনবার আতঙ্কে জেগে থেকে এইমাত্র ঘুমের মধ্যে অন্য কোনো সঙ্গীতে মগ্ন হলো। হাসান কেবল তারাদের মন্থর পরিবর্তন দেখতে দেখতে ভাবলো, এই বিন্দু বিন্দু আলোকমালায় কি ভেজা কোনো ঠোঁট দেখা যায় না? সমুদ্রের নিচে যেমন শামুক, মাছ, গাছপালা খুব মন্থারগতিতে কোথায় সরে সরে যায়, তারারা তেমনি খুব ধীরে ধীরে একেকবার একেকটা আকার গ্রহণ করে। হাসান ভাবল, এমন কেন হয়? আমি তারাদের দিয়ে ঠিক এই ছবিটি বানান করতে পারি না কেন? সে একবার এদিক দেখে, আবার ওদিক দেখে; তারারা ইংরেজি ৭ হয়, বাংলা ২ হয়, রাখাল বালকের ঊর্ধ্বমুখী বাঁশি হয়ে মৌন সুরে জ্যোৎস্না প্লাবিত করে দেয় কোনো রাগ? কী রাগিনী? কিন্তু সেই মুখ কিছুতেই আসে না। হাসান তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। সেই দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় যেন রাত্রিবেলা মস্ত বড়ো গেরুয়া প্রান্তরে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকা রেলগাড়ির অসহায় হুইস্‌লের শব্দ। সেই পাগল করা শব্দে হাসান যেন স্বপ্ন থেকে জাগরণে ফিরে এল। ঘরে ঢোকবার পর যে ভয় বুকের মধ্যে শিরশির করছিল তা জানালা টপকে বাইরে পালিয়ে যায়। এতক্ষণের ভয়টা কেটে যাওয়ায় সে ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকে। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে হাসান ভাবে বাসের সেই মেয়ে বোধহয় হারিয়ে যাচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ওর চোখ, ভাঙা গালে তিনটে চুল, ভেজা ঠোঁট সব ঝাপসা হয়ে আসছে। সোফিয়া লোরেন হাইকোর্টের সামনে নেমে পড়ছে। এখানে ওর গভীরতম নিচে হাসান খুব আকুল হয়ে স্থির করল, না, না এই সঙ্গীকে আমি কিছুতেই চলে যেতে দেব না।

অস্থির হয়ে হাসান বিছানার ওপর সোজা শুয়ে পড়ে। মেয়েটাকে ভাবতে ভাবতে বোতাম খুলে হাঁটু ভাঁজ করে প্যান্টটা বার করে নেয় পা থেকে। ভেতরে আন্ডারওয়্যার স্যাঁতসেঁতে। দুর্বল একটা গন্ধ সেই অন্তর্বাস থেকে উঠে এসে ওঠানামা করে নাকের কাছে। খুব জোরে নিশ্বাস টানলে সেই গন্ধ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। তখন সে কাত হয়ে থুথু ফেলে। শুয়ে শুয়েই আন্ডারওয়্যার খুলতে গিয়ে

দেখে, ঘাম ও ময়লায় হাতের আঙুল চটচট করছে। নাকের কাছে আঙুল ধরে গভীরভাবে গন্ধ নিলে একটু খারাপ লাগে, ভালোও লাগে।

মেয়েটার মুখ কি তাড়াতাড়ি ঝাপসা হয়ে আসে। ওকে আমি কিছুতেই এই ঘর থেকে হারিয়ে যেতে দেব না, ওকে হারালে চলবে না। প্রবল বাসনাকে বাম হাতে আঁকড়ে নিয়ে হাসান ওর শিশ্নশীর্ষে সেই হাত চেপে ধরল পরম আদরের সঙ্গে : আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, অই স্টপেজেই আমিও নেমে পড়লাম। মেয়েটার সঙ্গে আমিও কিছুদূর গিয়েছি, ও সামনে সামনে যাচ্ছে, সাদা ঘাড় কী সুন্দর লাগছে পেছন থেকে। শাড়ির রঙ মনে নেই, শাড়িতে বোধহয় অনেকগুলো ফুল আঁকা ছিল। আমরা যাচ্ছি, হঠাৎ ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হলো। কোথায় যাই, কোথায় যাই। যে বাড়িটার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম, মেয়েটা ঠিক সেই বাড়িতেই ঢুকল, এটা ওদেরই বাড়ি। কিন্তু কী করে তা হয়? খালি বাজে উপন্যাস ও সিনেমায় এ রকম পাওয়া যায়। পৃথিবী জুড়ে কি উপন্যাস ঘটে চলেছে? চলুক না। ওর শাড়ি যাচ্ছেতাই রকম ভিজে গেছে। সেই বহু ফুলের প্রিন্ট করা শাড়ি ভিজে যাওয়ায় সমস্ত দেহটা একটা মস্ত ফুলের তোড়া হয়ে ফুটে উঠেছে। শপ শপ শব্দ হয় শাড়ির, বাইরে বৃষ্টি পড়ে—ঠিক বইতে যেমন হয়, ঘরে লোকজন কেউ নেই। মেয়েটা আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে।

হাসানের তীক্ষ্ণ রক্তে উজান স্রোত কলকল করে ওঠে। ওর হাত আরো দৃঢ়, আরো গতিশীল হয়। কিন্তু এই সময় ক্ষীণ একটা প্রেমবোধ ওকে বড্ডো বিরক্ত করতে লাগল—যদিও খুব ক্ষীণ, যদিও খুব ঝাপসা। সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা 'মহিমা' দেবার জন্যে ওর মধ্যবিত্ত কাঙালপনা হ্যাংলামো শুরু করল। সুতরাং, সেই মেয়ে শুকনো জামাকাপড় পরে একটা বেতের চেয়ারে বসে থাকে। বইতে যেমন পাওয়া যায়, সোফিয়া লোরেনের ভেজা চুল ছড়িয়ে পড়েছে চেয়ারের পেছনে। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ে বাইরে। বিকেলবেলায় রাত্রির অন্ধকার ঘনায়। হাসান খুব গভীর স্বরে ডাকে, 'সোফিয়া!'

কণ্ঠস্বর কার মতো হবে? কার মতো?

'আমার নাম কে বলল তোমাকে?' হাসান বলল, 'আমার হৃদয়।'—এই পর্যন্ত এসে হাসান বড্ডো কৌতুক বোধ করে। এসব জিনিস আমার জন্যে নয়। তবু সোফিয়াকে বলতে ইচ্ছে করে, 'আমি, জানো, সারাদিন আমার যেন কাটতে চায় না। তোমার সঙ্গে কখন দেখা হবে, কখন দেখা হবে।'

এখানে নিজেকে প্রায় গেঁয়ো মনে হলো, ফিল্মি ধরনের ফাজিল গেঁয়ো। প্রেমের সিনটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া দরকার। তাই সোফিয়ার পিঠে হাত রেখে ওকে সামনে টেনে আনে। আস্তে আস্তে ওর জামার ভেতরে হাত দিয়েছে, কিন্তু একটুও নরম না—তবু হাত রেখেছে, এমন সময় খুব কঠিন কণ্ঠে কে যেন খেঁকিয়ে ওঠে, 'সুফিয়া!' সোফিয়াকে সুফিয়া বলায় হাসানের একটু খারাপ লাগে। কিংবা কল্পনাতেও কারো ইচ্ছেমতো নামকরণ করতে পারে না বলে ফ্যাকাসে ধরনের ব্যর্থতাবোধে কষ্ট পায়। সুফিয়ার আম্মা বেরিয়ে এসে আবার ডাকে, 'সুফিয়া!' হাসানের হাত শিথিল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। কোত্থেকে কালো, মস্ত

বড়ো ও শক্ত একটা লোমশ হাত এগিয়ে এসে ওর শার্টের কলার চেপে ধরে। সেই হাতের যে মালিক তাকে দেখা যায় না। একই হাতে ওর কলার চেপে ধরে, একই সঙ্গে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাড়ি চালায়। এমন হয় কী করে? সেই হাত হাসানের মুখে ঘুসি মারে। এ সময় সোফিয়ার চিৎকার করবার কথা, 'তোমরা হাসানের সঙ্গে অমন করছো কেন?' কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওর ঠোঁট, গাল, গ্রীবা কিছুই আর মনে পড়ে না। ড্রাইভার এলোপাতাড়ি ঘুসি মারছে ওর মুখে, গালে, নাকে, মাথায়। ভীষণ ভয় পেয়ে হাসান মুখ গুঁজে দিল বালিশের ভ্যাপসা চটচটে গন্ধের মধ্যে। যখনই কোনো ঘুসি আর মুখে চোখে লাগে না, তখন বেশ নিশ্চিন্তি বোধ করল। হঠাৎ ভারি খুশি হয়ে ওঠে, মস্ত একটা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

এই হঠাৎ বিপদমুক্তি আবার শরৎকালের বিকেলবেলাকে আলোকিত করে তোলে। হাসান দেখল সে আবার বাসের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। বাস এলেই এক সেকেন্ডের মধ্যে হাইকোর্ট এসে পড়বে, এই ভয়ে হাসান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারদিকের কথা মনে করে। টেলিগ্রাম বলে কাগজ হকারেরা চিৎকার করে। বিকেলবেলার শেষ রোদে এলিফ্যান্ট রোডের শুরু, নিউ মার্কেট, ঢাকা কলেজে ছাদের কার্নিশ ঝলসায়। একটা ভিখারিনি পঙ্গু ছেলেকে নিয়ে বসে আছে রাস্তার উল্টোদিকে ফুটপাথের নিচে। মেয়েটার শরীর-টরির মন্দ নয়। আঙুলগুলো সরু ও ময়লা। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, একটা টাকা দিলেই মেয়েটা ওর সঙ্গে সোজা এই চিলেকোঠায় চলে আসবে। পঙ্গু ছেলেটাকে লজেন্স দিয়ে শান্ত করে রাখা যাবে অনায়াসে। হাসান ওকে মনে মনে জড়িয়ে ধরতে চাইল, কিন্তু মিনমিন করে ভিক্ষে চাওয়ার সময় ওর হলদে দাঁতের ফাঁকে ঠোটের গোলাপি অংশে একদলা থুথু সবসময় বলকাচ্ছে। চুমু খেতে গেলে হাসানের সমস্ত মুখ নোংরা হয়ে যাবে। এত খারাপ লাগছে। ওর মুখের মধ্যে সেই ভিখারিনি যেন তার সমস্ত থু থু উগরে দিয়েছে।

হাসান তখন খুব তাড়াহুড়ো করতে লাগল এবং ভাগ্য ভালো, তখুনি স্টেট বাস এসে দাঁড়ায়। সোফিয়ার ভেজা ঠোঁট শব্দহীন। ভাঙা গাল ঝাপসা হয়ে গেছে। স্টিয়ারিং হুইলে ড্রাইভারের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরতে থাকে ক্লান্ত একজোড়া চোখ। সেগুলো স্পষ্ট করে দেখা যায় না। এক সেকেন্ডের মধ্যেই সুফিয়া নেমে পড়ল হাইকোর্টের সামনেই। হাসানকে নামতে না দিয়েই বাস গুলিস্তানের দিকে ছোটে। হাসান দ্যাখে অই সিটে বসে একটা সুন্দর ছেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। পাতলা শরীর ছেলেটার নীল রঙের প্যান্ট ও শাদা শার্টে চমৎকার দেখাচ্ছে। ওর এলোমেলো চুল একটু লালচে, কপাল ছোটো, ফর্সা গালে ভাঙনের পূর্বাভাস। গোলাপি রঙের নরম ঠোঁটে বোধহয় চুয়িঙগামের গন্ধ। একটা হাত দিয়ে জানালার কাচ ধরে রেখেছে। আঙুলগুলো সরু ও ভারি সুন্দর। হঠাৎ ওর নিজের আঙুলগুলোকে ছেলেটার আঙুল বলে ভুল হয়। তখন হাসান লক্ষ করল, ড্রাইভারের হাতে মার খাওয়া ভিখারিনির থুথুতে লেপ্টে যাওয়া ওর চোপসানো শরীরে গরম হাওয়া ঢুকছে। কেমন অস্বস্তি লাগে বলে পা দিয়ে জানালাটা ভেজিয়ে দিল। বাইরের জ্যোৎস্না আবার বাইরে গড়িয়ে পড়ল।

সোফিয়া বারবার বাস থেকে নেমে কোথায়-চলে যায় এবং হাসানকে নিয়ে বাস ছোটে গুলিস্তানের দিকে। সোফিয়ার গাল বারবার সেই ছেলেটার পাতলা ঠোঁটে লুকোয়, হাজার চেষ্টা করেও সোফিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছি ছি, একী? হাসান ভাবল, না, না, এ হয় না। এ তো আমার ছোটোভায়ের মতো। এ হয় না, ছি ছি। কিন্তু হাসানের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও সেই ছেলে গুলিস্তানে বাস থেকে নেমে কী করে কী করে জোড়পুল লেনে এই বিরাট বেঢপ বাড়ির চিলেকোঠায় এসে দাঁড়ায়। সে কোনদিক দিয়ে এল, কেন এসেছে এসব জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না হাসান। ওর গভীরতর ভেতরে কি তবে এই ভয় জেগেছিল যে বেশি ঘাঁটতে গেলে সোফিয়ার মতো একেও হারাতে হবে? হাসান তাকে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

ছেলেটা বিছানায় বসে প্রথমে হাসানের কোমরে, পরে আস্তে নিচে হাত বুলোতে লাগল। সেই সরু আঙুলগুলো থেকে কী ভয়ানক রক্ত প্রবাহিত হয়। হাসান দেখে, হঠাৎ সে ছেলেটার নোনতা গালে প্রবলভাবে চুমু খেতে শুরু করেছে। ছেলেটা তখন হাসানের জন্যে নিজের প্যান্ট খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। হাসান দেখতে চাইল প্যান্টের রঙ ঘন নীল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। মধ্যরাত্রে বাইরে বিপুল জ্যোৎস্না, অনন্ত আকাশে প্লাবন বয়ে যায়, আর চিলেকোঠায় ফ্যাকাশে অন্ধকারে চরম সুখের সাধে হাসান তাকে নিবিড় করে কাছে টানে।

তারপর যখন মর্মরিত অবসাদে ওর বলকানো রক্তের নির্যাস ঝরে পড়ছে তৃপ্ত শিথিলতায়, তখন ক্লান্ত হাতের সাদা আলোয় হাসান দেখল : বহুকাল আগে, সেইসব দিন এত ভালো ছিল, বৃষ্টির পর হাসান বাসে স্কুল থেকে ফিরছে। বৃষ্টি ধোয়া বংশালের মোড়ে বেশ ভিড়, মানসীতে কী ছবি চলছে? রথখোলায় এক হাঁটুজলে ওর বৃষ্টিবিষাদ আম্মার ছায়া, নিশ্চিন্তে ভেজা ল্যাম্পোস্ট হাঁটুজলে উদাস দাঁড়িয়ে থাকে। হাসান যখন ভাবছে এই তো এবার স্মৃতিতে আসছে সদরঘাটের ছবি, সামনেই সদরঘাট, সদরঘাটে নেমে সে জল ছিটিয়ে বাড়ি পৌঁছবে, তখন কোনো নিয়ম না মেনে ছোট বাসটা একটা স্টেট বাস হয়ে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করে। কোথায় পড়ে থাকে বৃষ্টিবুনোট বিকাল, রেনি-ডে বলে এক পিরিয়ড আগে বাজতে থাকা ছুটির ঘণ্টা। কোনো নিয়ম না মেনে সাদা শার্ট ও নীল প্যান্টের মধ্যে বসে হাসান জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। মানসী সিনেমার সামনে ভিড়, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'চলিতেছে, মুকুলে চলিতেছে' লেখা পোস্টারগুলো পড়ে থাকে কোন অতীতকালের গোপন খাপে। সেই খাপ থেকে বেরিয়ে এসে এই বিরাট বেঢপ গিজগিজ করা বাড়ির নির্জন চিলেকোঠায় হাসান উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নীল রঙের প্যান্ট বিছানার নিচে পড়ে থাকে। হাসানের লালচে চুল এলোমেলো ওড়ে, একটু ছুঁচলো ফর্সা গালে রোদের আভা লেগেছে, পাতলা ঠোঁটে চুয়িংগামের সুবাস।

পরিচয়

হুইস্কির লম্বা বোতল ভালো করে ধরতে না ধরতে শরীরটা তার টলোমলো করে ওঠে। ব্ল্যাক আউটের এই থিকথিকে রাতে খাস স্কচ হাতে তাকে ফিরতে দেখে মহাজন প্রথমে কোনো কথাই বলবে না, বোতল হাতে নিয়ে কাগজ-মোড়া বাল্বের নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে, সে প্রায় মিনিট পাঁচেকের পরীক্ষা। তারপর ঘরের পেছনে তার রিকশার গ্যারেজে ঢুকে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে থাকা আবদুলকে টেনে তুলবে তার চুলের ঝুঁটি ধরে, 'চুতমারানি, বুইড়া হারামজাদা, দ্যাখ, চক্ষু দুইটা মেইলা চাইয়া দ্যাখ!' ঘুম ঘুম চোখ খুলে আবদুল তার মুখোমুখি দাঁড়ালে মহাজন বলবে, 'গোলাপানে গিয়া বিলাতি লইয়া আহে, আধা ঘণ্টা ভি লাগল না। আর তরে পাঠাইলাম, খানকির বাচ্চা দুইটা চক্কর না দিয়া আইয়া পড়ল, কি? নাইক্কা!' নেশাগ্রস্ত ফকিরচাঁদের ভাঙাচোরা কালোমুখে বসন্তের দাগ ও গালের গর্তে উপচে পড়া কোঁচকানো হাসি জুম্মন আলীর চোখে চুয়িঙগামের মতো সেঁটে থাকে। চোখ দিয়ে সেই হাসি চুষতে চুষতে যাকে বলে পথভ্রষ্ট হওয়া তার সেই দশা ঘটে। নইলে এই রাস্তায় তিন পা পরপর সিগ্রেটের দোকান, আর সিগ্রেট কিনবে বলে সে কি না হাঁটা দিল উলটোদিকে।

দোকানটা অবশ্য বড়ো। রাত্রিবেলাতেই এর জৌলুস। এখনো এই একটিমাত্র বাল্বের অষ্টেপৃষ্ঠে কাগজ জড়িয়ে আলো বেঁধে রাখলে কী হবে, এই দোকানকে তবু গাঢ় বেগুনি রঙে শাসিত জমকালো ছবি মনে হয়। দোকানের তিনদিকে শেলফে হরেক রকম জিনিস। দোকানদারের বসবার জায়গায় পেছনের শেলফ থেকে কখনো কখনো কেরুর জিন কি সিংহ মার্কা হুইস্কি কিংবা কিছুই না থাকলে বাংলা বেরিয়ে আসে। জুম্মন আজ প্রথমে এখানেই ঢুঁ মেরেছিল; কিন্তু দোকানদারের 'এইটা মদের দোকান না পান সিগ্রেটের দোকান?'—এই প্রশ্নবোধক জবাব শুনে আর দাঁড়াবার ভরসা পায়নি।

জুম্মন চার প্যাকেট সিগ্রেট চাইল। মহাজন সাত আট প্যাকেট নিতে বলেছিল, কিন্তু মহাজনের সঙ্গীটি এসেছে প্যাকেট তো সব তার পকেটেই ঢুকবে, অত সিগ্রেট নেওয়ার দরকার কী?

দোকানদার তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আপনমনে পান সাজতে সাজতে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির সঙ্গে কী নিয়ে সে ঠাট্টা করে, কাউকে ডেকে আনতে বলে, একটা বক সিগ্রেট ধরিয়ে লোকটা তাঁতিবাজারের দিকে চলে যায়। দোকানদার পানে ফের চুন লাগায়, আরেকজন যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস করে, ফুটোওলা কৌটো থেকে ঝিরঝির করে জর্দা ঢালে। বিরক্ত হয়ে জুম্মন আলী যে পাশের দোকানে চলে যাবে তার উপায় নেই, কারণ দশ টাকার নোট দিয়ে রেখেছে আগেই। কিছুক্ষণ পর চার প্যাকেট ক্যাপেস্ট্যান তার হাতে তুলে দিতে দিতে দোকানদার বোতলের দিকে ইশারা করে, 'কই পাইলি?'

'পাইছি!' খুচরো পয়সা নেওয়ার জন্যে জুম্মন হাত বাড়ায়।

'পাইছি!' দোকানদার মুখ ভ্যাংচায়, 'পাইছি! জিগাই কই পাইলি?

তার ধমক দেওয়া শুনে উলটোদিকের মেঝেতে-মাটি-বেরিয়ে-পড়া বাড়ির রকে বসে থাকা চার পাঁচজনের ভিতর থেকে দু'জন এগিয়ে চলে আসে।

'কী হইছে?' ফ্যাকাসে চেহারার পাতলা গোঁফওলা লম্বা একজন লোক জুম্মনের গা ঘেঁষে দাড়িয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে, 'রশীদ মিয়া, কী হইছে?'

'কী হইছে, দ্যাখেন!' দোকানদার জুম্মনের হাতের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে জুম্মন বোতলটা লুঙির কোঁচায় লুকোতে চেষ্টা করে। ফ্যাকাসে চেহারা জোরে হেসে ফেলে। তারপর জুম্মনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে হাসি হাসি মুখেই জিজ্ঞেস করে, 'মালটা তো এক লম্বর, পাইলি কই?' উলটোদিকের রকে বসে থাকা বাকি দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কম্যান্ডার কই?'

'আর কম্যান্ডার! দ্যাখেন গিয়া আমাগো কম্যান্ডার পইড়া রইছে নিতাই সুরের বাড়ি। বিলাতি উলাতি পাইছে, আর কই যাইব?' রশীদ মিয়ার এই কথা শেষ হতে না হতে যে লোকটা একটু আগে বক সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়ে গেল সে এসে পড়ে, তার সঙ্গে ঘন নীল রঙের চাপা প্যান্ট পরা ২০/২২ বছরের একটা ছেলে, এই ছেলেটির হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। ফ্যাকাসে চেহারা হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'কম্যান্ডার, করো কী? করো কী? আগুন জ্বালাইয়া রাখছো?' কম্যান্ডার বিশেষ আমল না দিয়ে দোকানদারের দিকে তাকায়, 'কী হইছে কী? হাউকাউ কিয়ের?'

জুম্মন আলী পড়ে গেছে সকলের ঠিক মাঝখানে। তবে তাকে কেউ স্পর্শও করে না। সে কেবল রাস্তায় দিকে দেখছে, তার দেরি দেখে মহাজন নিজেই যদি চলে আসে তো তাকে ঠিক কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু রাস্তায় অন্ধকার, মনে হয় রাস্তার সবটাই বাড়িঘরের দখলে। অন্ধকার পেয়ে দুই দিকের উঁচু উঁচু বাড়িঘর অবৈধ মিলনের জন্যে কাছাকাছি চলে এসেছে, তাদের মাংসহীন হাড়হাড়ডির

সম্ভাব্য খটাখট বেজে ওঠবার আগেই রশীদ মিয়ার বিলাপ শোনা যায়, "আপনেগো চোটপাট খালি আমার উপরে। দুই চাইরটা বোতল রাখি কাগো লাইগা? আরে মহল্লার মানুষই তো রাইত একটা দুইটা বাজলে আইয়া জিগায়, 'রশীদ মিয়া আছে?' তাও ভি রাখবার দিবেন না! আর পোলাপানে গিয়া দশটা মিনিটও ভি হয় না, এক্কেবারে বিলাতি লইয়া আহে! কারা বেচে বোঝেন না?"

কারো সাথে পাছে চোখাচোখি হয় এই ভয়ে জুম্মন আলী দু'দিকের বাড়ির ছাদ দেখতে শুরু করে। সমস্ত পাড়া অন্ধকার, মাঝে মাঝে স্তূপাকৃতি ঘন অন্ধকারের ভিতর পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে থাকে একেকটা বাড়ি, গাঢ় অন্ধকারের মাঝে মাঝে সরু হালকা অন্ধকার হলো দুই বাড়ির পাশে সরু গলি। রাস্তার উলটোদিকের দু'টো বাড়ির পর এই রকম রোগা একটি গলিতে একটা বাড়ির তিনতলা কি চারতলার দেওয়ালে ইটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বটগাছের পাতায় চাঁদের আলো আটকা পড়েছে। সমস্ত গলির কেবল ঐটুকু জায়গায় চাঁদের চাল-ধোয়া-জলের রঙ আলো বটের পাতায় শুয়ে থাকে। চোখ সেদিকে থাকলেও জুম্মন ঠিক বোঝে যে কম্যান্ডার শালা কাগজ-চোঁয়া আলোতে বোতলের লেবেল পড়ছে। কম্যান্ডার হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে ধমক দেয়, 'ভাগ!' তখন জুম্মন টের পায়, এই বোতল তারই, কখন তার হাতছাড়া হয়েছে সে বুঝতেও পারেনি। অথচ মহাজন বেচারা কী অস্থির হয়েই না তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে মহাজনের সঙ্গে যে লোকটা বসেছে, সিংহ মার্কা বোতলের প্রায় সবটা তো সে একাই মেরে দিল। এই লোকটা বোধহয় মহাজনকে ময়দার পার্মিট উর্মিট দেয়, প্রায়ই আসে, খেতেও পারে শালা। মহাজনের খাওয়া শুরু হবে এখন, এই বোতল নিয়ে ঘরে পৌঁছবার পর। এখন খালি হাতে ঘরে ফিরে বেচারার মুখটা একেবারে গর্তসর্বস্ব হয়ে পড়বে।

সমস্ত শক্তি গলায় এনেও জুম্মন ফ্যাসফ্যাস করে, 'বোতল দ্যান!'

এ রকম ধৃষ্টতায় সবাই অবাক হয়ে যায়। কম্যান্ডার বলে, 'লাইসেন দেখা!'

এদিকে পুলিশও এসে পড়ে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এখানে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পুলিশ দেখা যায়। পুলিশ এসে পড়ায় সবাই নিজ নিজ অবস্থানের একটু পরিবর্তন ঘটালেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা যা বলছিল সে আর বন্ধ করে না। এখন কম্যান্ডারের হাতে বোতল নেই, রশীদ মিয়ার হাতে তো নেইই, ফ্যাকাসে চেহারার হাতও খালি,—বোতল কি হাওয়া হয়ে গেল?

পুলিশ কম্যান্ডারের কাছে দাঁড়ায় 'কী ভাই, কী ব্যাপার?'

শাঁখারিবাজার ডিফেন্স পার্টির কম্যান্ডার তাকে পাত্তা না দিয়ে একজনকে বলে, 'কাউলকাও আইছিল, না? খালি ঘুরাফিরা করে?'

সেই লোকটা জবাব দেয়, 'আমি তো এ্যারে রেগুলার দেখতাছি', তারপর জুম্মনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এই ব্যাটা, পরশু দিনকা তুই তেরো নম্বরের ছাদে উইঠা লাইট মারছিলি না? তরে তো ডেইলি দেহি, কেল্লায়?'

রশীদ মিয়া ফের বলতে চেষ্টা করে, 'আরে কারে কী কন? নিতাই সুরের ঘর থাইকা বিলাতি মদ— ।' কিন্তু তাকে আড়াল করে একজন জুম্মনকে জোরে ধমক দেয় 'ব্যাটা তর বাড়ি কই?'

এদিকে কম্যান্ডার পুলিশকে নিভৃতে নিয়ে কী আলাপ সেরে ফিরে আসে। পুলিশকে পাঁচটা টাকা দিয়ে তার বোতল উদ্ধার করবে—এই আশায় জুম্মন পুলিশের দিকে এগোচ্ছে, আর অমনি কে যেন তার ঘাড়ে হাত রেখে মাথায় জোরে গাট্টা লাগায়, 'শালা গাদ্দারের বাচ্চা গাদ্দার! ইস্পাইং করো, না?' তার গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে কম্যান্ডার চিৎকার করে ওঠে, 'ব্যাটা, তর দ্যাশের নাম কী?'

জুম্মনের গলা থেকে স্বর আর বেরোয় না। কিন্তু কম্যান্ডারের দেশপ্রেমে-নিসপিস-করা হাত শিথিল করে দেওয়ার আশায় বলে ফেলে, 'উত্তর মৈশুণ্ডি।' এই ভুল জবাবে সবাই ফের অবাক হয়ে যায়। ফ্যাকাসে চেহারার পাতলা গোঁফওলা জিভ দিয়ে অবিরাম ৎচ ৎচ ধ্বনি করে তার অসন্তোষ জানায়। তারপর সে তার লম্বা শার্টের পাশ পকেট থেকে চশমা বার করে নাকে লাগিয়ে জুম্মনকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে। জুম্মন তাড়াতাড়ি নিজের ভুল সংশোধন করল, 'না, গ্যাণ্ডারিয়া, লোহার পুলের ঢালে।'

কয়েকজন জোরে হেসে ফেললে রশীদ মিয়া নিতাই সুরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে শেষ চেষ্টা চালায়, 'পোলাপানেরে এইগুলি কী আলতু ফালতু কথা কন! আগে জিগান উই হালায় বিলাতি মাল কই পাইল! লাইসেন নাই, বিলাতি অরে বেচল ক্যাঠায়?' ফ্যাকাসের জিভে তখন আক্ষেপ চুলকায়, 'মর্নিং শোজ দি ডে। যেই পোলায় ইস্পাইং করবার পারে বড়ো হইয়া উই যে কী করব কেউ কইতে পারে?' জুম্মনের মাথায় কম্যান্ডারের আরেকটি চাঁটি পড়ল—এবার একটু আস্তে, হয়তো কম্যান্ডার একটু ক্লান্ত কিংবা জুম্মনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কম্যান্ডারের গলার তেজ কমেনি, 'রঙবাজি করো, না? দ্যাশের নাম ঠিকই জানে, মগর হেইটা কোন দ্যাশ? ব্যাটা ওয়ারলেসের টান্সমিটার কই রাখছস, দেহি!'

রশীদ মিয়া হাল ছেড়ে দিয়ে ফের পান সাজতে শুরু করে।

ফ্যাকাসে চেহারা তার ঘাড়ে একটা গাট্টা মেরে বলে, 'ব্যাটা যেই দ্যাশের খাবি পরবি সেই দ্যাশেরই দুষমুনি করবি?'

এরপর সবাই একটু আধটু মারে। তবে জুম্মনের খুব একটা লাগে না, নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে সারাটা শরীর সে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে। আর এছাড়া এগুলো ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত হাতের মারধোর নয়, যা করছে নেহায়েৎ কর্তব্য পালনের খাতিরে। বেশ কয়েকটা পড়ার পর পুলিশ এগিয়ে এসে জুম্মনের হাত ধরে এবং উদ্বুদ্ধ জনতার উদ্দেশে বলে, 'ছাইড়া দ্যান ভাইসব, নিজেগো হাতে আইন তুললা লইয়েন না। দ্যাশে সরকার আছে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন সরকারের দায়িত্ব।' এই বাক্য সকলের নীরব অনুমোদন লাভ করে, জুম্মনকে নিয়ে পুলিশ এগিয়ে যায় গলির মাথার দিকে। আলো-চাপা-দেওয়া বাড়িগুলো মাঝে মাঝে হাওয়া ছেড়ে

দিলে জুম্মনের গলায় ভিতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঠেকে। এ রকম ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক কোথায় পাওয়া যায়, কেথায় পাওয়া যায়—মনে করার জন্য একটু ভাবতে না ভাবতে পৌঁছে যায় গলির মোহনায়, এখানে চারটে রাস্তা মিলিত হয়েছে, জনশূন্য রাস্তায় জোয়ার ভাটা নেই, একদিকে ভেড়ানো পুলিশের নীল রঙের জিপ। সামনে বসে থাকা জাঁদরেল পুলিশের সঙ্গে এই সাদামাটা কাঠমার্কা পুলিশ কী কথা বলে, জাঁদরেল বলে, 'উঠিয়ে দাও।'

জুম্মন এবার বোতলটা চেয়ে নেওয়ার কথা ভাবে, কিন্তু কিছু বলার আগেই তাকে জিপে উঠে বসতে হয়। জিপের সামনে ছোট জটলা, ডিফেন্স পার্টির উৎসাহী কর্মীরা সব নিজেরাই বিদেশী গুপ্তচরদের ধরিয়ে দিচ্ছে—এই জন্য জাঁদরেল তাদের ধন্যবাদ দেয় এবং আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। জুম্মন ভাবে, এইবার বোতলটার কথা জিগাই। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দেয়।

জিপের পেছনে বসেছে জুম্মন আলী, কিন্তু সিটে নয়, নিচে। তার হাত বাঁধা, কষে বাঁধা বলে আঙুলগুলো অবশ হয়ে আসছে, কবজিতে টনটন করে। মাথা এখনো ঝিমঝিম করে, চাঁটি দু'টো দিয়েছিল কে? যে-ই দিক, ওস্তাদের কবজি, এত অল্পে তার মাথা এতক্ষণ ধরে ঝিমঝিম করার তো কথা নয়। ওর কপালে কি আরো মার আছে? এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?—এতক্ষণ পর এই ফালতু জিজ্ঞাসা তাকে সুড়সুড়ি দিলে সে বিরক্ত হয়ে মাথা উঁচু করল। পেছনের সিটের মুখোমুখি হাঁটু মুড়ে বসেছে বলে সিটে বসে মাথা নিচু করে থাকা দু'জনকে দেখা যায়। একজন সাদামাটা পুলিশ। আরেকজন ষণ্ডামার্কা লোক, তার হাত বাঁধা; এই লোকটাকে দেখে সে একটু চমকে ওঠে, না সে অন্যলোক। এই এক সেকেন্ডের ভুল কেটে গেলে সে হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে দিল। এরা যে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে একদিক থেকে তার ভালোই হলো। টাকা পয়সা সব শেষ করে খালি হাতে গেলে মহাজন তার ঘাড়ের মাংসের সঙ্গে হাড় ও রগ সব থেঁতলে দেবে। লোকটার রাগের কোনো ঠিক ঠিকানা করা যায় না। জুম্মন আলীর উপর মাসে অন্তত একদিন রাগ ঝাড়ে, মহাজনের ধারণা, মাঝেমাঝে টাইট না দিলে লোকজন খুব ঢিলা হয়ে পড়ে। তার ওপর এখন তার নেশার মুখে এ রকম খালি হাতে যাওয়া! নাঃ, মহাজনের খুব কষ্ট হবে, সারাটা রাত্রি তার কাটবে না ঘুমিয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করবে। জুম্মনও নেই যে শরীরটা ভালো করে মালিশ করে দিয়ে তাকে ঘুম পাড়ায়। এইতো মহাজনের কথা ভাবতে ভাবতে মহাজন নিজেই এই গাড়িতে উঠে এসেছে। মহাজন হালার হায়াৎ আছে! জিপে উঠে এক নাগাড়ে লোকটা কী বলে যাচ্ছে। জুম্মনের ঝিমঝিম করা মাথা মহাজনের মোটা-চিকন কণ্ঠস্বরের ঘা খেয়ে ঝরঝরে হলে ঘাড় ঘুরিয়ে সে সামনের দিকে তাকায়। কোথায় মহাজন! জাঁদরেল পুলিশ ওয়ারলেসের সামনে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে অদ্ভুত ভাষায় কী বলছে। কিংবা বাংলা ভাষারই দুর্বোধ্য কোনো প্রকাশভঙ্গিতে সে কারো

সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, একই ধ্বনিপ্রবাহের পুনরাবৃত্তিতে মনে হয় কেউ তার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। সায়েবদের এই সব কায়দাকানুন দেখে জুম্মনের হাসি পায়, এদের ভিতর সব সময় একটা খেলা খেলা ভাব। সায়েব মানুষের ছেলেমানুষি সহজে কাটে না। এই যে জাঁদরেল সায়েব কাল্পনিক কি জ্যান্ত কোন মানুষের সঙ্গে এত কী বলছে ওর এলোমেলো কেশরাশিতে এই কথাবার্তা মশার মতো ভনভন করে, মাথার ভিতরে আর ঢোকে না। এই একটানা ভনভনানিতে জুম্মনের বড়ো ঘুম পায়। হাঁটুতে মাথা গুঁজে দিলে সমস্ত আওয়াজ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ে।

হঠাৎ করে গাড়ি থেমে পড়লে সকলের সঙ্গে জুম্মনকেও নেমে পড়তে হয়। চারদিকে অন্ধকার, জুম্মনের মাথায় স্থগিত নিদ্রার খামচানি; সুতরাং প্রথমে চোখে পড়ে কেবল সিঁড়ি, পাঁচ ধাপ সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় ওঠবার পর একটা আলোবাঁধা ঘর। ঝাপসা আলো চোখে সয়ে এলে বোঝা যায় ঘরটা বড়ো। ঘরের চেয়ার টেবিলও দেখা যায়। সেখানে ওদের দাঁড়াতে হয়। দরজা দিয়ে বাইরে তাকালে বাইরের ঘোরতর অন্ধকার আস্তে আস্তে খোসা ছাড়ায় এবং কালচে কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকা ঘরে ঢুকে তাকে কবজা করে ফেলতে চায় : এই পাহাড় কি পাহাড়? এই ছদ্মপাহাড় তাকে ভয়ানক জোরে একটা ধাক্কা দিল, তার মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সেই ষণ্ডামার্কা লোকটির সঙ্গে তাকে লোহার মস্ত দরজা পেরিয়ে ছোট একটা ঘরে ঢুকতে হয়।

একজন সাদামাটা পুলিশ বলে, 'বইসা থাক।' তারপর দরজার বাইরে গিয়ে দরজা ঠেলে দিতে দিতে 'প্যাশাব করনের ভাণ্ড আছে' বলে আঙুল দিয়ে ঘরের একটা কোণ দেখিয়ে দেয়। সেখানটায় ঘন অন্ধকার। সাদামাটা পুলিশ লোহার দরজা বন্ধ করে ক্লিপক্লাপ চাবি লাগায়। এই শব্দটা বেশ মিষ্টি, এই শব্দে জুম্মনের মাথাটা নির্ভার হয়ে যায়, মাথা ঘুমে নুয়ে পড়ে, চোখ দুটো ভালো করে মেলে সে ঘরের ভিতরটা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পাশের ঘরের কাগজবাঁধা জ্বরজ্বর আলোর নেতানো একটা হাত এদিকে এসে পড়লেও এই ছোট্টো ঘরটার সবটাই বলতে গেলে অন্ধকার। চারদিকের পুরু অন্ধকার বর্ডার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ওগুলো হচ্ছে এই ঘরের দেওয়াল। ঘরটা ছোটো, মোটা মোটা লম্বা শিকওলা দরজা ছাড়া বাকি সব এই সরপড়া অন্ধকারে ঢাকা। এরই ভিতর দিব্যি পা ছড়িয়ে বসেছে তাদের সঙ্গে একই জিপে আসা ষণ্ডামার্কা লম্বা লোকটা। এই অন্ধকারে ঠাসবুনুনি অন্ধকার একটা ঝোপ ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোনো লক্ষণ টের পাওয়া যায় না। জুম্মন তার উলটোদিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। মেঝে ঠাণ্ডা, হিম একটা স্পর্শ তার পাছায় শিরশির করে উঠে মেরুদণ্ড বেয়ে ওপরে চলে যায়। এই স্পর্শ তার পরিষ্কার মাথায় মহাজনের ছবি লিখে দেওয়ার উপক্রম করছে, এমন সময় উলটোদিকের ঝোপমার্কা অন্ধকার শর্নশন করে নড়ে ওঠে, 'লাইট দ্যাখছিলি, না?' লোকটার কণ্ঠস্বর ভাঙা, কথাও বলে জড়িয়ে জড়িয়ে, কী বলছে জুম্মন ঠিক বুঝতে পারে না।

'তরে শাঁখারি পট্টি থন ধরছে না?'

জুম্মন জবাব দেয় 'হ।'

'ছাদের উপরে উইঠা ইন্ডিয়ার প্লেনের দিকে লাইট মারছিলি, না?'

এবারও জুম্মনের জবাব না-পেয়ে লোকটা ধমক দেয়, 'চুতমারানি, কথা কস না?' এই কথা বলে সে কাশতে শুরু করে। কাশির দমকে জুম্মন একটু সরে বসে। কাশের বিরতি দিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাটা, শাঁখারিবাজারে ছাদে উইঠা লাইট মারছিলি, তুই তো মালাউন, না?'

'না তো!'

'তাইলে ইন্ডিয়ারে সাপোর্ট করিস ক্যামনে?' বলতে বলতে ঝোপমার্কা অন্ধকার বেশ ফুলে ওঠে, তার ভাঙাচোরা গলার ভিতর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসে, 'আমার লগে রঙবাজি করস, না? তর জাত কি ব্যাটা?' জুম্মনের মাথাটা ফের ঝাপসা হতে শুরু করে। এত সব প্রশ্নের জবাব সে কী করে দেয়? সব প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দেওয়া যাবে—তাও মনে হয় না। সেই ফাঁপানো অন্ধকার আছড়ে পড়লে বিপদ, তাই তাড়াহুড়ো করে সে জবাব দেয়, 'রিকশাআলা।' কোনো কোনো রাত্রে তাকে জড়িয়ে ধরে মহাজন কথা দিয়েছে, 'আর দুইটা বছর যাউক, তরে রিকশা দিমু একখানা।' তবে এত আগে নিজেকে রিকশাওলা বলে পরিচয় দেওয়াটা তার ঠিক হলো না। লোকটা এইজন্য বোধহয় খুব রেগে যাচ্ছে। সে কী করে ধরা পড়ে গেল না ভেবেই জুম্মন আলী তাড়াতাড়ি সংশোধন করে, 'অখনও হই নাই, ফকিরচাঁদ মাহাজনের রুটির দোকানে কাম করি!'

কিন্তু লোকটার রাগ তাতে বরং আরো বেড়ে যায়, সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'ব্যাটা, গাদ্দারের বাচ্চা গাদ্দার! আমি কী জিগাই আর চুতমারানি কী কইতাছে! লাইট মরিস নাই তো তরে থানার মইদ্যে লাইয়া আইছে রং করনের লাইগা, না?'

দরজার ওপার থেকে কে ধমকে ওঠে, 'চুপ!'

জুম্মন আলীকে থানায় ধরে নিয়ে এসেছে, তার সামনের অন্ধকারে পাতলা ধোঁয়ার একটা পরত জমে, এটা তাহলে সূত্রাপুর থানা। তার ইচ্ছে করে, উঠে দাঁড়িয়ে দরজার শিকে মুখ রেখে বাইরেটা একটু দেখে নেয়। কিন্তু এক্ষুণি 'চুপ' বলে যে হুঙ্কার দিল তার বসার জায়গাটা দরজার ঠিক ওপারেই। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যায়। কিন্তু হাতে তার অবসাদ। তার মাথা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে উঠছে, পরতে পরতে পর্দা পড়ে, বোঝা যায় পাহাড়ের উপত্যকা মনে হয়েছিল যেটা সেটা হলো লোহার পুলের এ দিককার ঢাল, এই ঢালের বাঁদিকে লালরঙের থানা, আরো একটু এগিয়ে গেলে পুলের ওপরে ওঠা যাবে। পুলের নিচে কালো দোলাই খাল। মাথার ভিতরে টাঙানো নোতুন ধোঁয়ার পর্দায় লেখা হচ্ছে কালো জলের ঢল। বর্ষায় নতুন ঢল এসে জ্বরে ধোঁকা খালের চামড়া-ওঠা পাড়ে পাড়ে জলপট্টি লাগিয়ে দিচ্ছে। পুলের রেলিং থেকে ন্যাংটো, আধ-ন্যাংটো কালো ছেলেরা লাফিয়ে পড়ছে

খালে, বর্ষার ঘোলা জলে তোলপাড়। হঠাৎ করে জুম্মনের হয়তো মনে পড়ে গেল, অনেকক্ষণ ধরে একটা রিকশাও ঠেলা হয়নি। জল থেকে উঠে পুলের তীরে দাঁড়িয়ে শরীরটা কোনোরকমে নিংড়ে ফেলে ও চলে যাচ্ছে পুলের ঢালে, থানারও শেষ মাথায়। রিকশার পেছনে ঠেলে পুলের ওপর কোনো রকমে তুলে দিতে পারলেই প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে পাঁচটা পয়সা পাওয়া যায়। একেকটা রিকশার পেছনে কী সুন্দর সুন্দর ছবি, সে সব দেখার অবশ্য সময় হয় না। দুটো হাতই রিকশার পিঠে রেখে ঠেলতে হয়, চোখ থাকে নিচের দিকে, রোজ দেখতে দেখতে রাস্তার প্রতিটি ইঞ্চির ভূগোল মুখস্থ হয়ে গেছে। রাস্তা দেখতে দেখতে রিকশা ঠেলছে, রিকশা ঠেলছে, রিকশা ঠেলতে ঠেলতে মাথা ঝুঁকে পড়ে। মেঝের ঠাণ্ডা স্পর্শ আর বোধ করা যায় না, মাথা ভারি হয়ে সামনে ঝুলে পড়ছে। বড়ো ঘুম পায় তার। দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে সে আর রিকশা ঠেলা দেখতে পাচ্ছে না। তার ভরাট মাথা কেবল নুয়ে নুয়ে আসে। সেই নোয়ানো মাথায় লাটমিয়ার বাপের ধ্যাবড়া হাতের গাট্টা পড়ছে। সূত্রাপুর ট্রাফিকবক্সের পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে লাটমিয়ার বাপ খুব মারছে ওকে। লাটমিয়ার বাপের শরীর কাদা কাদা ঘামে চপচপ করে, এই শরীর শুকিয়ে গেলে না জানি আরো কত শক্ত হবে। তার খোঁটা খোঁটা দাড়িওলা ঝুঁকে পড়া মুখ কখনো বন্ধ হয়, কখনো খোলে। তার এককটা ঘুসির ওজন কত! মাথাব্যথার তীক্ষ্ণ ডাকে জুম্মনের ঘুম ভেঙে যায়, হাঁটুতে গুঁজে-রাখা মাথাটা তুললে কেবল মাথাব্যাথা ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না। জুম্মন তখন মাথার তালুতে আস্তে আস্তে হাত দিলে জায়গাটা কনকন করে ওঠে, শাঁখারিবাজারের সন্ধ্যাবেলা মনে পড়ে। বোতল কেড়ে নিয়ে তার মাথায় কে যে মেরেছিল আর মনে নেই। কিন্তু শাঁখারিবাজার মনে পড়বার পরও লাটমিয়ার বাপকে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না। সামনের ঝোপমার্কা অন্ধকার ঘুমিয়ে পড়েছে, তার নাক ডাকার সরু আওয়াজ জুম্মনের মাথায় ঢুকে অনেক দূর থেকে লাটমিয়ার বাপ, লাটমিয়ার বাপের ছেলে লাটমিয়া, কালু, কানা মমতাজ, হাসেম আলী, ফেরু— এদের সবাইকে ডেকে ডেকে আনে। কতকাল পর তন্দ্রার ভিতর হলেও লাটমিয়ার বাপের মুখোমুখি হয়ে জুম্মন তার চোখ অন্ধকার হাজতে রেখে দৃষ্টির সম্পূর্ণটা ভিতরে নিয়ে যায়। হাজত দেখা যায় না, ভিতরে লাটমিয়ার বাপ, ট্রাফিক পুলিশ বক্সের পেছনে পোড়োবাড়ির ইটপাটকেল ছড়ানো ছোট লনে তাকে ফেলে বেদম মার দিচ্ছে, অন্ধকারের ভিতর কেবল এইটুকুই চোখে পড়ে। লাটমিয়ার পয়সা সে খরচ করে ফেলেছিল; পয়সা কতই আর হবে? একসঙ্গে পঁচিশ কি ত্রিশ পয়সার বেশি ওরা কখনো জমাতে পারত না। কিছুক্ষণ রিকশা ঠেলে যখনি চার আনা কি বড়োজোর তিরিশ পয়সা হলো তো ডালপুরি খেয়ে ফেলল, কি চানাচুর কিনল, কি কয়েতবেল ফুচকাওয়ালাকে পেলে ফুচকা চটপটি চলল। মাঝে মাঝে পুলের ওপর ফুটপাথে বসে থাকা মাতারির কুলো থেকে গুড় দিয়ে এক পো' রুটি। আট আনা দশ আনা একসঙ্গে জমা হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়, তাই ভাত আর খেতে

পারত না। তবে ঈদ বকরিদের দিনে, কিংবা পল্টনে বড়ো মিটিং কি স্টেডিয়ামে ভালো খেলা থাকলে খুব রিকশা চলতো, এক নাগাড়ে ষাট পয়সা আশি পয়সা জমে যেত। সে সব দিন ভাত খাওয়ার দিন। একদিন নামকরা এক লোক মারা গেলে জুম্মন এক টাকা পেয়ে যায়, এর ভিতর অবশ্য পুলের ওপর কুড়িয়ে পাওয়া একটা সিকিও ছিল। সেদিন সে কানার দোকান থেকে শিককাবাব পরোটা এনে পুলের এপার রেখে দেওয়া ঠেলাগাড়িতে বসে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, তাই দেখে এক-চোখ-কানা মমতাজের কী আক্ষেপ, 'তর কী? তুই যা কামাইবি ব্যাকটি তো তরই!'

কানা মমতাজের সে উপায় ছিল না, ওর জলজ্যান্ত মা ছিল একটা, এদিককার কোনো সায়েবি স্কুলে আয়ার কাজ করত। সায়েব মানুষদের সাদা জামা ও নীল প্যান্ট পরা ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাবধানে রাস্তা পেরিয়ে সে স্কুলে নিয়ে যেত। এক রাশি গড়ানো ফুলের মাঝখানে তাকে ফুল প্রসবিনী রুগ্‌ণ ডাল বলে ভুল হতো। কানা মমতাজের মায়ের রোগা কালো বাঁকাচোরা শরীরের ভিতর তার চোখজোড়া ছিল অন্যরকম, ঘন দুধের ওপর কালো মধুর ফোঁটা। তার স্কুলের কোনো শিশুকে সে কোনদিন বকে না, তাই তো সায়েবরা খুশি হয়ে পাঁচ বছর চাকরির পর তার বেতন আড়াই টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কানা মমতাজের মা-ই আবার কোনো কোনো দিন হঠাৎ করে এসে ছেলের সব পয়সা ছিনিয়ে নিত। তখন তার চোখমুখ সব কোঁচকানো থাকায় চোখের দুধ-মধু আর দেখা যেত না। আর এবড়োখেবড়ো মুখ থেকে তখন মুড়ির টিন মার্কা বাস গড়িয়ে পড়ত, 'আমারে পসা দিবি ক্যান? রাইতে গিয়া তো ভাত খাইবি তিন পোয়া এক সের চাইলের, তরে খাওয়াই, তর বাপেরে খাওয়াই আর আমারে চাইর আনা পসা দিবি না কানা হারামজাদা?'

কিন্তু জুম্মনের এসব ঝামেলা ছিল না, তার বাপ-মার বালাই নেই, তার পয়সায় ভাগ বসায় কে? খুব ছোটোবেলায় মা হয়তো একটা ছিল, কিন্তু সেকথা তার একটুও মনে নেই। কেবল কয়েক বছর আগে পর্যন্ত হঠাৎ ভয় পেলে কি খুব খিদে পেলে সারি সারি বিছানাওলা একটা ঘরের বারান্দায় দাঁড়াতে ইচ্ছে করত। মনে হতো, সাদা শাড়ি সাদা টুপি পরা কালো একটা মেয়ের পিছে পিছে ঘুরলে, তার এটা ওটা কথা শুনলে ওর ভয়ও কেটে যাবে, পেটটাও ভরবে। পরে বড়ো হয়ে মনে হয়েছে ঐ মেয়েটা বোধহয় হাসপাতালের নার্স ছিল, কিন্তু তার চেহারা একেবারেই মনে নেই। তারপর তার বসবাস শুরু হয় মেডিক্যাল কলেজের মেয়েদের হোস্টেল কি নার্সদের হোস্টেলে সিঁড়ির নিচে। বাইরে থেকে মেয়েদের জন্যে সে এটা ওটা এনে দিত, কতদিন চা আনতে গিয়ে কেটলি হাতে সিঁড়ির নিচেই ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মনে পড়ে। এরপর ফরিদাবাদে এক ডাক্তারের বাড়িতে কয়েকটা বছর। ডাক্তারের বাচ্চাকে কোলে করে ঘুরত, ছাদের ওপর তার কাঁথা মেলে দিত, দুধ বানাত, দুধ বানাতে গিয়ে কতবার হাতের ওপর গরম পানি

পড়ে গিয়েছে। সেই বাচ্চার মুখ ভুলে গেছে, কিন্তু ডাক্তারের বৌ-এর মুখটা লম্বাটে, গালের বাঁদিকে তিল, গায়ের রঙ কী ফর্সা। বৌটা কথায় কথায় কেবল রাগ করত, জুম্মনকে ফকিরনির বাচ্চা, হারামির বাচ্চা বলে গাল দিত। তবে ডাক্তার লোকটা ভালো। এই সব গালাগালি শুনলে বিরক্ত হত, 'কী সব যা-তা বলো! নিজের বাচ্চাটা নষ্ট হবে। কাজ না করলে শুওরের বাচ্চাকে লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দাও, মুখ খারাপ করো কেন?'

কিন্তু ওরা তাড়াবার আগে জুম্মন নিজেই বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে সোজা এই লোহারপুল। লাটমিয়ার সঙ্গে তার খাতির আগে থেকেই, লাটমিয়ার মা ডাক্তারের বাড়িতে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করত। কিন্তু লাটমিয়া তাকে যতই পাত্তা দিক, এই কানা মমতাজ, বসির, কালু, হাসেম আলী—এরা প্রথম প্রথম কাছাকাছি ঘেঁসতে দেয়নি। না, সেই সময় লাটমিয়া তাকে খুব সাহায্য করেছে। রিকশা-ধাক্কা-দেওয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা নয় কেবল, ধাক্কা দেওয়ার কায়দাকানুন প্রথম প্রথম সেই শিখিয়ে দেয়। কী করে ঠেললে রিকশাওলা মুখ খারাপ করবে না, বাঁ হাতে ডান হাতের সমান বল প্রয়োগ করতে হয় কী করে, পা দু'টো কী করে ফেলতে হয়—এসব তো লাটমিয়াকে দেখে দেখেই তার রপ্ত হয়েছে। লাটমিয়া আবার তার বাবার ভয়ে পয়সাকড়ি রেখে দিত তার কাছেই। বাপটা এদিকেই ঠেলাগাড়ি চালায়, ফরাসগঞ্জের কোন কাঠের দোকান থেকে মাল নিয়ে একেকটি ট্রিপ দিয়ে আসে, ঠেলাগাড়ি রেখে সোজা চলে আসবে এখানে, ছেলের পকেট হাতড়ে যা পায় সব নিয়ে যাবে। বাপের ফাঁড়া কেটে গেলে জুম্মনের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে লাটমিয়া পুলের ওপার সালাউদ্দিনের রেস্টুরেন্টে চলে যেত।

জুম্মনের একদিন কী হলো, হয়তো খুব ক্ষিধে পেয়েছিল কিংবা কোনো রিকশার থলে থেকে উপচে পড়া মাংস তরকারি দেখে ফেলেছিল—সে কি-না সোজা চলে গেল সালাউদ্দিনের দোকানে। সেখানে পুরো দু প্লেট ভাত, চার আনার গোরুর গোশত, পনেরো পয়সার ডাল—দশ পয়সা কম এক টাকার ভাত খেয়ে পুলের এপার এসে এক কোণে রেখে দেওয়া ঠেলাগাড়িতে একটা পা রেখে মৌজ করে একটা বক সিগ্রেট ধরায়। লাটমিয়া এদিকে এলে ওকে বলবে না বলবে না করেও মাংস ভাত খাওয়ার গল্প করে।

লাটমিয়া বলে, 'যাই, আমিও খাইয়া আহি। আমার পসাটা দে!'

জুম্মন তাকে বোঝায়, এত কম পয়সায় সে ভাত খাবে কী করে? কিন্তু লাটমিয়ার এক কথা, 'পসা দে।'

শেষ পর্যন্ত জুম্মন কি আর করে, বলে, 'রাখ, কয়টা ধাক্কা দিয়া আহি, তর পসা তরে দিতাছি।' এইবার লাটমিয়া বাড়াবাড়ি করে, 'আমার পসা লইয়া গোশতো দিয়া ভাত খাইলি, না? খানকির বাচ্চা, জাউরাটা, তর বাপের ঠিক আছে?'

একটু আগে মাংস-ভাত খাওয়া জুম্মন আলী একটু ঝুঁকে লাটমিয়ার ঘাড় ধরে সামনের দিকে টেনে আনতে না আনতে ছেমরাটা একেবারে কাহিল হয়ে গেল।

অথচ সে তো প্রতিদিন অন্তত রাত্রিবেলাটায় একবার ঘরে গিয়ে তার মায়ের নিয়ে আসা ভাত তরকারি খেয়ে আসে। অবশ্য আজ সকাল থেকে পেটে তার কিছু পড়েনি, প্যান্ট নেমে গেছে নাভির অনেক নিচে, গায়ের চামড়ার নিচে মাংসের ফালতু পরত ঝরে যাওয়ায় তার বুকের হাড়হাড্ডি সব গুনে ফেলা যায়। মার খেতে না খেতে সেগুলো তিরতির করে কাঁপছে, তার অল্প হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে জিভের গোলাপি রেখা বেরিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ পর লাটমিয়ার বাপ এসে ছেলের পকেট, কোমর হাতড়ে কিছুই পেল না। ছেলের কাছ থেকে সব শুনে তার মেজাজ চড়ে যায়। জুম্মন আলীকে হঠাৎ করে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ট্রাফিক পুলিশ বক্সের পেছনে। সেখানে খালি জায়গায় সব সময় রিকশা মেরামত করা হয়। জুম্মনের ভয় হলো লোকটা রিকশা-মেরামতের কোনো যন্ত্র দিয়ে তাকে মারতে পারে। কিন্তু লাটমিয়ার বাপের হাতই যথেষ্ট। প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করে, 'লাটমিয়ার পসা কই রাখছস?' কোনো জবাব না পেয়ে জুম্মনের ঘাড় ধরে গালে দুটো চড় লাগায়? 'খানকির বাচ্চা, আমার পোলার পসা দিয়া তুই ভাত খাইছস, না?' তারপর এলোপাতাড়ি চড় এবং চড়ের পর্ব শেষ হতে না হতে পিঠে দমাদম কিল মারতে শুরু করে। এতে ঠিক জুৎ করতে না পেরে লাটমিয়ার বাপ জুম্মনকে মাটিতে ফেলে তার গলা চেপে ধরে, 'ফকুরনির বাচ্চা, তর মায়ে তো তরে খালাস করাইয়া ভাইগা গেছে, বাপেরে তো জিন্দেগিতে দ্যাখস নাই, তরে আমি বাপ দ্যাখ্যাইয়া ছাড়ুম।' তারপর পিঠে কয়েকটা কিল দিতে দিতে বলে, 'জাউরাটা, গোশতো দিয়া ভাত খাইছস, না? তর গোশতো ব্যাকটি যুদি আমি যাতা দিয়া বাইর করতে না পারি তয় আমি হালা ভি এক জাউরা!' এই কঠিন প্রতিজ্ঞা পালনের চেষ্টা করতেই হয়। জুম্মনের গলায়, পেটে হাত দিয়ে চেপে চেপে নানাভাবে সে মাংস নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা চালায়; কিন্তু গোমাংসের ছোট ছোট চারটে টুকরো জুম্মনের জংধরা পাকস্থলীর এক কোণে মুখগুঁজে পড়ে আছে, তার আর বেরোবার নাম নেই। তবে তার গলায় জুম্মন আলী মাংসের স্বাদমাখা আঠালো লালার আভাস পেয়েছিল, তখন তার পিঠে চড়কিলের শিলাবৃষ্টি, এই দুর্যোগের মধ্যে প্রাণপণে সেই লালা সে গিলে ফেলে। মাংসের স্বাদ দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিয়ে দেওয়ায় লাটমিয়ার বাপের দিকে সে হয়তো একটু নুয়ে পড়ত। কিন্তু 'হারামজাদা, এই হালার জাউরাটা, বাপের নাই ঠিকানা, অর লগে তুই দোস্ত করস'—এই কথা বলে লাটমিয়ার বাপ ফের ধরতে গেল তার ছেলেকে। তখন জুম্মন আলীর জিভে কি গলায় মাংসের স্বাদ আর একটুও অবশিষ্ট রইল না। শরীরের সব জায়গায় জ্বলুনি, লালচে চুলের গোড়ায় গোড়ায় আঠালো ব্যথা; মাথার ভিতরকার জ্বালা ও চুলের গোড়ার ব্যথার মধ্যে ভেদচিহ্ন বোঝা যায় না, শরীরের ভিতরকার কলকল করা কষ্ট ও চামড়ার ওপরের জ্বলুনির পার্থক্য ঠাহর করা যায় না। পুলের রেলিঙ থেকে খালের জলে লাফিয়ে পড়ে একটানা তিন ঘণ্টা দাপাদাপি করে জুম্মন ওপরে উঠে এসেছিল। একমাত্র হাশেম আলী জুম্মনের এইসব

উথালপাতাল ছোটাছুটি লক্ষ করে। সে কেবল একবার বলে, 'এই প্যাকের মইদ্যে দাপাইয়া কী হইব? আমাগো ম্যাঘনা নদীর পানির মইদ্যে দুইটা ডুব দিতি, শরীরডা জুড়াইয়া যাইত!'

কিন্তু এখন, এই ছোট অন্ধকার হাজতে পাতাল-ছোঁয়া ডুব সাঁতার দিয়ে লাটমিয়ার বাপের হাঁপাতে থাকা শরীর থেকে বেরোনো আঁ আঁ শব্দ জুম্মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার ইচ্ছে হয়, এই থানা থাইকা বারাইতে পারলে লাটমিয়ার পসা কটা দিয়া দিমু। কিন্তু লাটমিয়ার বাপের হাঁপানো আর থামে না। একটু পর মাথায় হাত দিয়ে বসে সে কোঁকাতে থাকে। তার কোঁকাবার আওয়াজ ক্রমেই একটানা হয়ে আসে এবং অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের কান্নার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে কুকুরের কান্না বাজে, ইনিয়ে বিনিয়ে বাজে। ঝাপসা এই বিলাপ বাতাসের পরতের পর পরত, আলো ও অন্ধকারের শূন্যতা ও পর্দা পেরিয়ে আসতে আসতে পুরনো মদের মতো আরো ঝাঁঝালো হয় এবং এই ঝাঁঝালো ও সুদূর বিলাপ জুম্মনের গলায় ভিতর থেকে সাহস হাতড়ে হুতড়ে নিয়ে আরো বলবান হয়ে ওঠে এবং জুম্মনকে ফাঁপা ও খালি বোতলে পরিণত করে। ভয়ে ওর সমস্ত কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়; সেই একটানা আওয়াজ থেমে গেলেও তার মাথা, গলা, বুক, পিঠ, পেট, পাছা ও পা জুড়ে তার অনুরণন বাজতেই থাকে। রাত্রিবেলা ফকিরচাঁদ তাকে বিরক্ত করে ঠিকই, কিন্তু ভয় পেলে কি অজানা কোনো কারণে ফাঁপর ঠেকলে মহাজনের বাক্সমার্কা বুকে একবার মুখ গুঁজে দিলে তার ঘুম এসে যায়। মহাজনের বুকের ধুকধুকি জুম্মনের রক্তস্রোতের কলকল ধ্বনির সঙ্গে মিশে মিষ্টি এক ধরনের নীরবতার সৃষ্টি করে, তখন এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যায়। মহাজনের কথা তার মনে পড়ল, কী আর বলব, কুকুরের কান্নার সঙ্গে এখন কুকুরের শরীর যুক্ত হলো। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অনেক দূরে, পুল পার হয়ে পোষ্ট অফিস, ফিরোজ সাহেবের বাড়ি, মসজিদ, শুক্কুর মাহমুদের চায়ের দোকান পেরিয়ে, ফরিদাবাদ ফাঁড়ির পেছনে বুড়িগঙ্গায় হাবুডুবু খাওয়া চাঁদের দিকে তাকিয়ে কুকুর ডাকছে। কুত্তাটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোটো একটা চাক্কা মারলেই হালায় কই গিয়া পলাইব! কাল যদি সে এখান থেকে ছাড়া পায়—মাল আনতে গিয়ে আবদুলও একদিন ধরা পড়েছিল, খবর পেয়ে মহাজন পরদিন নিজে এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়—তো কাল রাত্রেই মহাজনকে এই ভয় পাবার কথাটা বলবে। সে ভয় পেল মহাজন সবসময় খুশি হয়। লোকটাকে রাত্রিবেলাই সব বলা যায়, সকাল থেকে মহাজন দূরের মানুষ হয়ে পড়ে।

মহাজনের এগারোটা রিকশা, দশটা ভাড়া দেয়, একটায় সে নিজেই ঘুরে বেড়ায়। সকালে এই রিকশাগুলো রিকশাওলাদের দেওয়ার সময় সবাইকে সে একচোট গালাগালি করে। রিকশাওলাগুলো সব শয়তানের একশেষ। রিকশার টায়ার ছিঁড়ে ফেলে, দাম দেবে মহাজন। স্পোকের দাম অবশ্য রিকশাওলা নিজেই দেয়, কিন্তু মাডগার্ডের মেরামত সব মহাজনের। ভাড়া নেওয়ার সময় মহাজন

কাউকে একটা পয়সা ছাড়ে না, কামাই না করে থাকো তো ধার করে দাও। কি করবে, মহাজনের বৌ থাকে মালিবাগ না কোথায়, সেখানে তার আরেকটা বাড়ি আছে। আগের পক্ষের বৌয়ের ছেলে দুটোই কোনো কাজকাম করে না। মহাজনের খরচের শেষ নেই। দুপুরে রিকশা ফেরৎ নেওয়ার সময় সে আরেকটা চোট ঝাড়ে। দুপুরে যারা রিকশা নেয় তারা ফেরৎ দেয় রাত্রিবেলা, মহাজন তখন নিজে আসতে পারে না বলে দুপুরে তাদের আগাম বকে দেয়। রাত্রি হলে সে বসে বোতল নিয়ে, জগৎ রসাতলে গেলেও তার তখন আর বেরোবার উপায় নেই। প্রথমদিন জুম্মন যখন আসে, তাকে ঐ অবস্থাতেই দেখেছে।

জুম্মনকে এখানে নিয়ে আসে আবদুল। লাটমিয়ার বাপের হাতে মার খাওয়ার পর লোহার পুলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাটমিয়া তাকে ডাকে 'চোট্টা হালা' বলে, কানা মমতাজ বলে 'জাউরাটা', ফালু কোনোদিকে নেই, যেদিক দলে ভারি সে সেইদিকে। হাশেম আলীর পরোক্ষ সহানুভূতি থাকলে কী হবে, সে বেচারা মেঘনা না কোন নদীর তীরের পাড়াগাঁর ছেলে, এত ঝাঁঝালো কথাবার্তায় সে নেই। রিকশাওলা আবদুলের সঙ্গে জুম্মনের মুখচেনা ছিল, আবদুলই একদিন তাকে নিয়ে গেল ফকিরচাঁদের বাড়ি। আবদুল তার খাস লোক, ছেলেবেলা থেকে এখানে আছে। তার মহাজনের বেকারিতে একটা ছোকরা দরকার, কাজ খুব কম, কারিগরের সঙ্গে থাকা, রুটির প্যাকিং করার কাজ—কাজ বলতে এই। আর রাত্রে মহাজনের হাত পা মালিশ করে দেবে। মহাজনের পিঠের বাঁদিকে পুরনো ব্যথা আছে একটা, সেখানে সেঁক দেবে, দরকার হলে টিপে দেবে। আগে আবদুল এসব কাজ করত, কিন্তু বছরখানেক রিকশা চালিয়ে ওর হাতে কড়া পড়ে গেছে, মালিশ করে দিলে মহাজনের জুৎ হয় না। আরেক রিকশাওলা নাজিম পাগলাও আবদুলের সঙ্গে ছিল, সে বলল, 'আব্বে আবদুল, তরে দিয়া আর হইল না, না? হাতে কড়া পড়ছে তর? মহাজন তো তর গতর ভইরা কড়া ফালাইয়া দিছে, না?' এই নাজিমটা ভয়ানক শয়তান। শীতের দু'মাস আড়াই মাস সে পাগল থাকে, তখন হাতে আস্ত একটা ইট নিয়ে তার বস্তির ঘর থেকে বেরিয়ে সে সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। প্রথম প্রথম পাড়ার অলিগলিতে ঘোরে, তারপর ওর পরিধি আস্তে আস্তে বাড়ে, এই এদিকে রথখোলা, ওদিকে ফরাসগঞ্জ, তারপর একদিকে হাটখোলা গোপীবাগ, ওদিকে গেণ্ডারিয়া ফরিদাবাদ। এই রকম পরিধি বাড়াতে বাড়াতে শীত শেষ হয়ে যায়, বলদা বাগানের গাছে নতুন পাতা গজায়, ফুল ফোটে ও কোকিল গান করে। নাজিমও ঠিকঠাক হয়ে মহাজনের রিকশা নিয়ে বেরোয়। কিন্তু রিকশা নিয়ে বড়ো গোলমাল করে ও। যখন চালায় তখন এই রিকশা নিয়ে পরপর কয়েকদিন দিনরাত্রি চালাচ্ছে। আবার ইচ্ছা হলো তো দু'সপ্তাহ বাদ। এদিকে রিকশার ভাড়া ঠিকমতো দেবে না, পার্টস ভাঙবে প্রায় রোজ, মহাজনের বস্তিতেই সে থাকে, কিন্তু ঘরভাড়া দেওয়ার ব্যাপারেও খুব অনিয়মিত। অথচ তার পাগল হওয়ার ঋতুতে তার বৌটাকে মহাজন কখনো চলে যেতে বলে না। বরং ফুড

ইন্সপেক্টর, কি এই অফিসার, ঐ অফিসারকে দিয়ে তাকে এটা ওটা কিনে দেওয়ায়। নইলে ঐ মেয়ে এই পাগলার সঙ্গে থাকে?

মহাজন জুম্মনকেও দুবেলা ভাত দিচ্ছে। অনেক রাত্রে হঠাৎ মুড ভালো হলে জুম্মনকে এক গ্লাস দুধ খেতে দেয়, দুধের পর এলাচি দেওয়া মিষ্টি পান। অথচ জুম্মন তো তার পিঠের ব্যথার কিছুই করতে পারল না। এটা বোধহয় সারবেও না কোনোদিন। পাকিস্তান হওয়ার পর আর্মানিটোলার মাঠে কী একটা মিটিং ভাঙতে গেলে পাব্লিকের হাতে মহাজন বেদম মার খেয়েছিল, সরকারি খরচে চিকিৎসা করেও কোনো লাভ হয়নি। খুব শীত পড়লে কি অসময়ে বৃষ্টি হলে জুম্মন গরম জলের ব্যাগ দিয়ে সেঁক দেয়। তাকে এখন পর্যন্ত বেতন অবশ্য তেমন কিছু দেয় না, মহাজন বলে, 'পোলাপানের হাতে পসাকড়ি পড়লেই খালি আকাম কুকাম করব।' তার নামে নাকি টাকা জমা হচ্ছে, দুবছর পর মহাজন তাকে রিকশা কিনে দেবে, ভাড়া দিতে হবে না, শুধু সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দিয়ে রিকশার দামটা শোধ করলেই চলবে। মহাজনের নজর অবশ্য সবদিকেই প্রখর। বেকারিতে কাজ করার সময় কারিগর তাকে চড়চাপড় মারলে মহাজন কারিগরকে খুব বকে দেয়। জুম্মনের ওপর কারিগরের খুব রাগ, তার চুরি চামারি সব বন্ধ করে ফেলেছে সে। একটা চুল এদিক ওদিক করলেই মহাজন ঠিক খবর পেয়ে যায়। কেবল এই পাগলা নাজিম ইচ্ছেমতো কথা বলার স্বভাব বাদ দেয় না। মাঝে মাঝে তার পাছায় বেশ জোরে চাপড়ে মেরে বলে, 'জাউরা হালায়, এইটা বেইচা খুব চালাইলি, দেখুম কয়দিন পারস!'

'অরে জাউরা কস, চুতমারানি, তর বাপের ঠিক আছে?' মহাজন নাজিমকে কতদিন এই বলে বকে দিয়েছে, তবু ওর মুখ বন্ধ করা গেল না।

আহা মাঝপথে নেশা জমে উঠতে ছিঁড়ে যাওয়ায় মহাজন যে কী ছটফট করে রাত্রি কাটাচ্ছে। নেশা ভালো করে না জমলে তার সারা শরীর মালিশ করতে হয়। আর নেশাগ্রস্ত হলে মহাজনের মাথার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলে তবে তার ঘুম আসে। বোতলটা মহাজনের হাতে পড়লে আজকেও তাই করতে হতো। কাল রাত্রে যেন মহাজনের মাথায় ঠিক হাত বুলিয়ে দিতে পারে। জুম্মন তার হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে দিল। আগামী রাত্রে এই সময় সে মহাজনের কপালে হাত বোলাচ্ছে। তার খাড়া খাড়া চুলে বিলি কাটছে। মহাজন যদি মিহিসুরে নাক ডাকতেও শুরু করে তবু তার থামবার উপায় নেই, হাত একটু বন্ধ হলেই টেনে টেনে বলবে, 'এ-এ-ই ছ্যামরা!' মহাজনের সমস্ত মুখে মদের গন্ধ, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো মিষ্টি ঝাঁঝ তার মাথায় ঢুকে যায়। জুম্মনের চোখ ঢুলে ঢুলে আসে। সেই ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে সে বেকারিতে যায়, তারপর ছ'টা সোয়া ছ'টায় দোকান খোলা, রুটি বিক্রি করা; বেলা দশটার দিকে ঢুকে পড়ো তন্দুরের ঘরে, ময়দা মাখাতে মাখাতে আঙুলগুলো টনটন করে; সাড়ে তিনটে চারটের সময় ভাত খেয়ে ফের দোকানে যাও, কোরবান আলী কি চুরি করে না করে সেদিকপানে

খেয়াল রাখো, রাত্রি দশটা পর্যন্ত পাতলা কাগজে রুটির প্যাকিং করো; না, চোখ আর খোলা রাখা যাচ্ছে না। ঘুম আসছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে খাড়া খাড়া চুল, চোখে ঘুম। তারপর লোহার গারদ লাগানো হাজত ঘরের ভিতর ফের নিশ্চিদ্র কালো একটা ঘর, সে ঘরে লালনীলবেগুনিহলুদ কোনো রেখা নেই, স্বপ্ন নেই; দীর্ঘ পদক্ষেপের মতো বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে সেই নিভৃত ও পেজা পেজা অন্ধকার অতিক্রম করে যাচ্ছে, এমন সময় তার মাথায় আগুনের ছ্যাঁকা পড়ল, জুম্মন আলী কে?'

পুলিশের এই ডাকেও তার ঘুম ভাঙেনি। ঘুমের ওপর একটা ফোস্কা পড়লেও সে বেশ কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েই থাকে। তার মুখোমুখি দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে সেই যণ্ডামার্কা লোক, মুখটা হা করে আছে।

'এই ব্যাটা ওঠ।' এই আহ্বানে জুম্মন আলী চোখ মেলল। বেলা যে কত হলো! মহাজন এতক্ষণে রিকশাওলাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই মুখ খারাপ করতে শুরু করেছে। কিন্তু মহাজন তো এরকম ভুল করে না। তার নেশা যতই হোক, ভোর হওয়ার অনেক আগেই মহাজন তাকে গ্যারেজে গিয়ে ঘুমোবার জন্য ঠিকই উঠিয়ে দেয়। তাহলে শেষ রাত্রে উঠে সে কি মহাজনের ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল? নাজিম পাগলা দেখে ফেললে ঠাট্টা করবে, 'বুইড়া হালায় রাইত ভইরা দাখাইছে, না?'

'জুম্মন আলী কে?' পুলিশের ধমক শুনে সে উঠে বসল। ঐ লোকটা যেমন ঘুমোচ্ছিল ঘুমিয়েই থাকে। তার নাক ডাকার ধ্বনি কেবল সশব্দ নিশ্বাসে পরিণত হয়। জুম্মন ভালো করে চোখ ঘষে দাঁড়ালে পুলিশ বলে, 'জুম্মন আলী তোর নাম?'

ঘরঘর শব্দ করে দরজা খুলে যায়, হাজতের বাইরে এসে জুম্মন বড়ো ঘরে ঢুকল। উঁচু ছাদের নিচে এক কোণে মস্ত টেবিলের এদদিকে চেয়ারে একজন জাঁদরেল পুলিশ। তার উলটোদিকের চেয়ারে মহাজন। তবে কালকের জাঁদরেল আর এই জাঁদরেল এক মাল নয়। এই জাঁদরেলের নাম দারোগা সায়েব, দু'দিন সন্ধ্যাবেলায় একে মহাজনের ঘরে দেখা গেছে।

'সোনার চান্দা, তুমি ইস্পাইং করো?' বলে মহাজন উঠে এগিয়ে এসে জুম্মনের ঘাড় ধরতে গেলে দারোগা তাকে থামিয়ে দিল, 'আরে করেন কী?'

মহাজন বলে, 'আপনে ভাইবা দ্যাখেন সার, আমার বাসার সার্ভেন্ট সার ইন্ডিয়ার ইস্পাই বইলা ধরা পড়ে সার, এ্যাঁ? আমরা পাকিস্তানের লাইগা কতো স্যাক্রিফাইস করছি সার, আর আমার বাড়ির—।' মহাজনের মাথায় আজ জিন্নাহ্ টুপি, এই টুপিতে তাকে অন্যরকম দেখায়, অপরিচিত লোক বলে ভুল হয়। জুম্মন তাকে ভালো করে দেখতে চায়। কিন্তু তার চোখে ঘুম। মহাজন ও দারোগার কথাবার্তা চলে। কাঁচা ঘুম ও স্বস্তিতে জুম্মনের চোখ কেবলই বুজে বুজে আসে। তাদের কথা আর শেষ হয় না।

'ঠিক আছে, নিয়েই যান। পরে আপনিও ট্রাবলে পড়তে পারেন, নিয়েই যান। তবে আমিও রিস্ক নিলাম, খেয়াল রাখবেন।'

দারোগার কথা শুনে মহাজন অবিরাম মাথা নাড়ে, 'ইয়েস সার, জি সার, আমার খুব খেয়াল থাকবে সার।'

'নিয়ে যান। তবে এই চাকরের জাত খুব ট্রেচারাস হয়। পুরনো কাপড়, পুরনো চাকর—এদের কোনো বিশ্বাস নেই। গেট রিড অফ হিম।'

'খেদাইয়া দিমু সার, অক্ষণ খেদাইয়া দিমু।' বলে মহাজন দামি সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে দারোগার সামনে রাখে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল, 'স্লামালেকুম সার, ঐ বেলা একবার মেহেরবানি কইরা আইসেন সার।'

দারোগা উঠতে দেয় না, 'দাঁড়ান, ওর পার্টিকুলার্স লিখে নিই।' মহাজন ফের বসে পড়ে।

জুম্মনের দিকে তাকিয়ে দারোগা বলে, 'তোর নাম কী?'

মোটা একটা খাতায় খসখস করে লিখতে লিখতে মহাজন দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, 'বাপের নাম?'

জুম্মন মহাজনের দিকে তাকায়। মহাজন মনোযোগ দিয়ে ছাদের কারুকাজ দেখছে।

দারোগা ফের বলে, 'বাপের নাম?'

এবারও জবাব না পেয়ে দারোগা মোটা খাতা থেকে মুখ তোলে, প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'বাপের নাম বলবি না?'

জুম্মন এবার নিচের দিকে তাকায়। ছাদের শিল্প কর্ম দেখা শেষ করে মহাজন দারোগাকে বলে, 'বাপ নাই, বাপের নাম ক্যামনে কয়?'

'মারা গেছে?' নাম কী ছিল?'

মহাজন তার পুরু কালো ঠোঁটের একটুখানি জায়গা জুড়ে হাসে, 'মরে নাই সার। বাপ আছিলো না কোনোদিন।'

'অরফ্যান?'

'বোঝেন তো সার।' মহাজন তার বাঁকানো হাসি আর সরায় না, 'অর মায়ে সার ফকিরনি উকিরনি আছিলো। কতো জায়গায় আকাম কুকাম করছে, হাসপাতালে গিয়া পোলারে খালাস করাইয়া ভাইগা গেছে। এক নার্স কিছুদিন দেখছে, গেণ্ডারিয়ার সুলতান ডাক্তারে কয়দিন রাইখা পরে খেদাইয়া দিছে। লোহার পুলের নিচে পইড়া আছিলো, আমি থাকতে দিছি!'

দারোগা হাসে, 'প্রবলেম হলো। আপনার নাম লিখে দিই?'

'আরে না সার,' মহাজন হাসতে হাসতে বলে, 'জাউরার ফাদার হইতে চাই না সার।'

দারোগা বলে, 'তাহলে গার্জেন হিসেবে আপনার নাম লিখি?'

'না সার। বাস্টার্ড ল্যাখেন। জাউরা ইজ জাউরা সার।'

জুম্মন আলী সেই নোয়ানো চোখ ও বাঁকা শরীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহাজন চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় গেলেও তার অবস্থান এখনো অপরিবর্তিত। মহাজন ডাকে, 'এই ব্যাটা, আয়!'

জুম্মন বলে, 'না।'

কিন্তু তার 'না' বেরিয়ে আসে জল-জমা নাক ও জড়ানো জিভ ছেঁকে, সুতরাং তার 'না' অশ্রুত থেকে যায়। একজন সাদামাটা পুলিশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যা ব্যাটা, বাইচা গেলি!' কিন্তু বাঁচবার তেমন স্পৃহা ওর আছে বলে মনে হয় না। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মাথা খুব ভারি ঠেকে, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে মহাজনের পিছে পিছে চললো।

রাস্তায় ফকিরচাঁদের রিকশা। রিকশার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে খাদেম রিকশাওলা ও আবদুল।

ফকিরচাঁদ আবদুলকে বলে, 'এইটারে লইয়া তুই গ্যারেজে যা। আমি এট্টু ফরিদাবাদ যাই, বারোটার মইদ্যে আইয়া পড়ুম।' তারপর জুম্মনের মুখের দিকে তাকিযে বলে, 'ছিনালি কইরা আর ফায়দা করবার পারবি না, খানকির বাচ্চা! আমার বহুত লোকসান করছস, আউজকা তর কী করি দেইখা লইস!'

রিকশায় উঠে বসে ফকিরচাঁদ আবদুলকে বলে, 'জাউরাটারে গ্যারেজের ভিতর রাইখা দিবি, বুঝলি? রাইতে অরে বহুত টাকা দিছিলাম, ঐগুলি লইয়া হালায় পলাইয়া যাইতে পারে!'

রিকশা চলে গেলে আবদুল ও জুম্মন রমনীমোহন দাশ রোড ধরে হাঁটতে লাগল। আবদুল বলে, 'রাইতে তরে হালায় বিচরাইয়া মরি! মহাজনে খাদেমরে আর আমারে শাঁখারিপট্টি পাঠাইল, নিতাই হালায় কয় কি তরে পুলিশে লইয়া গেছে। মহাজনে বহুত চেতছে!'

জুম্মন আলীকে কাঁদতে দেখে আবদুল এর কোনো মানে বুঝতে পারে না। একটু থেমে সে ফের এক নাগাড়ে কথা বলতে শুরু করে। গতকাল মহাজনের একটার পর একটা লোকসান। এদিকে জুম্মনের পাত্তা নেই, ফুড ইন্সপেক্টর সায়েব বিরক্ত হয়ে চলে গেছে, তাকে সামলাবার জন্যেই মহাজন এখন ফরিদাবাদে তার বাসার দিকে ছুটল। ওদিকে আবার নাজিম পাগলা রিকশার চেসিস ভেঙে ফেলেছে, এই দেখে মহাজন খুব খাপ্পা। রিকশার চেসিস কি একদিনে ভাঙার জিনিস? এই রিকশা সে রোজ এবেলা ওবেলা চালাচ্ছে, এতদিন কিছুই জানায়নি, ফাটল ধরতেই যদি বলত, তাহলে আর এত খরচ হয় না। এখন ভাঙা চেসিস জোড়া দিতে কতগুলো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। ভ্যাপসা গরমে এদিকে জুম্মনের শরীর কুটকুট করে। জামার নিচে ঘামের রেখা উপরেখা কিলবিল করে। চোখের জলের সঙ্গে পিঁচুটি মিশে যাওয়ার চোখে কাদাকাদা ঠেকে। আবার পায়ে কিছু নেই। রাস্তা গরম, মাঝখানের সিমেন্ট বাঁধানো শানে ধোঁয়া ছাড়ার প্রস্তুতি চলছে, দুই দিকের ধুলোমাটিতেও গরম। কোথাও পা রাখা যাচ্ছে না। যেখানেই একটু ছায়া পেয়েছে,

তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসেছে ফেরিওয়ালা। পা রাখার জায়গা নেই। এক্ষুণি যদি এক দৌড়ে পুলের ওপর যেতে পারে তো লোহার রেলিঙ থেকে দীর্ঘ একটা ডাইভ দিয়ে সে ছুঁয়ে ফেলবে জলের গভীর ভিতরকার হিমশাঁস। সেখানে একবার দাঁড়াতে পারলে খালের স্রোতধারা তাকে সঙ্গী করে নিয়ে যাবে ঠাণ্ডা কোনো জায়গায়। জুম্মন বলে, 'আবদুল তুই যা গিয়া, আমি খালে গিয়া নাহাইয়া আহি।'

কিন্তু তার এই সাধ আবদুলের মাথায় ঢোকে না, তার শুধু এক ভয়, 'না দোস্তো! তরে লগে না লইলে মহাজনে আমারে খতম কইরা ফালাইবো!'

গ্যারেজে এসে শোনা গেল পেছনের বস্তিতে পাগলা নাজিম চিৎকার করতে করতে তার পাগলা বৌকে ধরে পেটাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বেকারি থেকে কারিগর এবং গ্যারেজ থেকে আবদুল গিয়ে নাজিমকে ধরে নিয়ে আসে। কী হলো? নাজিমের বৌ সখিনার চিৎকার আর থামে না। পাড়া মাৎ করে সবাইকে সে জানিয়ে দিচ্ছে যে নাজিম ইচ্ছা করেই রিকশার চেসিস ভেঙে ফেলেছে। মহাজনের বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে, মহাজনের রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আর সেই মহাজনের সঙ্গে বেঈমানি?

রিকশার গ্যারেজে ঢুকে নাজিম প্রথমে জুম্মনের শার্টের কলার চেপে ধরল, 'তরেই খতম করুম! আবার আইছস? তোমার বাপেরে মালিশ করতে আইছ?'

নাজিম পাগলার হাতে আস্ত একটা ইট। এবার কি তার ঋতু আগেই শুরু হয়ে গেল? এখন কেবল সেপ্টেম্বর, আরো অন্তত মাস দুয়েক তো এখনো বাকি।

জুম্মন বললো, 'আমার আবার বাপ কই?'

'বাপ নাই, মাহাজন আছে। মাহাজন হালারে ফাইড়া ফালামু, র, তরেও ভি দেইখা লই।'

কিন্তু নাজিমের এই চিৎকার শুনেও জুম্মন ভয় পায় না। নাজিমের চোখের দিকে একটু দেখেই বোঝা যায় যে তার মাথায় যদি আগুন জ্বলেও থাকে তো এখন সেখানে ছাই ছাড়া আর কিছুই নেই, ভিতরকার ছাই তার চোখের ওপারে জমা হচ্ছে, আর কয়েকটা ঋতু এরকম চললে তার দুটো চোখেই ছানি পড়ে যেতে পারে। আর এছাড়া, জুম্মন ভয় পাবে কী, তার সমস্ত মনোযোগ তো তার নিজের শরীরে; ওর গুমোট এখনো কাটেনি, শরীরে ঘাম জমে জমে গ্যাঁজাতে শুরু করেছে, তার প্রতিটি লোমকূপ হলো একেকটা ঢাকনি-ফাটা ম্যানহোল। ভিতরকার গু-মুত, বাসি রক্ত, নষ্ট বীর্য সব ফেনিয়ে ফেনিয়ে বেরুচ্ছে সেই ম্যানহোলগুলোর ফাঁক দিয়ে। কিন্তু একেবারে বেরোয় না, একটুখানি বুদবুদ তুলে ফের ভিতরেই সেঁধিয়ে যায়।

জুম্মন জবাব দিল 'কিয়ের মাহাজন? মাহাজন কিয়ের? মাহাজনের—।

বলতে বলতে হাঁপায়। নাজিম তার কথা ভালো করে শুনতেই পারেনি, সে তখন দরজার বাইরে পা দিয়েছে। আবদুল বলল, 'আরে ওস্তাদ, কই যাও? ইটা লইয়া কই যাও?'

ভালো মানুষের মতো নাজিম একটু দাঁড়ায়, 'যামু ফরাসগঞ্জ, ফরাসগঞ্জে না পাইলে আবার মতিঝিল যাইতে হইব। মতিঝিল গিয়া যদি দেখি নাই—।'

'কী পাইবা? কী?' আবদুলের এই কৌতূহলে নাজিমের মেজাজ ফের চড়ব চড়ব করে, মিনমিনে গলা চড়া করে সে বলে, 'তরে কইতে হইব? কইয়া ফালাইলে গুণ নষ্ট হইয়া যাইব না?'

তাহলে এবার সত্যি সত্যি তার সময় চলে এসেছে? তবে ঋতুর প্রথমেই এত বড়ো রেঞ্জ নিয়ে সে আর কখনো ফেরেনি।

হাতে ইট নিয়ে হন হন করে সে বেরিয়ে পড়লো। 'কই যাও?' কই যাও?' বলতে বলতে বেরোলো জুম্মন। এদের পেছনে ফের আবদুল।

পেছনে তাকিয়ে জুম্মন বলে, 'আরে তুই যা না! আমি তো লগে যাইতাছি, ধইরা লইয়া আসুম।' কিন্তু আবদুল তবু সঙ্গ ছাড়ে না। জুম্মন ইশারা করে, 'তু যা না! পাগলার লগে দিগদারি কইরা ফায়দা কী? আমি আছি না?' কিন্তু তাকে নিয়েই তো আবদুলের মুশকিল। তবে নাজিমের এই অসময়ের পাগলামিতে আবদুল কর্তব্যজ্ঞানলুপ্ত হয়, ওরা মোড় ঘুরলে সে গ্যারেজে ফেরে।

কিছুক্ষণ পর নাজিম বলে, 'তুই কই যাস?' তারপর বলে, 'ফরাসগঞ্জে না পাইলে মতিঝিল যাইতে হইব, মতিঝিলে না পাইলে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার না পাইলে—।'

'তুমি কি বিচারও ওস্তাদ?'

কিন্তু জুম্মনের দিকে তার খেয়াল নেই, সে তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কেবল বিস্তৃত করে চলে, অবশেষে একবার অধৈর্য হয়ে বলে, 'নাইলে দিমু ব্যাকটিরে খতম কইরা!'

'কারে খতম করবা?'

'চুপ কর চুতমারানি! তর মাহাজনেরে খতম করুম, খানকি মাগিটারে খতম করুম, তরে খতম করুম, আবদুলরে খতম করুম—।' খতম করার লোকদের আর নাম খুঁজে না পেয়ে সে চুপ করে, তারপর আস্তে আস্তে নোনা গলায় বলে, বুঝলি? মাহাজনে হালায় খানকিটারে কি ফুসলাইছে, কয়দিন থাইকা জিদ ধরছে, কী? প্যাটের পোলারে নষ্ট করতে হইব। বুঝলি না? আউজকা কয়, পোলার লাইগা এত দরদ, কার পোলা তুমি জান? পোলার বাপ ক্যাঠা? চিনো?' সে অবিরাম বকে যাচ্ছে, তার স্ত্রীর প্রসঙ্গ শেষ হতে না হতেই বলে, 'দিছি, চুতমারানির রিকশার চেসিস একেরে ভাইঙ্গা দিছি।' এই শেষ বাক্য বলে নাজিম সুখী সুখী শোখ করে জুম্মনের দিকে তাকায়। জুম্মন একটু বিভ্রান্ত হয়। মহাজনের ওপর যদি তার শোধ নেওয়া হয়েই থাকে তবে এটা তার কিসের ঋতু? তার হাতে ইট কেন?—হাতের শোভা? তার মুখে গাল কেন?—মুখের গয়না?—এইরকম জুম্মনের বিভ্রান্তি ও নাজিমের বিলাপের ভিতর দিয়ে ওরা সূত্রাপুর পুলের এপার পৌঁছলে জুম্মন বলে, 'খালে নাহাইয়া আহি।'

'আমিও যামু।'

পুলের ওপর উঠতে থানার দেওয়াল, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা কয়েকজন ভিখেরি ও ভিখেরিনি, এদের ফাঁকে ফাঁকে তরকারিওলা, ফলওলা, রুটিওলি, তাবিজওলা। জুম্মন একটু এগিয়ে গিয়েছিল, কয়েক পা ফিরে এসে একজন ভিখেরিনির সামনে দাঁড়াল। নাজিম বলে, 'আবার কী?'

জুম্মন তার দিকে না তাকিয়ে, ভিখেরিনির উঁচু পেট দেখতে দেখতে বলে, 'ওস্তাদ, একটা টাকা দিবা?'

জুম্মন শার্টের পকেট, লুঙির গেরো—সব ঝেড়ে দেখে, না, রাত্রিবেলা জাঁদরেল কি সাদাম্মটা পুলিশ তার সমস্ত নিয়ে নিয়েছে। নাজিম বলে, 'ল, একটাই আছিলো।'

নাজিমের হাত থেকে টাকা নিয়ে ভিখেরিনির টিনের থালে ফেলে দিলে ভিখেরিনি তার দিকে তাকিয়ে টক টক হাসি ছাড়ে।

নাজিম বলে, 'আর মাগি পাইলি না? এইটা তো বিয়াইবো, বোঝস না?'

কিন্তু ভিখেরিনির টক হাসি, নাজিমের ঠাট্টা—জুম্মন এসব কিছুই পরোয়া করে না। সে তরতর করে ওপরে উঠে যায়, তাকে ধরবার জন্য নাজিম পাগলাকে একটু জোরে পা চালাতে হয়।

কিন্তু জুম্মন শালা কোথায় যাচ্ছে? পুলের ওপর ফুটপাতের রেলিঙে না উঠে সে কিনা উঠে পড়েছে লোহার উঁচু ফ্রেমের ওপর। উঠতে উঠতে একবার এক হাত ও দুই পায়ে লোহার পিলার জড়িয়ে সে একটা হাত বাড়ায় নাজিমের দিকে, 'ওস্তাদ, ইটাটা দাও।' তারপর ইট নিয়ে উঠে গেল সোজা ওপরে।

নিচ থেকে নাজিম চেঁচায়, 'কই ওঠস?'

'খালে নাহাইমু ওস্তাদ!'

'খালে নাহাইবি তো অত উপরে উঠবি ক্যান?'

'একটা লাফ না মাইরা এক্কেরে খালের তলা ধরুম!'

কিন্তু সে তো ফ্রেমের এক একটা লোহার পাত পেরিয়ে পেরিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে। খালে লাফ দিতে হলে দাঁড়াতে হবে বাঁদিকে মুখ করে, সে দাঁড়িয়েছে সোজা, তার নিচ দিয়ে বাস যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে, রিকশা, সাইকেল, স্কুটার, মানুষজন।

'নাহাইবি, তো কই খাড়াইলি?' নাজিম জোরে জোরে ডাকে, 'আমার ইটা দে, আমারে ফরাসগঞ্জ যাইতে হইব, ফরাসগঞ্জ না পাইলে মতিঝিল, মতিঝিল না পাইলে—।'

'যাও না!' জুম্মনের এই জবাব শুনে নাজিম পাগলা চটে যায়, 'ফকুন্নির বাচ্চা, আমার ইটা দে, তর মারে চুদি!'

হাসি হাসি মুখ করে জুম্মন তার দিকে তাকায়, একটু দূরে বসে থাকা ভিখেরিনিদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'তোমারে মানা করছি?'

নাজিম বলে, 'আমার ইটা দে আমি যাই গিয়া!'

'না', বেশ চেঁচিয়ে জবাব দেয় জুম্মন, 'বারোটা বাজতেছে না? মাহাজনে অহন ফরিদাবাদ থন আইবো না?'

এবার নাজিমের মেজাজ বেশ চড়ে গেল, 'মাহাজনরে মারে বাপ! মাহাজনে আইবো, তর কী? এই পুলের উপরে খাড়াইয়া মাহাজনরে দিয়া মারাইবি? চুতমারানি, রাস্তা জাম হইয়া যাইবো না? টেরাফিকে ধরবো না তোমারে?'

কিন্তু জুম্মন কেবল সামনের দিকে দেখছে। এই রাস্তা এসেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে, অবিরাম গাড়ি আসছে, এই এত ট্রাক বাস ট্যাক্সি স্কুটার রিকশার ভিতর দিয়ে মহাজন আবার কেটে না পড়ে! সে সামনের দিকে সতর্কভাবে দেখতে দেখতে নাজিমকে বলে, 'মাহাজনে আইবো! এই ইটাটা না ফালাইয়া হালার মাথাটা ছেঁইচা দিমু।'

'কেল্লায়?' নাজিম সোজা তার নিচে এসে জিজ্ঞেস করে।

'চুতমারানির বাপের নামটা ভুলাইয়া ছাড়ুম।'

নাজিম দাঁড়িয়েছে তার নিচে, পুলের মাঝখানে। তার জন্য রাস্তার দু'দিক থেকে আসা ট্রাক স্কুটার সব থেমে পড়েছে, তাদের হর্ন ও তাদের ড্রাইভার, কন্ডাক্টরদের সম্মিলিত এলোমেলো গালাগালির হই চই হচ্ছে বলে খুব চেঁচিয়ে জুম্মনকে জিজ্ঞেস করে, 'পারবি?'

'পারুম না?'

চিরায়ত সাহিত্যের স্কুল-পাঠ্য সংস্করণ

দেওয়ানা মদিনা

বানিয়াচঙের দেওয়ান সোনাফর মিয়া। মস্ত এলাকা জুড়ে তাঁর দেওয়ানি; ধন-দৌলতের তাঁর লেখাজোখা নাই। তাঁর দুই ছেলে, আলাল আর দুলাল। কিন্তু এত সম্পদ, এত ক্ষমতা, সোনার টুকরা দুটি ছেলে, এত নিয়েও সোনাফরের সুখ নাই। ছেলে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন কয়েকদিন আগে, মা-হারা এইসব দুধের ছেলে মা ছাড়া মানুষ হয় কি ভাবে, এই ভেবে দেওয়ান কেঁদে জারজার। এদিকে শোকে দেওয়ান মগ্ন, তাঁর কাজকর্ম সব বন্ধ, দেওয়ানি তো থাকে না। খাজনা আদায় হয় না, প্রজাপাট দুঃখদুর্দশার কথা বলতে পারে না, তারা নালিশ করবে কার কাছে? আবদার জানাবে কোথায়? দেওয়ানি ছারখার হয় দেখে উজির নাজির সবাই সোনাফর দেওয়ানের কাছে এসে অনুরোধ করে, 'দেওয়ান সাহেব, দেওয়ানি যে যায়, আপনার সোনার সংসারও বৃথাই নষ্ট হয়। আর একটা বিয়ে করে সংসার বাঁচান, দেওয়ানিটাও রক্ষা পাক।'

কিন্তু ফের বিয়ে করতে দেওয়ান রাজি নন। সৎ মায়ের হাতে তাঁর আলাল দুলালের কষ্ট হবে, সৎ মা কি সতিনের ছেলেকে কখনও সহ্য করে? উজির নাজিরের দল বুঝিয়ে বলেন, 'সাহেব, সব সৎমা খারাপ হয় না, সতিন পুত্রের জন্যে জান দেয় এমন সৎমাও তো থাকে।' তা উজির নাজিরের পীড়াপীড়িতে, সংসারের সিজিল ঠিক রাখতে এবং দেওয়ানি বাঁচাতে দেওয়ান আর একটি বিয়ে করলেন।

সৎ মা পাছে তাদের যাতনা করে এই ভয়ে দেওয়ান ছেলেদের নিজের কাছছাড়া করে না, সব সময় নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখে। এই দেখে দেওয়ানের নতুন বিবির হিংসায় বুক ফেটে যায়, দেওয়ান দিনরাত আলাল দুলালকে নিয়েই ব্যস্ত, তার দিকে ফিরেও তাকায় না। দেওয়ানকে ডেকে নতুন বিবি কান্নাকাটি করল, 'আমি তোমার কি করেছি যে আলাল দুলালকে তুমি আমার কাছে আসতে দাও না? ওরা কি কেবল তোমারই আদরের ধন, আমার কেউ নয়? সব সৎ-মাই কি খারাপ?

আমার ছেলেমেয়ে নাই, আলাল দুলালই আমার কলিজার রক্ত।' বৌয়ের কথায় মুগ্ধ হয়ে দেওয়ান ছেলেদের তার হাতেই তুলে দিল।

সেদিন থেকে দেওয়ান-বিবি আলাল দুলালকে এমন আদরযত্নে মানুষ করতে লাগল যে পাড়া প্রতিবেশী সবাই অবাক, সৎ-মাও সতিনপুত্রদের এত ভালোবাসতে পারে তারা কোনোদিন শোনেও নাই, দেখেও নাই।

মুখের গরাস দেয় যতনে তুলিয়া।
আলুফা জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া।

সত্যি নিজের মুখের গ্রাস সে তুলে দেয় আলাল দুলালের মুখে, নিজে না খেয়ে আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস সে তাদের খাওয়ায়।

কিন্তু হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে তার ইচ্ছা অন্যরকম, তলে তলে সে আলাল দুলালকে হিংসা করে। দিনরাত তার এক চিন্তা, এই ছেলে দুটি তার পথের কাঁটা, যেভাবে হোক এদের চিরকালের জন্যে সরিয়ে দিতে হবে। এদিকে দেখতে দেখতে শ্রাবণ আসে। শাওনের বরষার পানি চারদিকে টলমল করে। তখন লোকে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যায় নৌকা করে। পানির দেশ বানিয়াচঙে তখন শুরু হয় নৌকা বাইচের পালা, নৌকায় নৌকায় মেলা বসে যায়। এই নৌকা বাইচের উৎসব ও মেলাকে বলে আরঙ। দেওয়ানের বিবি আরঙের কথা ভেবে নতুন এক ফন্দি আঁটে। ফন্দি এঁটে সে ডেকে পাঠাল জল্লাদকে। আড়ালে নিয়ে জল্লাদকে খুব মিষ্টি গলায় দেওয়ান-বিবি বলে, 'তোমার মত সুহৃদ দুনিয়ায় আমার আর কেউ নাই। তোমাকে বিশ পুড়া জমি দেব, খুব গোপনে তুমি আমার একটা কাজ করে দাও।' জমি পাবে শুনে জল্লাদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, 'বিশ পুড়া জমি পাইলে জানবাইন কি তিরভুবনে এমন কাম নাই মুই পারি না।' জল্লাদের কানে কানে দেওয়ান-বিবি তার ফন্দির কথা সব বলল। বিশ পুড়া জমির লোভে জল্লাদ সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

সুতার ডেকে দেওয়ান-বিবি মস্ত এক ময়ূরপঙ্খী নাও গড়িয়ে নিল, সেই নৌকা করে আলাল দুলাল যাবে নাওয়ের আরঙে। কত সুন্দর পোষাকে সে তাদের সাজিয়ে দেয়, কয়েক দিনের খাবার রেঁধে দেয়, আর জল্লাদকে করে সেই নায়ের কাণ্ডারি। কাণ্ডারি নৌকা বাইতে লাগল। বাইতে বাইতে নৌকা এসে পড়ল বিশাল হাওড়ের মাঝখানে। চারদিকে পানি আর পানি, যতদূর চোখ যায় কোথাও নগর কি গ্রামের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এখানে এসে জল্লাদ হঠাৎ করে উঠে বলল, 'তোমরার যম আমি খাড়া হইছি, তোমরার মরণকালে আল্লাহর নাম ইয়াদ কর।' আলাল দুলাল হতভম্ব হয়ে পড়লে জল্লাদ বলে, 'বিবিসায়বানীর হুকুমে তোমরারে দরিয়ায় ডুবাইয়া মারবাম। তোমরারে মারলে বিশ পুড়া জমি পাইবাম, এখন তোমরার উদ্ধার নাই। আল্লাহর নাম লও।'

আলাল কাঁদতে কাঁদতে জল্লাদের পায়ে পড়ে আর বলে, 'আমাকে মেরে তুমি দুলালকে ছেড়ে দাও, ও প্রাণে বাঁচুক।'

দুলালও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর জল্লাদের কাছে মিনতি করে, 'তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরে তুমি ভাইকে ছেড়ে দাও।' জল্লাদ বিরক্ত হয়ে বলে, 'তোমরার কথা শুনিবাম না, দুইজনরেই মারবাম।' দুই ভাই বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে জল্লাদের পায়ে গড়াগড়ি যায়।

দুই ভাইয়ে না জল্লাদের ধর্‍্যা দুই পায়।
পাথর গলয়ে এমন কান্দিয়া ভাসায়।

তাদের কান্না এমন যে তাতে পাথর পর্যন্ত গলতে পারে। জল্লাদের মনও একটু নরম হয়। সে ভাবে, সত্যি তো, মাসুম এই ছেলে দুটিকে মেরে সে তার পাপের বোঝা আর বাড়াবে কেন? সে ইতস্তত করে। ভাবে এখানেই এদের রেখে গেলে এদের প্রাণ বাঁচে, দেওয়ান-বিবিও কিচ্ছু বুঝতে পারে না আবার তাকেও পাপের কাজ করতে হয় না।

তা আলাল দুলালের ভাগ্য, ঐ সময় সাধু সওদাগরের নৌকা যাচ্ছিল ঐদিক দিয়ে। বার ডিঙা সাজিয়ে সাধু চলেছে ধান কিনতে। ময়ূরপঙ্খী নাও তার নৌকার ধারে ভিড়িয়ে জল্লাদ আলাল দুলালকে সাধুর হাতে তুলে দিল।

তাদের নিয়ে সাধু সওদাগর চলল হাওড় পেরিয়ে, এ নদী ও নদী ধরে ধনুয়া নদী ধরে। ধনুয়া নদীর তীরে কাজলকান্দা গ্রাম। সেখানে ইরাধর বেপারির বাড়ি। মস্ত গেরস্থ, চাষবাসেই তার আয়, এই করে বছরে একশ পুড়া ধান বেচে। ইরাধর বেপারির কাছ থেকে সাধু সওদাগর ধান কিনল, ধানের দাম ধরে দিল আলাল দুলালকে।

আলাল দুলাল এখন ইরাধর বেপারির গোলাম। দুই বেলা খায়, তার বিনিময়ে বেপারির গরু চরায় তারা, গরুকে জাবনা দেয়, গরু গোয়ালে তোলে, ভোরবেলা গোয়াল থেকে গরু বের করে ফের চরাতে নিয়ে যায় মাঠে। তারা দেওয়ানের ছেলে, আরামে আয়েসে মানুষ, এত কষ্ট তাদের সয় না। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আলাল একদিন কাউকে না বলে পালিয়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে আলাল চলে গেল অনেক দূর। চলতে চলতে সে ঢুকে পড়ল এক বনের ভেতর। গহীন বনের ভেতর এক গাছের নিচে বসে আলাল গা জুড়াতে লাগল। এখন হয়েছে কি, ঐ বনে পাখি শিকার করতে এসেছিল সেকেন্দার দেওয়ান। সেকেন্দার দেওয়ান ধনুয়া নদীর তীরে বার জঙ্গল তের ভুঁয়ের দেওয়ান। তার খুব পাখি শিকারের সখ, আজও এক পাখির পেছনে ঘুরতে ঘুরতে সে এখানে ঢুকে পড়েছিল। গাছের নিচে এমন সুন্দর একটি ছেলেকে দেখে দেওয়ান তাকে সঙ্গে নিয়ে নিল।

আলাল এখন থেকে সেকেন্দার দেওয়ানের বাড়িতে কাজ করে। তার কাজ বেশ ভালো, সেকেন্দার দেওয়ান তার ওপর সন্তুষ্ট। কিন্তু সে বেতন নেয় না। বেতনের কথা বললে আলাল জবাব দেয়, 'বেতন আমি একবারে নেব।' তার কাজ বেশ ভালো, তার আচার ব্যবহারেও দেওয়ান সন্তুষ্ট। দেওয়ানের দুটি মেয়ে, আমেন মোমেনা। দেওয়ানের একেকবার ইচ্ছা করে, এদের একজনের সঙ্গে

আলালের বিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে চিরকালের মত আপন করে নেয়। কিন্তু দেওয়ানের মেয়ের সঙ্গে তো যার তার বিয়ে দেওয়া চলে না। আলাল কার ছেলে সে জানে না, কে তার বাবা, তার বংশ পরিচয় কি—কোন কিছুই আলাল খুলে বলে না। এসব জানতে চাইলে সে চুপ করে থাকে।

এইভাবে কাটে বারটি বছর। বার বছর পর আলাল একদিন বেতন চায় দেওয়ানের কাছে। দেওয়ান জানতে চায়, 'তুমি কত চাও? বেতন তুমি যেমন চাইবে তাই দেব।'

আলাল বলে, 'সাহেব, বানিয়াচঙ শহরের নাম জানেন? সেই শহরের লাগোয়া একটি বাগান আছে, ভারি সুন্দর সেই বাগান। ঐ বাগানে আমি বাড়ি বানাতে চাই। বাড়ি তৈরির জন্য আমাকে পাঁচশ লোক দেবেন। ঐ এলাকার মালিক সোনাফর দেওয়ানের সঙ্গে লড়াই করে বাড়ি করতে হবে আমাকে, তাই দুশো ফৌজ দেবেন সঙ্গে। এই হলেই আমার চলে।' দেওয়ান বিনা দ্বিধায় আলালের হাতে তার চাহিদামত কাজের লোক এবং সৈন্যসামন্ত তুলে দিলেন।

ওদিকে বানিয়াচঙের কথা কিছু বলি। তার চোখের মণি দুই ছেলে আলাল দুলাল নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর থেকে সোনাফর দেওয়ান পুত্রশোকে কাতর। দিনরাত সে কেবল বিলাপ করত, হায়রে, তার প্রাণের পুত্রেরা অকালে মরে তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। ওদিকে তার বিবি তাকে কেবল লাঞ্ছনা গঞ্জনা করত। এই বিবির গর্ভে তার একটি ছেলে জন্ম নেওয়ার পরও আলাল দুলালের জন্য তার শোক এতটুকু কমে নাই। শোকে দুঃখে বিধ্বস্ত সোনাফর দেওয়ান একদিন তার দেওয়ানি, তার ধন দৌলত, ঐশ্বর্য সব ছেড়ে তার আসল ঠিকানা অর্থাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

> একপুত্র হইলে পরে সেই না বিবির।
> তারে রাখ্যা সোনাফর গেল নিজের গির ॥

সোনাফরের মৃত্যুর পর বানিয়াচঙের দেওয়ান হয়েছে তার ঐ ছেলে। তাকে আবার চালায় তার মা। আগের সব উজির নাজির ছাঁটাই করে সোনাফরের বিবি নিজের মনের মত লোকজন বহাল করল। নতুন উজির, নতুন নাজির খালি গোঁফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, গুণেগুণে বেতন নেয় ঠিকই, কিন্তু কাজের বেলায় ফাঁকি।

বানিয়াচঙে পৌঁছে শহরের প্রান্তে বাগানের ভেতর লোক লাগিয়ে আলাল বিরাট বাড়ি বানাতে শুরু করল। পাঁচশ মজুর বাড়ি বানায়, চারদিকে পাহারা দেয় দুশ সেপাই। বানিয়াচঙের উজির নাজির খবর পেয়ে ফৌজ নিয়ে আসে আলালকে বাধা দিতে। দুই দলে তখন বাধল লড়াই। জোর লড়াই চলল। বানিয়াচঙ শহর ছারখার করে শহর দখল করল আলালের ফৌজ। তারপর বানিয়াচঙের দেওয়ান হল আলাল নিজেই।

ওদিকে সেকেন্দার দেওয়ান সব শুনে একেবারে অবাক। আবার খুশি হল খুব। তাহলে দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান আলালের সঙ্গে তার একটি মেয়েকে তো

স্বচ্ছন্দে বিয়ে দেওয়া চলে। সেকেন্দার দেওয়ানের মুখে বিয়ের পয়গাম শুনে আলাল বলে, 'আমার আর একটি ভাই আছে, তার কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হয়। তাকে খুঁজতে বের হব। যদি পাই তো আমরা দুই ভাই আপনার দুই মেয়েকে বিয়ে করব।'

অনেকদিন আগে যে ভাইকে গৃহস্থের ঘরে একা রেখে আলাল পালিয়ে এসেছিল এখন আবার তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়ল আলাল। কত গ্রাম, নদীনালা, বনজঙ্গল পাড়ি দেয়, না, ভাইয়ের দেখা আর মেলে না। এমনি ঘুরতে ঘুরতে আলাল এসে পৌছল এক হাওরে, হাওরে তখন পানি নাই, কেবল মাঠ। মাঠের মাঝখানে একটি বটগাছ। আলালের শরীর আর চলে না, বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে শরীরটা এলিয়ে দিল সে। ঐ গাছের ছায়াতেই বসে খেলা করছিল রাখাল বালকের দল। বিরাট হাওরে তারা গরু চরায়, গরুগুলো এদিক ওদিক চরে বেড়ায়, বটগাছের ছায়ায় বসে রাখালেরা খেলে, গল্প করে, আবার মাঝে মাঝে গান করতে থাকে। বিশ্রাম করতে করতে আলাল তাদের গান শোনে। তারা কোন দেশের এক দেওয়ানের গান করছিল। দুই ছেলে রেখে দেওয়ানের বিবি মারা গেলে দেওয়ান ফের বিয়ে করে।

সেই না দুষ্ট বিবি কোন কাম করে।
বাইল দিয়া জলে পাঠায় দেওয়ানের দুই বেটারে।

গান শুনতে শুনতে আলাল চমকে ওঠে, এই গানের দেওয়ানের ছেলেদের অবস্থা তো তাদের দুই ভাইয়ের মত। খুব মনোযোগ দিয়ে সে রাখালদের গান শোনে—

আশ্রা পাইল তারা গিরস্থের ঘরে।
বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন না সরে।
না পাইল ছোটু ভাই তারে বিচরাইয়া।
রাইত দিন যায় তার কান্দিয়া কান্দিয়া।

গান শোনে আর আলালের চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ে। রাখালদের সে জিজ্ঞেস করে, 'এই গান তোমাদের কে শেখাল ভাই?'

'আমরার গাঁওয়ের এক রাখাল আমরারে এই শিখাইছে। ঐ যে গিরস্থ বাড়ি দেখ, সে ঐখানে থাকে।' রাখাল বালকদের এই কথা শুনে আলাল গৃহস্থ বাড়ির দিকে রওয়ানা হলে পথে দুলালের সঙ্গে তার দেখা। অনেকদিন পর দুই ভাইয়ের মিলন, কিন্তু চিনতে কারো অসুবিধা হল না। আলাল বলে, 'দুলাল, চল বাড়ি যাই। বাবার দেওয়ানি ফিরে পেয়েছি, চল দুই ভাই মিলে বাবার জায়গায় বসি। তোমার জন্যে বিয়ের দুলহিন ঠিক করে রেখেছি, আমরা দুই ভাই সেকেন্দার দেওয়ানের দুই মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর করব, চল।'

কিন্তু এই প্রস্তাবে দুলাল সায় দিতে পারে না। সে তো বিয়ে করেছে এই গৃহস্থের মেয়ে মদিনাকে। তার একটি ছেলে আছে, নাম সুরুজ জামাল। মদিনাকে

সে বড় ভালবাসে, ছেলেটি তো তার চোখের মণি। এদের ছেড়ে যাওয়া দুলালের পক্ষে খুব অধর্মের কাজ হবে।

আলাল তাকে যাবার জন্য চাপ দেয়, 'তাতে কি? তালাকনামা লিখে দাও, তাহলে আর অধর্ম হবে না।'

'না ভাই, তা হয় না। মদিনা আমাকে খুব ভালবাসে। আমার সুরুজ আছে। এদের ছেড়ে যাই কি করে?'

আলাল তখন তোলে তাদের বংশের কথা। এই চাষী গৃহস্থের ঘরে থাকা কি তার মত দেওয়ানের ছেলের পক্ষে মানায়? সে বলে, 'জাত ঠিক না থাকলে কিসের সংসার, কিসের বিবিবেটা?'

এই কথায় দুলালের মন টলে। তাই তো, দেওয়ান বংশের ছেলে সে, বংশের মর্যাদা রক্ষা করা চাই। দুলাল এই ভেবে ডেকে পাঠায় মদিনার ভাইকে। তারপর তালাকনামা একটা লিখে তার হাতে সে পাঠিয়ে দেয় মদিনার কাছে।

বানিয়াচঙে এসে আলাল দুলাল দুই ভাই মহা সমারোহ করে বিয়ে করে সেকেন্দার দেওয়ানের দুই মেয়েকে। আল্লাহ আবার তাদের দিন ফিরিয়ে দিয়েছে, দেওয়ানি পেয়ে তারা সুখে জীবন যাপন করতে লাগল।

ওদিকে ভাইয়ের হাতে দুলালের তালাকনামা পেয়ে মদিনা কিন্তু একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিল। সে তো জানে, দুলাল তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আবার সুরুজ হল দুলালের চোখের মণি। না, তার স্বামী কি তাকে ত্যাগ করতে পারে? দুলাল আসলে কোথাও বেড়াতে গেছে, তার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছে।

দুলাল এই আজ আসবে, কাল আসবে ভেবে ভেবে মদিনার দিন কাটে। দুলালের জন্য সে একদিন তালের পিঠা বানায় তো আর একদিন খৈ ভাজে। দুলাল এসে খাবে বলে শিকায় তুলে রাখে গামছা বান্ধা দৈ। কিন্তু দুলালের দেখা নাই। শালি ধানের চিড়া কোটে, ভালো মাছ পেলে দুলালের জন্যে রেঁধে রাখে। কিন্তু দুলাল ফেরে না। এইভাবে ছয়মাস কেটে গেলে মদিনার খুব ভাবনা হল। ভাইকে ডেকে সে বলে, 'ভাই, সুরুজকে নিয়ে তুমি একবার তার কাছে যাও। সে কি বলে শুনে এস। আমার কথা বলো, দেখো, সে ঠিক চলে আসবে। তার সুরুজকে দেখলে সে কি না এসে পারে?'

বানিয়াচঙের কাছে দেওয়ানের বারদুয়ারী বাঙলোর কাছেই দুলালের সঙ্গে মদিনার ভাই আর সুরুজের দেখা হল। তাদের দেখে দুলাল একটুও খুশি নয়, তাদের কানে কানে বলে, 'তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। বাড়ি গিয়ে চাষবাস করে খাও। আমি দেওয়ানের ছেলে, এখন নিজেও দেওয়ান, চাষী গৃহস্থের ঘরে আমার বৌ বেটা আছে এ কথা এখানে জানাজানি হলে আমার আর ইজ্জত থাকবে না। তোমরা আর কোনোদিন এখানে এস না।'

কাঁদতে কাঁদতে সুরুজ বাড়ি ফিরে মায়ের কাছ সব বলল। তখন থেকে মদিনার দুঃখের কাল শুরু। মনে দারুণ আঘাত পেয়ে সে একেবারে ভেঙে পড়ল।

তা কপালে আল্লা কি লিখেছিল ভেবে মদিনা দিনরাত কেবল কাঁদে। দুলাল যেন একটি পাখির মত এসে তার হৃদয় জুড়ে আসন পেতে বসেছিল, আবার তাকে কিছুই না বলে সে এভাবে উড়ে যাবে তা কে জানত?

মদিনা কেবল দিনরাত দুলালের কথাই ভাবে। কত স্মৃতি মনে পড়ে আর বেদনায় আরো নুয়ে নুয়ে পড়ে। এক সঙ্গে তারা কি সুখের জীবনই না যাপন করত। মনে পড়ে অগ্রহায়ণ মাসে দুলাল ধান কেটে ঘরে ফিরত। সেই ধান উঠানে বিছিয়ে শুকাতে দিত মদিনা। দুজনে মিলে ধান কুলা দিয়ে ঝাড়ত, ঝেড়ে গোলায় ভরে রাখত। চোখের পানিতে মদিনা কত কিছুই না দেখতে পায়। চষা জমিতে পানি দিয়ে কাদা করে দুলাল ধানের চারা পুঁতত, তার দিকে একটি একটি করে চারা এগিয়ে ধরত মদিনা। আজ সেই স্বামী তাকে ভুলে কোথায় চলে গেছে। তাদের সুখের দিন কি তাহলে কেবলি স্বপ্ন?

> হায়রে দারুণ আল্লা এই আছিল মনে।
> কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে ॥

মদিনার বুক হাহাকার করে, সে তো চাষী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কেবল ফসল ভরা জমির কথা মনে পড়ে, মনে হয় তার ফসল ভরা ক্ষেতে কেউ যেন আগুন জ্বালিয়ে গেছে।

> আমার মতন নাই রে আর অভাগিনী।
> ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুনি ॥

মদিনার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় তার হৃদয় একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, কেবল শরীরটাই কোনভাবে টিকে আছে। মদিনা কিছুই খেতে চায় না, খাবারে তার রুচি নাই, চোখে ঘুম নাই। এইভাবে না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনরাত কেবল দুলালের ধ্যান করতে করতে মদিনার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। তার কথাবার্তা এলোমেলো হতে লাগল। সে এই হাসে, এই কাঁদে, এই কাউকে গালি দেয়। কখনও বা গান করে, কখনও চিৎকার করে, কখনও হাততালি দিতে থাকে। তার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে কেবল হাড্ডিসার হয়ে গেল।

> তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া।
> বেস্তের হুরী না গেল বেস্তেতে চলিয়া ॥

দুলালের শোকে, দুঃখে বেহেস্তের হুরের মত মদিনা বিবি একদিন ছেলেকে একা রেখে বেহেস্তে চলে গেল।

ওদিকে প্রাণের ধন, প্রাণের পুত্তলি একমাত্র সন্তান সুরুজকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় দিয়ে দুলালও কিন্তু সুখে নাই। তার বুকে একটু একটু করে কাঁটা বেঁধে। দিনে দিনে তার আফসোস বাড়ে। তার মনে হয়, সে বড় নির্দয় কাজ করেছে। মদিনা তার কথা জেনে না জানি কত ভেঙে পড়েছে। তার প্রাণের ভালোবাসা দিয়ে মদিনা বরণ করে নিয়েছিল দুলালকে, তাকে ত্যাগ করে এখানে এসে কি স্বার্থপরের মত দুলাল সুখে দিন কাটায়। বিপদের দিনে মদিনার বাবা তাকে আশ্রয় দিল, কত

বিশ্বাস করে মেয়েকে তুলে দিল তার হাতে। সেই চাষী গৃহস্থের বিশ্বাস সে রাখতে পারল না। মদিনার কথা ভেবে সুরুজের কথা ভেবে দুলালের বুক হুহু করে। সে ভাবে এবার মদিনার কাছে গিয়ে মাফ চাইবে। মদিনা মাফ করলে বাকি জীবন সে সেখানেই কাটিয়ে দেবে।

এইসব ভেবে দুলাল কাউকে কিছু না বলে বানিয়াচঙ থেকে বেরিয়ে পড়ে, যত তাড়াতাড়ি পারে মদিনার বাড়ি পৌছা দরকার। কিন্তু যাত্রা করতেই ডানদিকে শেয়াল দেখল, এই লক্ষণ তো ভাল নয়। মদিনার বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখে মদিনার প্রিয় গাইটি হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে, তার পেটে ঘাস নাই, পানি নাই। মদীনার বাড়ির বারান্দায় বুলবুলি পাখিটির খাঁচা শূন্যে ঝুলছে। দুলালের মনে পড়ে ছয় বছর বয়স থেকে মদিনা এই পাখিটিকে যত্ন করে করে দানাপানি দিত, বৈশাখ মাসে বুলবুলির মা বাচ্চাটিকে যদি নিয়ে যায়—এই ভয়ে দুলালকে দিয়ে সে কত আবদার করে খাঁচা বানিয়ে নিয়েছিল। আজ তার খাঁচাটি ফাঁকা কেন? হঠাৎ করে বাড়ির চালের ওপর থেকে বুলবুলি কেঁদে ওঠে। পোষা বিড়ালটা কোথায় যেন মিঁউ মিঁউ করে বিলাপ করে, গোয়ালে গরুর করুণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মদিনা কোথায়? তাকে তো কোথাও দেখা যায় না। দুলাল ডাকে, 'মদিনা, মদিনা'। না তার সাড়া নাই। দুরুদুরু বুকে কাঁপা কাঁপা গলায় দুলাল ফের ডাকে, 'মদিনা! মদিনা!' দেওয়ান দুলাল মিয়া চারদিকে তাকায়, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তার একমাত্র পুত্র সুরুজ।

> দুলাল জিগায়, 'সুরুজ মদিনা কোথায়।
> চোখে হাত দিয়া সুরুজ কয়বর দেখায় ॥

কবরের ওপর পড়ে দুলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার চোখের সামনে এখন সব অন্ধকার ঠেকে।

> জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের তারা।
> আমার কাছেতে অইল রাইতের আন্ধারা ॥

আফসোসে দুলালের বুক ভেঙে যায়, বংশের ইজ্জত রাখার উস্কানিতে পরম ভালোবাসার মদিনাকে ছেড়ে সে কিনা গেল দেওয়ানি করতে, গৃহস্থ চাষী ঘরের মেয়ের প্রাণের ভালোবাসা অবহেলা করে বিয়ে করতে গেল দেওয়ানের মেয়েকে। কিন্তু এখন যে তার সর্বস্ব গেল। সে বোঝে যে তার খানদানি রাখার খেসারত দিয়ে মদিনার মৃত্যু হল। দুলাল এখন কি করতে পারে? না, আর বানিয়াচঙ যাবে না সে। দেওয়ানগিরি তার দরকার নেই। মদিনার কবরে সে একটি কুঁড়েঘর বাঁধল। এই ছোট্ট কুঁড়েঘরেই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

> আর নাই সে গেল মিয়া বান্যাচঙের সরে।
> আখের গনিয়া দেখে কয়বর উপরে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী।' দুর্যোধন এই কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সবাই বুঝতে পারল যে যুদ্ধ এবার অনিবার্য। ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত ও প্রিয় সারথী সঞ্জয় তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যুদ্ধ করে কারো লাভ হবে না। দুর্যোধন তাঁকে অগ্রাহ্য করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পিতার বড় ভাই ভীষ্মকে বংশের সবাই গুরুজন বলে মানে, বীরত্বে, জ্ঞানে, বিবেচনায়, ভালোবাসায় ও ত্যাগে তাঁর তুলনা নেই। তো যুদ্ধ ঠেকাবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দুর্যোধনের চাচা বিদুর দেশে একজন বিদ্বান ও নির্বিরোধ মানুষ বলে পরিচিত। দুর্যোধনের গর্জনে তিনি মনে মনে আহত হয়ে তাঁকে এই সর্বনাশা উদ্যোগ থেকে বিরত রাখতে কত মিনতি করলেন। যদু বংশের কৃষ্ণ নিজেই দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুর এসে রক্তক্ষয়ের বিরুদ্ধে কত যুক্তি দিলেন। কিন্তু না, যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধন একেবারে সংকল্পবদ্ধ।

এই যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? কোনো বিদেশী সৈন্যবাহিনী কি তাঁদের রাজত্ব আক্রমণ করেছে? কিংবা অন্য দেশের কোনো রাজা কি রাজপুত্র কি তাঁদের কাউকে অপমান করেছে? অথবা দলবল নিয়ে এসে তাঁদের এলাকা থেকে পশু নিয়ে পালিয়ে গেছে? না, এই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে ভাইদের বিরুদ্ধে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই অস্ত্র ছুঁড়বে, ভাইয়ের প্রাণ যাবে ভাইয়ের হাতে। রাজত্বের জন্য, ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ হতে যাচ্ছে পাণ্ডুর ছেলেদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই, দুজনেই রাজা বিচিত্রবীর্যের পুত্র। এঁদের ছেলেরা চাচাতো ভাই, একই বংশের রক্ত এঁদের রক্তে প্রবাহিত।

বর্তমান দিল্লী নগরীর পূর্বদিকে মিরাটের কাছে গঙ্গার দক্ষিণ দিকে হস্তিনাপুর ছিল কৌরবদের রাজধানী। কৌরব রাজা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অন্ধ বলে রাজত্ব পান নি, রাজা হয়েছিলেন দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডু। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র, প্রথম স্ত্রী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীর

গর্ভজাত পুত্রদের নাম নকুল ও সহদেব। এঁদের নাবালক রেখে পাণ্ডুর অকালমৃত্যু হলে মাদ্রী স্বামীর চিতায় সহমরণ বরণ করেন। কুন্তী অসহায় অবস্থায় স্বামীর পাঁচ পুত্রকে নিয়ে আশ্রয় নেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দুর্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, সোমকীর্তি, ধনুর্ধর, চিত্রবাণ, নিষঙ্গী, দুঃশল এবং আরো নব্বইজন মিলে ধৃতরাষ্ট্রের মোট পুত্রসংখ্যা একশ', তাঁর একমাত্র কন্যার নাম দুঃশীলা। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সবাই কুরুবংশের সন্তান বলে এঁরা সবাই কৌরব, কিন্তু পরে কেবল ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাই কৌরব বলে পরিচিত হন, পাণ্ডুর ছেলেদের বলা হয় পাণ্ডব। এঁরা সবাই একসঙ্গে মানুষ হতে লাগলেন।

ভীষ্ম তো সকলের গুরুজন। তিনি চিরকুমার। তাঁর রাজত্বের লোভ ছিল না, স্বেচ্ছায় রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন সৎভাই বিচিত্রবীর্যকে। ভ্রাতুষ্পুত্র দুজনের সব পুত্রের সবরকম বিদ্যাশিক্ষার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন নিজের হাতে। দ্রোণ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ, ভীষ্ম তাঁকে নিয়োগ করেন এঁদের তীরবিদ্যা শিক্ষাদানের কাজে। এই বিদ্যায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শিতা দেখাতে লাগলেন অর্জুন। শারীরিক শক্তিতে সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন ভীম, গদা চালানোতে তাঁর জুড়ি কেউ রইল না। যুধিষ্ঠির খুব মহৎ স্বভাবের, সৎ চরিত্রের মানুষ। নকুল-সহদেব তাঁদের আচরণ ও ব্যবহারে মানুষকে মুগ্ধ করতেন। পাণ্ডবদের সবাই দিন দিন জনপ্রিয় হতে লাগলেন। এতে কৌরবদের ঈর্ষা হতে লাগল। এর ওপর ভীম করতেন কি প্রায়ই নিজের গায়ের জোরে তাঁদের নাকাল করতেন। ফলে কৌরবদের রাগ আরো বেড়ে গেল। পাণ্ডবদের হেনস্থা করার জন্য তাঁরা তাই নতুন নতুন ফন্দি খুঁজতে লাগলেন।

কুরুবংশের প্রথা অনুসারে বংশের বড় ছেলেই রাজত্ব পান। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধিষ্ঠির বড়, তিনিই পরবর্তী রাজা বলে স্থির করা হল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা এতে সায় দিতে পারলেন না। তাঁদের পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ বলে রাজত্ব পান নি, আবার তাঁরাও বঞ্চিত হচ্ছেন দেখে রাগে দুঃখে ক্ষোভে তাঁরা একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। কর্ণ নামে একজন অসাধারণ বীর ছিলেন, তীরবিদ্যায় তিনি ছিলেন অর্জুনের সমকক্ষ। গরীব ছুতারের ঘরে মানুষ হয়েছেন বলে অর্জুন তাঁকে অন্যায়ভাবে অপমান করেছিলেন। পাণ্ডবদের শায়েস্তা করার জন্য তিনিও সংকল্পবদ্ধ হয়ে কৌরবদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র নিজেও যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। মৃত ভাইয়ের ছেলেদের জন্য তাঁর ভালবাসাও কম নয়। তবে নিজের সন্তানদের প্রতি একটু দুর্বলতাও তাঁর ছিল। সিংহাসনের জন্য লোভী পুত্রদের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার নির্দেশটি তিনি তেমন জোর দিয়ে বলতে পারেন নি।

কৌরব ও পাণ্ডবদের এই যুদ্ধের আয়োজন শুরু হল দারুণভাবে। যুদ্ধের স্থান স্থির করা হল কুরুক্ষেত্র। এই জায়গাটি বর্তমানে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অম্বালা ও কর্নাল জেলার অন্তর্ভুক্ত। নানা দেশ থেকে রাজারা নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে

কেউ কৌরবপক্ষে কেউ পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে এলেন। কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধে নামলেন এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য, পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী। এক অক্ষৌহিণীতে সৈন্য থাকে দুই লাখ আঠার হাজার সাতশ'। পাণ্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদীর ভাই পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন হলেন পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতি, অর্জুনকে করা হল প্রধান পরিচালক, অর্জুনের অশ্বরথ চালাবার দায়িত্ব নিলেন কৃষ্ণ। কৌরবদের পক্ষে সেনাপতি পদ গ্রহণ করার জন্য দুর্যোধন তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলে তিনি রাজি হলেন।

সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়েছে। কৃষ্ণ এগিয়ে আসছেন অর্জুনের রথ চালিয়ে। কিন্তু শত্রুপক্ষে নিজের আপনজনদের দেখে অর্জুনের মন খুব খারাপ। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, 'কৃষ্ণ, এই যুদ্ধে আমি যাদের মারব তাঁরা তো তোমারই ভাই, আমার চাচা, দাদু। এঁদের নিধন করে আমার লাভ কি?'

'তুমি ক্ষত্রিয়, রাজার জাত। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সরে পড়া তোমার জন্য চরম অসম্মানজনক।' কৃষ্ণের এই কথায় অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন না, বরং উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না কৃষ্ণ, এই যুদ্ধ করা খুব অন্যায় হচ্ছে। আপনজনদের হত্যা করার ফল কি ভালো হতে পারে?'

'কৌরবরা অন্যায় করছে বলেই তো তোমাকে যুদ্ধ নামতে হয়েছে, অন্যায়ের প্রতিকার করা মানুষের কর্তব্য। পরিণতিতে কি হবে না হবে, ফল ভালো কি খারাপ সেদিকে লক্ষ্য না রেখে কর্তব্য পালন করাই প্রকৃত মানুষের কাজ।'

অর্জুন এবার বিনা দ্বিধায় শত্রুর দিকে এগিয়ে চললেন। ওদিক থেকে আসছে কৌরব সৈন্যরা। সংঘর্ষে লিপ্ত এই দুই দল এমন গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে যে মনে হয় দুটি সমুদ্র প্রচণ্ড ঝড়ে ফুলে ফুঁসে উঠছে।

হঠাৎ দেখা গেল যে যুধিষ্ঠির একা একা কৌরব শিবিরের দিকে যাচ্ছেন। কি ব্যাপার? তিনি গিয়ে হাজির হলেন ভীষ্মের কাছে, তাঁকে প্রণাম করে পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'দাদু, আপনি অপরাজেয় বীর, আপনার সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছি। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

ভীষ্ম ছিলেন উদার হৃদয়ের স্নেহপ্রবণ মানুষ। পাণ্ডবরা তাঁর পৌত্র, নিজের হাতে এঁদের তিনি মানুষ করেছেন। এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেও এঁদের প্রতি তাঁর স্নেহ একটুও কমে নি। শত্রুপক্ষের সেনাপতি হয়েও তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন, 'কৌরবদের অর্থে আমি জীবনযাপন করি, এঁদের সঙ্গে নিমকহারামি করতে পারব না বলেই তোমাদের বিরুদ্ধে আজ অস্ত্র ধরেছি। কিন্তু তবু তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের জয় হোক।'

এতোক্ষণ সৈন্যদের অবস্থান নেওয়া চলছিল, এক একটি জায়গা থেকে তাঁরা শত্রুপক্ষকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন এবার সরাসরি পাণ্ডবদের দিকে তীর ছুঁড়তে শুরু করলেন। দুঃশাসনের সেনাদলের সামনে ভীষ্ম। ভীষ্ম সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন অর্জুনকে, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর

তীরের আঘাতে ভীষ্মের রথের সোনা দিয়ে মোড়ানো চূড়া ভেঙে পড়ল। দুই পক্ষেই প্রচণ্ড তীর ছোঁড়া হচ্ছে, দুই পক্ষের শত শত সৈন্য নিহত বা আহত হচ্ছে, এমন কি কয়েকজন রাজাও রথে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েছেন। মৎস্য দেশের রাজপুত্র শ্বেতের শরাঘাতে শতশত কৌরব সেনা নিহত হচ্ছে দেখে ভীষ্ম রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁর প্রতি ভল্ল ছুঁড়ে মারলেন। বড় এক ধরনের বর্শাকে বলা হত ভল্ল। ভীষ্মের ভল্লের ঘায়ে শ্বেতের রথের ঘোড়া ও সারথীর মৃত্যু হলে শ্বেত শক্তি-অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু ভীষ্ম তীর দিয়েই এই আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারলেন। শ্বেতের গদা খুব শক্ত, গদার ঘায়ে ভীষ্মের রথ, সারথী ও ঘোড়া নিহত হলে ভীষ্ম খুব বেগে একটি তীর মেরে শ্বেতকে নিহত করলেন।

পরদিন খুব ভোরে যুদ্ধ ফের শুরু হলেও দেখা গেল যে পাণ্ডবদের অনেক সৈন্য দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভীষ্মের পরিচালনাতেই কৌরবরা এমন সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারছে। তীর অবশ্য দুদিক থেকে সমানে ছোঁড়া হচ্ছিল, এমন কি তীরে তীরে সংঘর্ষের ফলে কোথাও কোথাও আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠছিল। এদিকে পাণ্ডবদের বেশ কয়েকজন রাজাও নিহত হয়েছেন দেখে যুধিষ্ঠির বেশ বিমর্ষ। একবার কৃষ্ণকে তিনি বলেও ফেললেন, 'আর যুদ্ধ চালিয়ে লাভ কি? আমাদের একটি সৈন্যও মনে হয় বাঁচবে না।' কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিলেন, 'হতাশ হবেন না। ভীষ্মকে ঘায়েল করতে পারলেই কৌরবদের কাবু করা সোজা।' ভীষ্মকে চরম আঘাত করার জন্য অর্জুন প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। নানা রকমের, নানা শক্তিধর তীর তিনি ছুঁড়ছেন, কিন্তু ভীষ্ম নিপুণভাবে তাঁর তীর দিয়েই সব আঘাত ফিরিয়ে দেন। না, ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব।

তখন এঁরা করলেন কি, একদিন রাত্রে যুদ্ধবিরতির সময় পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই কৃষ্ণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন কৌরব শিবিরে। যুধিষ্ঠির বললেন, 'দাদু, আপনি আশীবাদ করেছেন, আমাদের জয় হোক, কিন্তু আপনি থাকতে আমরা কি টিকতে পারব? আপনাকে হত্যা করা যায় কি করে?' ভীষ্ম হাসলেন, নিজেকে বধ করার উপায় বলতে হবে নিজেকেই। সত্যি তিনি পাণ্ডবদের ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন, ভীষ্মের মুখে ভীষ্মবধের কৌশল জেনে তাঁরা নিশ্চিত।

যুদ্ধের নবম দিনে পাণ্ডবরা যুদ্ধে নামে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে। শিখণ্ডী ছিলেন দ্রুপদরাজের পুত্র। কিন্তু আগের জন্মে তিনি ছিলেন কাশীরাজের কন্যা। ভীষ্মের পরামর্শ অনুসারেই তাঁকে সামনে রাখা হয়। ভীষ্ম কখনো পলায়মান, ভীত, আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধা বা মহিলাদের আক্রমণ করতেন না, এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল একেবারে অটল। ভীষ্মকে মারার জন্য অর্জুন অনেক আগে থেকেই সংকল্পবদ্ধ। এবার সেই সুযোগ তাঁর হাতে এসেছে। কিন্তু ভীষ্মের দিকে তীর ছুঁড়তে তাঁর হাত কাঁপছিল। তিনি খুব দ্বিধায় পড়লেন। কৃষ্ণ তাঁকে বারবার উত্তেজিত করলে তিনি বললেন, "শৈশব থেকে এই দাদুর কোলেপিঠে আমি মানুষ, আমাদের বাবা ছিলেন না, দাদুকেই বাবা বলে জানতাম। ছেলেবেলায় কতদিন

ধূলিপায়ে দাদুর বুকে 'বাবা, বাবা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, ভীষ্ম আদর করে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, "ওরে আমি তোর বাবা নই, তোর বাবার বাবা।' আমার শিক্ষাদীক্ষা যা বলো এঁর কাছেই। এই দাদুকে আমি নিজ হাতে মারবো কি করে?"

'অর্জুন, ভীষ্মকে মারার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এখনই সুযোগ,' কৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ওসব কথা বললে চলবে কেন?'

ওদিকে শিখণ্ডী ভীষ্মের দিকে তীর ছুঁড়তে শুরু করেছেন। ভীষ্ম কিন্তু তাঁকে কোনো আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, বরং বারবার বলছেন, 'তোমাকে আঘাত করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, তুমি তো সেদিনও ছিলে একটি মেয়েমানুষ।' পাণ্ডবদের মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বপক্ষের সৈন্যদের চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'সবাই এদিকে এস, একসঙ্গে ভীষ্মকে আক্রমণ কর, এই কিন্তু সুযোগ, তাঁকে এবার শেষ করে ফেল।' ওদিক থেকে নির্ভয়ে এগিয়ে আসছেন দুঃশাসন, ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করেছেন। দুঃশাসনকে কাবু করা অর্জুনের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে অর্জুনের কপালে এসে বিঁধল দুঃশাসনের একটি তীক্ষ্ণ তীর। ঐ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে মনে হচ্ছিল ফুল-ফোটা পলাশ গাছের মত। তীরের আঘাতে তাঁর মাথা একটু টলে গিয়েছিল, সেটা সামলে নিয়ে অর্জুন দুঃশাসনের সামনে এমন অবিরাম তীর ছুঁড়তে লাগলেন যে একটি শরজাল তৈরি হল, দুঃশাসন চোখের সামনে কেবল অন্ধকার দেখতে লাগলেন। অর্জুন কি এই সুযোগ হারান? তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভীষ্ম, দুঃশাসনকে অন্ধকারে রেখে তিনি এবার একটির পর একটি তীর ছুঁড়তে শুরু করলেন ভীষ্মের উদ্দেশ্যে। তাঁর সামনে শিখণ্ডী থাকায় ভীষ্ম তীর ছুঁড়তে পারছেন না। অর্জুনের অজস্র তীরের আঘাতে তাঁর বিশাল শরীর কেবল তীরে তীরময় হয়ে গেল। যুদ্ধের সেদিন দশম দিবস। আঘাত আর সহ্য করতে না পেরে সূর্যাস্তের ঠিক আগে ভীষ্ম পূর্বদিকে মাথা রেখে পড়ে গেলেন। সমস্ত শরীর জুড়ে তাঁর তীর বেঁধা, তাই শরীর আর মাটি স্পর্শ করল না। অনেকগুলো তীরের ওপরেই তিনি শুয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল ভীষ্ম যেন শরশয্যায় শুয়ে রয়েছেন। কেবল মাথায় তীর লাগে নি বলে মাথাটা শূন্যে ঝুলছিল।

সূর্যাস্তের পর কৌরব ও পাণ্ডবদের সবাই ভীষ্মের কাছে এসে একে একে তাঁকে প্রণাম করলেন। মাথা ঠিকমত রাখার জন্য ভীষ্ম বালিশ চাইতেই দুর্যোধন নরম সিল্কের কাপড়ে মোড়া পালকের বালিশ এনে দিলেন। কিন্তু এই বালিশ ভীষ্মের পছন্দ নয়। অর্জুনকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'অর্জুন, তুমি আমাকে তীরের বিছানা করে দিয়েছ, বালিশ তো দাও নি। এই কোমল বালিশ কি যোদ্ধার উপযুক্ত?' ভীষ্মের ইচ্ছা অর্জুন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝে খুব নিপুণভাবে ভীষ্মের মাথা লক্ষ্য করে [এমনভাবে] তিনটি তীর ছুঁড়লেন যে ঝুলন্ত মাথাটা এর ওপর স্থির হয়ে স্থাপিত হয়ে গেল।

ভীষ্মের পতনের পর কৌরবগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের অবস্থা হয় হিংস্র পশুপূর্ণ বনের পালকহীন মেষদের মত। কর্ণের পরামর্শে দুর্যোধন এবার সেনাপতি

নিযুক্ত করলেন দ্রোণকে। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষাগুরু, সবাই তাঁকে সম্মান করেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করে দ্রোণাচার্য বলা হয়। তিনি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন, এঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে অর্জুনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবেন না। যাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁদের বলা হয় সংশপ্তক। নারায়ণী সৈন্যরাও পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে বিপুল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কৃষ্ণ নিজে ছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে, কিন্তু নারায়ণী সেনা বলে পরিচিত তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তিনি তুলে দিয়েছিলেন দুর্যোধনের হাতে, তাঁরা কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।

অর্জুন তাঁর সারথীকে বললেন, 'কৃষ্ণ, আমার রথ ঐ সংশপ্তকদের দিকে নিয়ে চলুন, ওদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে ওরা আমাকে শেষ করে ফেলবে।' সংকল্পবদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত সংশপ্তকদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে অর্জুন খুব পর্যুদস্ত হচ্ছিলেন, তাঁদের বিরামহীন তীরনিক্ষেপে মরিয়া হয়ে তিনি ত্বাষ্ট্র নামে একটি অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন। এই অস্ত্রটি বিশ্বকর্মার তৈরি এবং এর এমনি গুণ যে এটা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সংশপ্তকদের মধ্যে শত শত মানুষের প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হল, তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করল। কিন্তু ওদিকে যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করার উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের নির্দেশে দ্রোণ গরুড় পাখির আকৃতির একটি ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে আসছিলেন। দুর্যোধনের লক্ষ্য সাধু নয়, তিনি চাইছিলেন যুধিষ্ঠিরকে কোনোভাবে গ্রেফতার করে তাঁকে পাশা খেলায় বসিয়ে দেবেন। যুধিষ্ঠিরের আবার পাশা খেলার দিকে খুব ঝোঁক, এই খেলায় একবার মগ্ন হলে তিনি সবকিছু, এমন কি রাজ্য, স্ত্রীপুত্র পর্যন্ত বাজি রাখতেন। দ্রোণাচার্যের ব্যূহে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছিলেন বড় কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতি দেশের বীরযোদ্ধারা। বঙ্গ ও প্রাগজ্যোতিষের হস্তিবাহিনীর দক্ষ সেনাবাহিনী হিসেবে খুব খ্যাতি ছিল। প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত তাঁর হাতি নিয়ে বিপুল বেগে এগিয়ে আসছিলেন অর্জুনের দিকে, এই হাতিটি আবার স্বর্গরাজ ইন্দ্রের হাতির বংশধর। ভগদত্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন অর্জুনের দিকে, এটা ফিরিয়ে দেওয়া অর্জুনের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিজেই অস্ত্রটি নিজের বুকে ধারণ করলেন মালারূপে। অর্জুন এই সুযোগে তাঁর নারাচ নামের অস্ত্র দিয়ে ভগদত্তের হাতিটিকে বধ করলেন। ভগদত্ত নিচে পড়ে গেলে অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে অর্জুনের কোনো বেগ পেতে হল না।

ভগদত্তের মৃত্যুতে কৌরবদের মনোবল অনেকটা ভেঙে যায়। যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্য দুর্যোধন তখন একেবারে অস্থির। তাঁর অস্থিরতা দেখে দ্রোণ একটি ব্যূহ রচনা করলেন, এর নাম চক্রব্যূহ। এই চক্রে ঢুকে সফলভাবে বেরিয়ে আসতে জানেন অর্জুন। অর্জুনের তরুণ পুত্র অভিমন্যু এই চক্রে ঢুকতে জানেন কিন্তু বেরুবার উপায় তাঁর জানা নেই। এই চক্রটি এমনভাবে এগিয়ে আসছিল যে

পাণ্ডবরা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। ওদিকে অর্জুন ব্যস্ত রয়েছেন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তাই অভিমন্যুকেই ঐ চক্রব্যুহে ঢুকে পড়তে হল বাধ্য হয়ে। ভেতরে ঢুকে তিনি অবিরাম তীর ছুঁড়তে শুরু করলেন, ঐ তরুণ বীরের তীরে কত কৌরব সেনা যে মারা পড়ল তার আর ইয়ত্তা নেই। দ্রোণের ইঙ্গিতে কর্ণ তখন পেছন থেকে আক্রমণ করলেন অভিমন্যুর ধনুকের ওপর। অভিমন্যু একটু হতভম্ব হতেই কৌরবপক্ষ এই সুযোগ ছাড়লেন না। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি সবাই একসঙ্গে গোল হয়ে অভিমন্যুর দিকে তীরের পর তীর ছুঁড়তে শুরু করলেন। অভিমন্যু শেষ পর্যন্ত রথ থেকে লাফিয়ে পড়তেই তাঁর রথের চাকা ভেঙে গেলে তিনি সেই চাকা নিয়েই কৌরবদের দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কৌরবরা ব্যূহের সবদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। তাই শেষ রক্ষা হল না। ব্যূহের ভেতর কৌরবদের সমবেত আঘাতে তিনি নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রিয় পুত্রের নিহত হওয়ার সংবাদে অর্জুন শোকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে তিনি জানতে পারেন যে কৌরবপক্ষের বিশিষ্ট বীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথই পাণ্ডবপক্ষকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখায় তাঁরা অভিমন্যুকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই পরদিন ভোরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই অর্জুনের একমাত্র লক্ষ্য হল জয়দ্রথকে বধ করা। জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য দ্রোণ অনেকগুলি ব্যূহ রচনা করেছিলেন, এতগুলো ব্যূহ ভেদ করে তাঁকে হত্যা করা অসম্ভব। কৃষ্ণ তখন একটি ফন্দি করলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিয়ম ছিল যে সূর্যাস্তের পর দুই পক্ষই অস্ত্র ত্যাগ করে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যাবেন। কৃষ্ণ করলেন কি মায়া তৈরি করে সূর্যকে অসময়ে ঢেকে দিলেন, কৌরবরা খুশি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যেতে লাগলেন। তাঁরা আরও খুশি এই জন্য যে এখন পর্যন্ত জয়দ্রথ বধ করতে না পারায় অর্জুনকে এখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। খালি মাঠ পেয়ে অর্জুন জয়দ্রথের খুব কাছাকাছি গিয়ে তাঁর বজ্রের মত বাণ ছুঁড়ে জয়দ্রথের মাথা উড়িয়ে দিলেন। পরপর আরো কয়েকটি তীর মেরে ঐ মাথাটিকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন অনেক দূরে, সমন্তপঞ্চক নামে একটি জায়গায় একটি হ্রদের তীরে, জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র সেখানে বসে তপস্যা করছেন। জয়দ্রথের কাটামুণ্ডু পড়ল তাঁর কোলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে তিনি লাফিয়ে দাঁড়ালেন, আর পুত্রের মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মাথাটিও ধড় থেকে ছিঁড়ে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে বৃদ্ধক্ষত্র দেবতাদের কাছে বর পেয়েছিলেন যে যার কাছ থেকে তাঁর পুত্রের মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়বে তার মাথাটিও আপনি খসে যাবে। এখন অর্জুন যদি জয়দ্রথের মাথাটিকে এভাবে তীরের পর তীর দিয়ে ছুঁড়ে বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেলতে না পারতেন তো তাঁর নিজেরই ঐ দশা হত।

জয়দ্রথকে বধ করার পরই কৃষ্ণ মন্ত্রবলে সূর্যের ওপর থেকে অন্ধকার সরিয়ে ফেললেন, সবাই বুঝল যে তখনও সূর্যাস্ত হয় নি। কৌরবরা বেশ হতাশ। বিশেষ করে জয়দ্রথের মৃত্যুতে দুর্যোধনও শোকে ম্রিয়মাণ হলেন। জয়দ্রথ যেমন ভালো

যোদ্ধা তেমনি তাঁদের একমাত্র বোন দুঃশীলার স্বামীও ছিলেন। দুর্যোধনের মনোবল বাড়াবার উদ্দেশ্যে দ্রোণ রাত্রিবেলাতেও যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখন রাতভর যুদ্ধ। ভীমের রাক্ষুসী স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম ঘটোৎকচ দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে কৌরবদের একের পর এক নিধন করে যাচ্ছে। তাঁকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এলেন কর্ণ। তো ঘটোৎকচের শতঘ্নী অস্ত্রের আঘাতে কর্ণের রথের চারটি ঘোড়াই মারা পড়লে কর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর হাতে রয়েছে অব্যর্থ শক্তবাণ, এটি কারো দিকে নিক্ষেপ করলে তার মৃত্যু অবধারিত। এটি তিনি রেখেছিলেন অর্জুনকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু আজ ঘটোৎকচের হাত থেকে কৌরবদের রক্ষা করার জন্য দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে তিনি এটাই ছুঁড়ে মারলেন ঘটোৎকচকে লক্ষ করে। তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে ঘটোৎকচ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তবে তাঁর ঐ মস্ত শরীরের নিচেও বেশ কয়েকজন কৌরব সৈন্য চাপা পড়ে মারা যায়।

অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ—পরপর দুজন সন্তান মারা পড়ায় পাণ্ডবরা খুব হতাশ। এখন কি করা যায়? দ্রোণের নেতৃত্বই কৌরবদের সুবিধাজনক অবস্থার কারণ। কিন্তু তিনি অসাধারণ অস্ত্রবিদ, হাতে যতোক্ষণ অস্ত্র থাকে তাঁকে হত্যা করা অসম্ভব। এখন সবাই জানেন যে কেবল সন্তানের মৃত্যুসংবাদ পেলেই তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন, [এবং] ঐ সময়ে তাঁকে ধ্বংস করা যায়। পাণ্ডবরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে দ্রোণকে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিতে হবে। ভীম করলেন কি অশ্বত্থামা নামে একটি হাতিকে হত্যা করে দ্রোণকে বললেন, অশ্বত্থামা হত হয়েছে। স্বভাবতই অশ্বত্থামা বলতে তিনি দ্রোণপুত্রের কথাই বুঝিয়েছিলেন। দ্রোণ তাঁর কথায় কান দিলেন না। তখন সবাই যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণকে পুত্রের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলেন। এমন কি কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে খুব উস্কে দিলে যুধিষ্ঠির চিৎকার করে বললেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ' অর্থাৎ অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে। তারপর খুব নিচুস্বরে বললেন, 'ইতি কুণজ্জরঃ।' অর্থাৎ এই নামের একটি হাতি। এই কথা তিনি এতো আস্তে বলেছিলেন যে কেউ শুনতে পায় নি। যুধিষ্ঠিরের নিজের মুখে পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রোণাচার্য অবিশ্বাস করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অস্ত্রত্যাগ করলেন। এই সুযোগ কি পাণ্ডবরা হাতছাড়া করতে পারেন? পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এগিয়ে গিয়ে নিরস্ত্র দ্রোণাচার্যের মাথা খড়গ দিয়ে কেটে ফেললেন। পরম সত্যবাদী বলে যুধিষ্ঠিরের রথ কখনো মাটি স্পর্শ করে না, কিন্তু কৃষ্ণ এবং অন্যান্য পাণ্ডব নেতাদের প্ররোচনায় এই প্রথম কপট ও মিথ্যাচার করায় তাঁর রথ এবার মাটিতে নেমে এল।

এবার কৌরবদের সেনাপতি হলেন কর্ণ। কর্ণ এতে বিশেষভাবে আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করলেন। তাঁর জীবনের প্রথম, প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হল পাণ্ডবদের ধ্বংস করা। কর্ণ কিন্তু আসলে কুন্তীর প্রথম পুত্র। তিনি যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং ভীমের বড় ভাই। কিন্তু সূর্যের আশীর্বাদে কুন্তীর গর্ভে তাঁর জন্ম হলে কুন্তী এ কথা গোপন করে তাঁকে একটি পাত্রে ভরে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অধিরথ

নামে একজন সুতারমিস্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী রাধা তাঁকে নিজের সন্তান হিসাবে মানুষ করেন, কর্ণ পরিচিত হন সূতপুত্র বা সুতারের ছেলে বলে। গরীব ও শ্রমজীবীঘরের ছেলে বলে সবাই তাঁকে জানতো, তাই তীরবিদ্যায় অর্জুনের সমকক্ষ হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবরা তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। দুর্যোধন তাঁকে নিজের দলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করে দেন, তবু পাণ্ডবরা তো বটেই, এমন কি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ কৌরব বীরও তাঁকে উপেক্ষা করতেন। কর্ণ বলতেন, বড় নদীর উৎস সম্বন্ধে মানুষের যেমন কোনো কৌতূহল নেই, বীরের জন্ম নিয়েও তেমনি কারো মাথাব্যথা থাকা সমীচীন নয়। মানুষ পরিচিত হবে নিজের কাজ দিয়ে, কোন বংশে তার জন্ম এটা গৌণ বিষয়। কর্ণ আবার খুব উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, কেউ কিছু চাইলে তিনি না করতে পারতেন না। এমন কি নিজের ক্ষতি হবে জেনেও শত্রুপক্ষের দেবতাকেও নিজের রক্ষাকবচ দিয়ে দিতে তাঁর বাধে নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কুন্তী তাঁর কাছে এসে মিনতি করেছিলেন, 'বাবা, তুমি জান না যে তুমি আমার গর্ভজাত সন্তান, যুধিষ্ঠিররা তোমার ভাই। তুমি কৌরবপক্ষ ছেড়ে ভাইদের জন্য যুদ্ধ কর।' কর্ণ কিন্তু মায়ের কথা শোনে নি, তিনি বলেছিলেন, 'মা, আমাকে জন্ম দিয়েও তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে, অধিরথ ও রাধা গরীব হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আমাকে নিজের পুত্র হিসেবে মানুষ করেছেন। পাণ্ডবরা আমাকে অপমান করেই সবচেয়ে সুখ পায়, আর দুর্যোধন আমাকে মর্যাদা দেন। কৌরবদের পক্ষে না থাকলে আমার অধর্ম হবে।'

সেনাপতি হয়ে তাঁর সারথী হিসাবে কর্ণ লাভ করলেন শল্যকে। শল্যও তাঁর ওপর বিরূপ ছিলেন, কেবল দুর্যোধনের অনুরোধে তিনি কর্ণের সারথী হতে রাজি হন। এদিকে কর্ণ সেনাপতি হওয়ার পর দুঃশাসন প্রথমে আক্রমণ করলেন ভীমকে। ভীম একটি তীর দিয়ে সেই তীর ফিরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন রথ থেকে এবং দুঃশাসনকে জাপটে ধরে তাঁর বুকে ঢুকিয়ে দিলেন ধারালো তলোয়ার। দুঃশাসন পড়ে গেলে ভীম তাঁর বুকে মুখ রেখে শোঁ শোঁ করে রক্তপান করতে লাগলেন। রক্তপান করে তিনি পরম তৃপ্ত, রক্তমাখা মুখে নাচতে নাচতে বললেন, 'মায়ের দুধ খেয়েছি, বৃষ্টির পানি খেয়েছি, মধু, ঘি, দৈ—এসব অমৃতের মত পানীয় অনেক খেয়েছি। কিন্তু শত্রুরক্তের মত সুস্বাদু পানীয় আর কিছুই নয়।'

এর মধ্যে কর্ণের পুত্র বৃত্রসেনকে দেখে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুহত্যার কথা মনে পড়লে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে একটি তীরের তীক্ষ্ণ আঘাতে তাঁকে হত্যা করেন। পুত্রশোকে অধীর কর্ণ ছুটে আসেন অর্জুনকে বধ করতে। কর্ণের রথটি বাঘের চামড়ায় মোড়ানো, এর দণ্ড তিনটি রূপার। ক্ষিপ্র গতিতে চলছিল, রথটি চকচক করছিল। অর্জুনও ছুটে আসছেন তীব্র বেগে, তাঁর চেহারা ভয়ানক রুদ্র রূপ ধারণ করেছে। সমানে সমানে যুদ্ধ চলছে। অন্যান্য যোদ্ধারা চিৎকার করে কেউ কর্ণকে কেউ অর্জুনকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। কর্ণ একবার একটি বাণ ছুঁড়লেন, সেইবাণে লুকিয়ে ছিল ভয়ানক সাপ তক্ষকসেনের পুত্র অশ্বসেন। ঐ সাপ কিন্তু

অর্জুনকে স্পর্শ করতে পারল না, কৃষ্ণ টের পেয়ে অর্জুনের রথ মাটির নীচে খানিকটা গেঁথে দিলেন, তীর অর্জুনের মুকুট স্পর্শ করে চলে গেল, তাঁর মুকুটটাই কেবল পুড়ল। কৃষ্ণ ক্ষিপ্র গতিতে নেমে রথ মাটি থেকে ওপরে তুললেন। এবার নতুন বল সঞ্চয় করে অর্জুন যে তীর ছুঁড়লেন তাতে কর্ণের মুকুট উড়ে গেল, তাঁর শরীরও ক্ষতবিক্ষত হল। জ্বরের রোগীর মত কর্ণের শরীরে তখন তীব্র যন্ত্রণা। এই অবস্থায় অর্জুনের আর একটি তীর তাঁর বুকে লাগায় কর্ণ এতোটা জখম হলেন যে তাঁর হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে গেল, তিনি টলতে লাগলেন। এই অবস্থায় শত্রুকে আঘাত করা যোদ্ধার জন্য মোটেই গৌরবের কথা নয়। অর্জুন ফের তীর ছুঁড়তে ইতস্তত করছিলেন। তাই দেখে কৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন, 'এ কি অর্জুন? এই সুযোগ হারাচ্ছ কেন? এইবার কর্ণকে নিপাত কর।' অর্জুন কৃষ্ণের প্ররোচনায় আহত কর্ণের প্রতি নতুন করে আঘাত হানতে লাগলেন। একটু সুস্থ হয়ে কর্ণ অর্জুনের প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রথ একটু ঘোরাতে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর রথের চাকার খানিকটা মাটিতে গেঁথে গেল। একদিকে এই দুর্ভোগ, এর ওপর কর্ণ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রের কথা ভুলে গেছেন। কর্ণ বললেন, 'অর্জুন, একটু দাঁড়াও, রথের চাকাটা তুলে নিই।'

কিন্তু অর্জুন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে একটির পর একটি তীর ছুঁড়েই চলেছেন। কর্ণ ফের বললেন, 'অর্জুন' বিপদাপন্ন শত্রুকে আঘাত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্মবিরোধী। আমাকে রথের চাকাটা তুলতে দাও'। অর্জুন কোনো কথা শুনলেন না। আবার কৃষ্ণ বললেন, 'কর্ণ, তোমার সঙ্গে আবার ধর্ম কি? পাণ্ডবদের সঙ্গে তুমি কম খারাপ ব্যবহার করেছ?' সেই সময় কর্ণের একটি ভয়ংকর বাণে অর্জুনের বাহু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তাঁর হাত কাঁপল এবং হাত থেকে গাণ্ডীব অস্ত্র পড়ে গেল। কর্ণ এই অবসরে রথ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে দুই হাত দিয়ে রথের চাকা ঠেলে ওপরে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। না, চাকা এমনভাবে গেঁথে গেছে যে কিছুতেই ওঠানো যাচ্ছে না। কর্ণ মিনতি করলেন, 'অর্জুন, কাপুরুষের মত কাজ কর না, আমাকে রথের চাকাটা তুলতে দাও, তারপর দেখবে কার কত জোর।' কর্ণের আবেদন অগ্রাহ্য করে অর্জুন তাঁর দিকে অঞ্জনিক বাণ নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কর্ণের মাথা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

কর্ণের মৃত্যুতে কৌরবরা একেবারে ভেঙে পড়লে সেনাপতির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন মাদ্রীরাজ শল্য। যুদ্ধের প্রায় শুরুতেই যুধিষ্ঠিরের একটি প্রচণ্ড বাণে শল্য নিহত হলেন। দুর্যোধনের বিশাল হাতিটিও মারা পড়ল ধৃষ্টদ্যুম্নের আঘাতে। কৌরবদের মনোবল তখন প্রায় শেষ। দুর্যোধন পালিয়ে আশ্রয় নিলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে। কিন্তু পাণ্ডবরা সেখানে গিয়েও তাঁকে খোঁচাতে শুরু করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এলেন কুরুক্ষেত্রে, এবার গদা হাতে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন আর এক গদাধারী ভীমের সঙ্গে। গদায় গদায় এরকম যুদ্ধ দেখে সবাই হতবাক। দুর্যোধনের

একটি আঘাতে ভীম একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফের সংজ্ঞা পেয়েই তিনি নতুন করে আক্রমণ চালান। দুর্যোধন একবার খুব উঁচুতে লাফিয়ে উঠে ভীমকে আক্রমণের উদ্যোগ নিতেই যুদ্ধের নিয়ম অগ্রাহ্য করে ভীম তাঁর উরুতে দারুণভাবে আঘাত করলেন। উরু ভেঙে দুর্যোধন মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ভীম তাঁর মাথায় লাথি দিতে দিতে বিকৃত সুরে বললেন, 'এবার? বাছাধন এবার?' গদাযুদ্ধের নিয়ম ভেঙে দুর্যোধনের নাভির নিচে আঘাত করায় এবং আহত শত্রুর মাথায় লাথি মারায় অনেকেই তাঁকে ধিক্কার দিলেন।

যুদ্ধ তো একরকম শেষই বলা চলে। কিন্তু এর মধ্যেও অশ্বত্থামা অন্ধকার রাত্রে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করলেন। সবাই সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন। অশ্বত্থামা প্রথমেই হত্যা করলেন তাঁর পিতার হত্যাকারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে। তারপর দেখলেন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন পঞ্চ-পাণ্ডব। আসলে এঁরা কিন্তু যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই নন, এঁরা তাঁদের স্ত্রী দ্রৌপদীর গর্ভজাত পাঁচ পুত্র। পঞ্চ পাণ্ডব ভেবে এঁদের পাঁচজনকে হত্যা করে তিনি বেরিয়ে এলেন।

দুর্যোধনকে এই খবরটা দিতে এসে অশ্বত্থামা দেখেন যে তিনি মাটিতে শুয়ে কেবলি রক্তবমি করছেন। তিনি একেবারে মুমূর্ষু। অশ্বত্থামার মুখে পাণ্ডবদের ভুল মৃত্যুসংবাদ শুনে মৃত্যুর আগে তৃপ্তির সঙ্গে একটু হাসলেন।

কৌরবদের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু যুদ্ধে জিতেও পাণ্ডবরা সুখী হতে পারলেন না। যুদ্ধে তাঁদের পক্ষে বহু লোক নিহত হয়েছে, আত্মীয়স্বজন আজ অনেকেই নেই। তাঁদের প্রতিপক্ষ যাঁদের তাঁরা নিজেরাই হত্যা করেছেন তাঁরাও তো তাঁদেরই ভাই, তাঁদেরই স্নেহভাজন আত্মীয়স্বজন, তাঁদের গুরুজন। জীবিত মানুষশূন্য নিস্তব্ধ কুরুক্ষেত্র তাঁদের বড়ো বিষণ্ণ করে তুলল।

হেক্টর উপাখ্যান

বহুকাল আগে আমাদের দেশের অনেক পশ্চিমে এশিয়া মাইনরে স্ক্যামান্ডার নদীর তীরে একটি রাজ্য ছিল। একটি শহর নিয়েই একটি রাজ্য। চারদিকে খুব পুরু আর খুব উঁচু দেওয়ালে ঘেরা ট্রয় নামে এই ছোট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রায়াম, রানী হেকুবা। তাঁদের অনেক ছেলেমেয়ে, প্রায়ামকে কেউ কেউ ডাকত পঞ্চাশ সন্তানের পিতা বলে। তাঁর এতো সন্তানের মধ্যে কি সাহস কি বুদ্ধি—সবদিক থেকে নাম করা ছেলের নাম হেক্টর। রাজ্যের সবাই তাকে ভালোবাসত, কারো বিপদে আপদে তিনি এগিয়ে আসতেন সবচেয়ে আগে, যুদ্ধে যেতে তাঁর কোনো ভয় ছিল না, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে তিনি এতোটুকু পিছপা হতেন না।

তো তাঁর সময়ে, অর্থাৎ আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে ট্রয় নগরী ঘিরে রেখেছিল শত্রু সৈন্যের বিরাট বাহিনী। একদিন দুদিন নয়, এক মাস দু'মাস কিংবা দুই এক বছরের ব্যাপার নয়, নয় নয়টি বছর ধরে তাঁদের যুদ্ধ চলছিল গ্রীকদের সঙ্গে। গ্রীকরা তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত, একটি রাজ্যের নাম স্পার্টা। স্পার্টার রাজা মেনেলাসের অপূর্ব সুন্দরী রানী হেলেনকে চুরি করে নিজের দেশে পালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন প্রায়ামের এক ছেলে প্যারিস। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত মেনেলাস নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করতে এসেছেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। তিনি কেবল তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে আসেননি, তাঁর সঙ্গে নিজের নিজের সৈন্যসামন্ত ভর্তি জাহাজের বহর নিয়ে এসেছেন পিথিয়ার রাজপুত্র বীরশ্রেষ্ঠ একিলিস, ইথাকার রাজা অডিসিউস, পাইলসের বুড়ো রাজা নেনস্টর, আর্গসের রাজা ডায়োমিডিস, লকরিয়ানদের নেতা আয়াস, সালামিসের রাজা, এঁর নামও আয়াস এবং আরো অনেকে। এঁদের সকলের নেতৃত্ব দেন মেনেলাসের বড়ভাই মাইসিনের রাজা এ্যাগামেমনন। এই সম্মিলিত বাহিনীকে বলা হয় গ্রীক বাহিনী, আবার একিয়ান নামেও এঁদের অভিহিত করা হয়।

নয় নয়টি বছর ধরে ট্রয় নগরী অবরোধ করে রেখেছে এরা, এদের বিশাল বিশাল জাহাজের বহর সব নোঙর করা রয়েছে ট্রয়ের কাছেই সমুদ্রের তীরে। কখনো কখনো এরা থাকে নিজেদের জাহাজে, কখনো বা শিবির করে বাস করে ট্রয়ের বাইরে। প্রায়ই আক্রমণ করে ট্রয় নগরী দখল করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সেই পুরু দেওয়াল ভেদ করে, উঁচু দেওয়াল ডিঙিয়ে নগরীর ভেতরে আর ঢুকতে পারে না। আজ নয় বছর ধরে রাজপুত্র হেক্টরের নেতৃত্বে ট্রয়ের সৈন্যরা এদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

নিজের নিজের দেশ ছেড়ে বছরের পর বছর সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় থাকতে থাকতে গ্রীকরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাদের রাগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই হতচ্ছাড়া ট্রয়বাসীরা আত্মসমর্পণ করবে না, আবার যুদ্ধ করে গ্রীকদের এত বিশাল সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করার মত শক্তিও তাদের নেই। এরা যদি হেলেনকে মেনেলাসের হাতে ফিরিয়ে দেয় তাহলেও কিন্তু গ্রীক বাহিনী জাহাজের বহর নিয়ে সমুদ্রে পাল তুলে রওয়ানা হতে পারে যার যার দেশের দিকে। কিন্তু প্যারিস এ ব্যাপারে বড্ডো একগুঁয়ে, হেলেনকে তিনি খুব ভালোবাসেন, তাকে ছেড়ে থাকার কথা তিনি ভাবতেই পারে না। আবার দেখতে অপূর্ব সুন্দর যুবরাজ প্যারিস কিন্তু যুদ্ধে নামতে সাহস পান না। তাঁর এই কাপুরুষের মতো স্বভাব নিয়ে হেক্টর তাঁকে কত গালমন্দ করেন, এতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে প্যারিস যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেও আসেন। একবার তো দুই পক্ষে কথাই হল যে প্যারিস আর মেনেলাস দুজন দ্বৈত লড়াই করবেন, মেনেলাস যদি জেতেন তো হেলেনকে নিয়ে দেশে ফিরবেন, আর তাঁর হার হলে হেলেন প্যারিসের সঙ্গে ট্রয়ে থেকে যাবেন, এবং গ্রীক বাহিনী ট্রয় ছেড়ে চলে যাবেন চিরকালের জন্যে।

কিন্তু সকলের সামনে দুজনের দ্বৈতযুদ্ধ শুরু হলে ভয়কাতুরে প্যারিস একেবারে ঘাবড়ে গেলেন, আর তাই দেখে তাঁর ভক্তিভাজন দেবী আফ্রোদিতি এগিয়ে এলেন ভক্তের উদ্ধারে। নিজেকে অদৃশ্য রেখে তিনি তাঁর পরম প্রিয় প্যারিসকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আলগোছে তুলে নিয়ে তাঁকে দিয়ে এলেন হেলেনের ঘরে।

শুধু প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি নন, দেবদেবীদের সবাই এই যুদ্ধে কোনো না কোনো পক্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ যুদ্ধ করেছিলেন গ্রীকদের পক্ষে, কেউ কেউ নেমে পড়েছিলেন ট্রজানদের হয়ে। সত্যি বলতে কি, দেব-দেবীদের মধ্যে রেষারেষি ছিল আগে থেকেই, তাঁদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ লেগেই ছিল। এই যুদ্ধের সুযোগে নিজেদের পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্যে তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁরা কেউ চাইছিলেন না যে এই যুদ্ধ শেষ হোক। এ জন্যে খেসারত দিতে হচ্ছিল গ্রীস আর ট্রয়ের মরণশীল মানুষদের।

ওদিকে বিদ্যার দেবী এথিনি সমর্থন দিচ্ছিলেন গ্রীকদের। কিন্তু মেনেলাস ও প্যারিসের দ্বৈত যুদ্ধের চুক্তি মেনে নিয়ে ওরা পাছে যুদ্ধ বন্ধ করে—এই ভাবনায় অস্থির হয়ে এথিনি ট্রজানদের প্যান্ডারাসের কানে কানে বললেন, 'বসে আছ কেন?

এইতো সময়, সবাই কেমন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে, মেনেলাসের দিকে একটা তীর ছোঁড় তো। বোকাসোকা প্যান্ডারাস ছদ্মবেশী দেবীকে চিনতে পারল না। ভাবল, তাই তো মেনেলাস যদি তার তীরেই মারা যায় তো ট্রজানদের কাছে চিরকালের জন্যে সে শ্রেষ্ঠ বীর বলে সম্মানের আসন লাভ করবে। বুনো ছাগলের মস্ত শিঙে তৈরি ধনুকে আনকোরা নতুন চকচকে একটা তীর লাগিয়ে প্যান্ডারাস ছুঁড়ে মারল মেনেলাসের দিকে। তীর চলল ছুটে, কিন্তু এথিনি আরো দ্রুতবেগে তীরের আগেই পৌঁছে গেছে মেনেলাসের কাছে। ঘুমন্ত শিশুর পাশে বসে মা যেমন মশা তাড়ায়, এথিনি তেমনি করে প্যান্ডারাসের তীর একটু কায়দা করে ঘুরিয়ে দিলেন অন্যদিকে। ফলে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগল মেনেলাসের কোমরবন্ধে, পুরু কোমরবন্ধ ভেদ করে তা মেনেলাসের মাংসপেশীর ভেতর ঢুকতে পারল না, কেবল চামড়া কেটে গিয়ে একটুখানি রক্ত বেরল।

মেনেলাসের রক্তপাত দেখে এ্যাগামেমনন ভয়ে শিউরে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ট্রজানরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই বেঈমানদের কুচি কুচি করে কেটে ফেল। একটা ট্রজানও আজ যেন বেঁচে থাকতে না পারে।' বলতে বলতে এ্যাগামেমনন একজন ট্রজান সৈন্যকে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকে পা রেখে বর্শা দিয়ে তার গলা বিদ্ধ করলেন। গ্রীকদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। পাইলসের রাজা নেস্টর চিৎকার করে গ্রীকদের আদেশ দিলেন, 'বন্ধুরা, সহযোদ্ধারা, এরিস দেবতার ভক্তবৃন্দ, তোমরা এদের মেরে ফেল, ট্রজানদের একটি মানুষও আজ জীবিত থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা নাও।'

গ্রীকরা সারিবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত সু-শৃঙ্খলভাবে চরম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একসঙ্গে আসে, তারা এগুতো লাগল ঠিক সেইভাবে। ওদিকে তাই দেখে ট্রজানদের মধ্যে বিপুল কোলাহল শুরু হল। দেখতে দেখতে গ্রীকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রজানদের ওপর।

প্যান্ডারাস একটা তীর ছুঁড়ে দিয়েছিল গ্রীকদের ডায়োমিডিসের দিকে, তীরটা তাঁর বুকে লাগলেও পুরু বর্ম ভেদ করে শরীরে বিঁধতে পারল না। ডায়োমিডিস বরং ঘুরে দাঁড়িয়ে প্যান্ডারাসের মাথা লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন, এক ঘায়েই প্যান্ডারাসের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গ্রীকরা নতুন উদ্দীপনায় একটি পর একটি ট্রজান সৈন্য হত্যা করে চলল। ট্রজানদের বীরযোদ্ধা ঈনিস ছিলেন তাঁদের পক্ষের দ্বিতীয় নেতা, হেক্টরের পরেই তাঁর স্থান। তিনি খুব তুমুল বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারছিলেন না। ট্রজান সৈন্যদের লাশে যুদ্ধক্ষেত্র ভরে উঠছিল। অনেকেই প্রাণের ভয়ে পালাতে শুরু করেছিল শহরের দিকে। ট্রজানদের এই দশা দেখে হেক্টরের এক ভাই হেলেনাস এগিয়ে এলেন হেক্টরের দিকে। হেক্টর তখন গ্রীক বাহিনীর একটি অংশকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। হেলেনাস বললেন, 'হেক্টর, আমাদের অবস্থা বেশ খারাপ। তোমার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তুমি ট্রজান সৈন্যদের কাছে

যাও, তাদের সাহস যাতে বাড়ে সেইভাবে কথা বল।' হেক্টরের এই ভাইটি যুদ্ধে তেমন পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও বিখ্যাত ছিলেন তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য। হেক্টর তাই মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনলেন। হেলেনাস আরো বললেন, 'শোন হেক্টর, তুমি একবার শহরের ভেতরে যাও। মনে হচ্ছে এথিনি দেবী আমাদের ওপর খুব অসন্তুষ্ট, শহরের ভেতরে গিয়ে তুমি মাকে বল কয়েকজন মহিলা নিয়ে তিনি যেন এথিনির মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দিয়ে আসেন।'

ট্রজান সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হেক্টর চিৎকার করে বললেন, 'ট্রজানরা, আমার বন্ধুরা, পুরুষ মানুষের মত যুদ্ধ কর, ভয় পাবে না, আমরা ঠিকমত এগুতে পারলে গ্রীকদের সমুদ্রের ওপারে পাঠিয়ে দিতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হবে না।' তাঁর কথায় সৈন্যদের মধ্যে একটু সাহস দেখা দিলে তিনি বললেন, 'আমি শহরের ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসছি। গুরুজনদের পরামর্শ নেব, তাঁদের আশীর্বাদও দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আসছি।'

ট্রয় নগরীর স্কেয়ান গেটের কাছে ওক গাছের নিচে হেক্টর পৌছতেই ট্রয়ের মেয়েরা তার দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। তাদের কারো স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে, কারো ছেলে, কারো ভাই—সবাই যুদ্ধে রত। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মীয় সম্বন্ধে খোঁজ খবর জানার জন্য উৎকণ্ঠিত। সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করতে শুরু করলে হেক্টর বললেন, 'সবাই মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা কর।'

হেক্টরকে দেখে তার মা হেকুবা আঁচ করতে পারলেন যে, সামনে দিন খুব খারাপ। ছেলের জন্যে তিনি সুস্বাদু খাবার নিয়ে এলেন, মিষ্টি পানীয় দিলেন, তাঁকে বার বার পেট ভরে খেতে বললেন। হেক্টরের কি তখন খাওয়ার সময় আছে? তিনি মাকে বললেন, 'মা, এখন এসব খাওয়ার সময় আমার নেই, যুদ্ধের অবস্থা বেশ ভয়াবহ। আপনি বরং এথিনির মন্দিরে গিয়ে দেবীর উদ্দেশ্যে দামী কাপড়চোপড় মানত করে আসুন। মা, আপনি আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন।'

প্যারিসের ঘরে যাবার পথেই তাঁকে দেখে তিনি বেশ রাগ করলেন, 'প্যারিস, তুমি ট্রয়ের কলঙ্ক, তোমার জন্যেই আজ আমাদের দেশবাসী এত কষ্ট পাচ্ছে, আর তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মত পালিয়ে এখানে বসে রয়েছ।' প্যারিস বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, হেক্টর। আমার এখন খুব খারাপ লাগছে। চল, আমি এক্ষুনি যুদ্ধে যাচ্ছি।'

হেক্টর তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে শোনেন যে তাঁর স্ত্রী এ্যানড্রোম্যাকে শিশুপুত্র এ্যাসটিয়ানাক্সকে নিয়ে দেওয়ালের দিকে গেছেন। খবর রটে গেছে যে গ্রীকরা স্কেয়ান গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে, শহরের মেয়েরা তাই ভয় পেয়ে দেওয়ালের ওপর তাদের দেখতে গেছে।

স্কেয়ান গেটের দিকে যাবার চওড়া রাস্তা ধরে হেঁটে হেক্টর গেটের কাছাকাছি পৌছতেই এ্যানড্রোম্যাকে তাঁকে দেখতে পেলেন, তিনি প্রায় দৌড়ে স্বামীর কাছে ছুটে এলেন। এ্যানড্রোম্যাকের পেছনে একজন দাইয়ের কোলে শিশু এ্যাসটিয়ানাক্স। ছেলের দিকে তাকিয়ে হেক্টর একটু হাসলেন। কিন্তু

এ্যানড্রোম্যাকের চোখে পানি। হেক্টরের হাত ধরে তিনি বললেন, 'তুমি এক আশ্চর্য মানুষ। তোমার বাড়াবাড়ি রকম সাহসই তোমার সর্বনাশ করবে। তোমাকে কি যুদ্ধে যেতেই হবে? কেন? তোমার না হয় নিজের জন্যে দয়ামায়া কিছু নেই, কিন্তু আমার কথা কি একবারও ভাববে না?' বলতে বলতে এ্যানড্রোম্যাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, কান্নায় তাঁর গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, 'আমার বাবা নেই, মা নেই। আমার বাবাকে একিলিস মেরে ফেরেছে, আমার সাত সাতটি ভাইকে সে মেরেছে এক দিনে, স্রেফ একদিনে। হেক্টর তুমিই আমার সব। তুমি যুদ্ধে নিহত হলে আমার কি হবে, বল? আমার ছেলের কি হবে?'

কিন্তু যুদ্ধে না গিয়ে হেক্টরের উপায় কি? স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিতে তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু ট্রয়ের প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা তিনি ভোলেন কি করে? তিনি বললেন, 'এ্যানড্রোম্যাকে, আমার মনে হচ্ছে, যুদ্ধে আমাদের হার হতে পারে। শত্রুপক্ষ হয়তো বন্দি করে তোমাকে কোথায় অনেক দূরে আর্গসে নিয়ে দাসী হিসাবে খাটিয়ে নেবে, কারো জন্যে হয়তো তোমাকে কুয়ো থেকে পানি আনতে হবে, আর কারো জন্যে তোমাকে তাঁত বুনতে হবে। তোমার কষ্টের কথা ভাবতেই আমি একেবারে ভেঙে পড়ি, এ্যানড্রোম্যাকে। কিন্তু ট্রয়ের মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ করছে, যুদ্ধে আমাকে শেষ পর্যন্ত লড়তেই হবে।'

বলতে বলতে হেক্টর তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু বাবার সেই বিখ্যাত ব্রোঞ্জের হেলমেট আর তার ওপর ঝোলানো ঘোড়ার লেজ দেখে এ্যাসটিয়ানাক্স ভয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল। তা দেখে হেক্টর আর এ্যানড্রোম্যাকে দুজনেই হেসে ফেললেন। হেক্টর হেলমেট খুলে মাটিতে রাখলে শিশু নির্ভয়ে বাবার কোলে উঠল। তার গালে চুমু খেয়ে হেক্টর দেবতা জিউসের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে জিউস, এই ছেলে যেন আমার মতই সাহস পায়, আমার মতই নির্ভয় হয়। এই যেন একদিন ট্রয়ে রাজত্ব করতে পারে। লোকে যেন একদিন বলে যে বাপের চেয়েও এ বড় বীর। এই শুনে ওর মায়ের বুক যেন সুখে ভরে ওঠে।'

ছেলেকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে হেক্টর বিদায় নিলেন। পথে তাঁর সঙ্গ নিলেন প্যারিস। দেউড়ির বাইরে এসে শুনলেন যে তাঁদের মিত্রপক্ষ বেশ কয়েকজন গ্রীক সৈন্য হত্যা করেছে। এতে গ্রীক পক্ষের মুরুব্বি এথিনি দেবী বেশ বিরক্ত। কবিতা ও সঙ্গীতের দেবতা এ্যাপলো সমর্থন করছিলেন ট্রজানদের। যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা দেখে দুজনেই ছদ্মবেশ ধরে বসে রইলেন দেওয়ালের বাইরে ওক গাছের ডালে।

হেক্টরের চোখে মুখে প্রচণ্ড শক্তি ও বল দেখে গ্রীকরা বেশ সতর্ক হয়ে উঠল। সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতি। পরদিন সারাদিন ধরে গ্রীকরা নিয়োজিত রইল একটি দেওয়াল নির্মাণের কাজে। মাটি ও গাছের গুড়ি দিয়ে নিজেদের জাহাজের প্রথম সারির তীরে ডাঙায় তারা মস্ত একটি দেওয়াল তুলল। দেওয়াল তুলতে যে মাটি খুঁড়তে হল

তাতে তৈরি হয়ে গেল গভীর একটি পরিখা। দেওয়ালের এদিক ওদিক মাঝে মাঝে জানালা রইল, এক কোণে রইল একটি ফটক।

তার পরদিন ভোর না হতেই যুদ্ধের শুরু। গ্রীকদের দিকে হেক্টর এমনভাবে তাঁর সেনাবাহিনী পরিচালিত করতে লাগলেন যে তাঁদের একেবারে নাভিশ্বাস উঠে গেল। সন্ধ্যার আগেই গ্রীকরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল নিজ নিজ জাহাজের দিকে।

হেক্টর দেখলেন গ্রীকদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। তিনি তাঁর সেনাবাহিনী চালিয়ে দিলেন গ্রীক জাহাজ বহরগুলির দিকে। কিন্তু হেক্টরের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল গ্রীকদের তৈরি দেওয়ালের এ পাশে পরিখাটি। পরিখার সামনে এসে ঘোড়ারা থমকে দাঁড়ায়, সামনে দুই পা তুলে চিৎকার করে, ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পরিখা ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাঁর প্রিয় চারটে ঘোড়াকে লক্ষ্য করে হেক্টর মিনতি করলেন, 'জানথাস, পোডারগাস, এথন, ল্যাম্পাস, বাবারা, এ্যানড্রোম্যাকে তোমাদের অনেক দানাপানি দিয়ে বড় করেছে, আমাকে খেতে দেওয়ার আগেই তোমাদের জন্যে খাবার তৈরি করেছে। সেই সব কথা মনে আছে তো? এবার এই পরিখাটুকু আমাদের পার করে দাও, গ্রীকদের তাহলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারি।'

কিন্তু ট্রয়বাহিনীর অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে এই চারটিও ভয়বিহ্বল হ্রেষাধ্বনি করতে করতে কেবলি পিছু হটতে থাকে। চওড়া পরিখা, আবার পরিখার ওপরে দেওয়ালের সঙ্গে সূচলো করে কাটা কাঠের দণ্ডের সারি। না, ঘোড়া নিয়ে এই একটির পর একটি বাধা পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। প্যানথসের পুত্র পলিডেমাস এগিয়ে এলেন, ধীরস্থির এই ট্রজান বীরযোদ্ধা সাধারণ ঘরের মানুষ, কিন্তু এঁর বুদ্ধি বিবেচনায় সবার খুব আস্থা। তিনি সবাইকে ঘোড়া ছেড়ে হেঁটে পরিখায় নামতে পরামর্শ দিলেন, তারপর ওপারে উঠে দেওয়াল ডিঙিয়ে গ্রীকদের জাহাজ আক্রমণ করতে হবে। এই পরামর্শ মেনে নিয়ে হেক্টর ট্রজান বাহিনীকে পাঁচটি দলে ভাগ করে সবাইকে আক্রমণ চালাবার আদেশ দিলেন।

এবার ট্রজানদের দেওয়াল পেরোবার পালা। ওদিকে দেওয়ালের ওপর চওড়া জায়গা থেকে গ্রীকরা বড় বড় পাথরের টুকরা ছুঁড়ে ফেলছে, তাতে ধাক্কা লেগে মারা পড়ল বেশ কয়েকজন ট্রয়সৈন্য। কিন্তু [গ্রীকদের] সাহস ও শক্তি দেখে ট্রজানদের মনোবল একটুও ভেঙে পড়ছে না। হেক্টরের ঠিক সামনে এসে পড়ল একটি মস্ত পাথর, তিনি একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুই হাতে তিনি ঐ পাথর তুলে জোরে ছুঁড়ে মারলেন দেওয়ালের ফটকে। পাথরের ধাক্কায় ঐ বিশাল ফটকের ভেতরকার দণ্ড ভেঙে পড়ল, দরজা খুলে একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। ঐ ফাঁকের ভেতর দিয়ে হুড়মুড় করে পানির স্রোতের মত ঢুকতে শুরু করল ট্রয়ের সৈন্যবাহিনী। দেওয়ালের ওপারে পৌছলেই জাহাজের সারি।

হেক্টর তখন যুদ্ধের উন্মাদনায় রীতিমত কাঁপছেন। সর্বাঙ্গে তিনি যেন জ্বলছেন আগুনের মত। একটির পর একটি জাহাজ তিনি পার হচ্ছেন লাফিয়ে লাফিয়ে। দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি চিৎকার করছেন, 'আগুন লাগাও, আগুন লাগাও।

গ্রীকদের সবগুলো জাহাজ পুড়িয়ে ছাই করে দাও। আমাদের শহরে ঢোকার সাধ ব্যাটাদের চিরকালের মত শেষ করে দেব আজকেই।'

ট্রজানদের এই অপ্রত্যাশিত দেওয়াল পেরোবার ঘটনায় গ্রীক বাহিনী হতচকিত, তাদের যুদ্ধোম্মাদ চেহারা দেখে তারা ভয়বিহ্বল। তাদের নেতা এ্যাগামেমনন গ্রীকদের ভয় দেখে বিরক্ত হলেন। তিনি এসে দাঁড়ালেন অডিসিউসের কালো জাহাজের সামনে, এখানে দাঁড়ালে একেবারে পূর্বে আয়াসের জাহাজের বহর থেকে পশ্চিম প্রান্তে একিলিসের জাহাজ পর্যন্ত সবাইকে দেখা যায়। তিনি চিৎকার করে নিজ দলের সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা পালাচ্ছ কেন? এই যে কাপুরুষের দল, তোমাদের ধিক্কার দিই। রুখে দাঁড়াও, সবাই রুখে দাঁড়াও। আমাদের সামনে ট্রজান বাহিনী, পেছনে সমুদ্র। তোমরা পালিয়ে যাবে কোথায়? রুখে দাঁড়াও, ট্রয়ের প্রতিটি সৈন্যকে আজ নিশ্চিহ্ন করা চাই।'

এদিকে ট্রজানরা বিপুল উদ্দীপনায় একটির পর একটি গ্রীক জাহাজে আগুন লাগিয়ে চলেছে। এ্যাগামেমননের ধিক্কার শুনে গ্রীকরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ট্রজানদের সঙ্গে তারা পেরে উঠছে না।

এসব দেখে গ্রীক পক্ষের সবচেয়ে বড় বীর, শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা একিলিসের বন্ধু পেট্রোক্লাসের চোখে পানি এসে গেল। সবচেয়ে শক্তিশালী আর সবচেয়ে দ্রুতগামী যোদ্ধা মারমাডিনদের নেতা পেলুসের পুত্র একিলিস অনেক দিন থেকে যুদ্ধ করছেন না। গ্রীক নেতা এ্যাগামেমননের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত রয়েছেন। তাঁর সম্মানে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু পেট্রোক্লাসও যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটান। কিন্তু আজ গ্রীক বাহিনীর এই বিপর্যয় দেখে পেট্রোক্লাস খুবই দুঃখিত হলেন, কাঁদতে কাঁদতে একিলিসের কাছে এসে বললেন, 'একিলিস, তুমি কি পাথরে তৈরি, তোমার কি পাষাণ হৃদয়? এত কিছুর পরও কি আমরা হাত পা গুটিয়ে বসেই থাকব? গ্রীকরা কি আমাদের চোখের সামনে এই ভাবে প্রাণ হারাবে?'

একিলিসের রাগ বড় প্রচণ্ড, এ্যাগামেমননের সঙ্গে ঝগড়ার কথা তিনি একটুও ভোলেন না। পেট্রোক্লাসের প্রতি তাঁর যতই ভালোবাস থাক, প্রধান নেতা এ্যাগামেমননকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। না, এরা রসাতলে যাক, একিলিস যুদ্ধে এদের সাহায্য করবেন না। তবে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু পেট্রোক্লাসের মিনতি শুনে এবং তাঁর চোখের পানি দেখে তিনি একটু নরম হলেন। বললেন, 'আমি এই এ্যাগামেমননের নেতৃত্বে যুদ্ধে যাব না। তবে তোমার যখন এত খারাপ লাগছে, তুমি যাও। আমার মারমিডন বাহিনীকে নিয়ে যাও।' নিজের সেনাবাহিনীকে তিনি পেট্রোক্লাসের হাতে তুলে দিলেন। আর দিলেন তাঁর সমস্ত অস্ত্র, কেবল একটি বর্শা নিজের কাছে রেখে তাঁর সব অস্ত্রই তিনি পেট্রোক্লাসকে দিয়ে দিলেন।

ঐ মারমিডন সেনাবাহিনীকে নিয়ে পেট্রোক্লাস যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখন তাঁর হৃদয়ে কেবল হত্যা করার অদম্য স্পৃহা। প্রচণ্ড গতিতে তাঁর রথ ছুটে আসছে দেখে ট্রজানরা সব জাহাজের কাছাকাছি জায়গা ছেড়ে পালাতে লাগলেন।

পরিখা পেরিয়ে তাঁরা শহরের দিকে ছুটল। তাদের তাড়া করে রথ চালিয়ে দিলেন পেট্রোক্লাস। মারমিডনদের প্রথম ধাক্কায় হেক্টরও পরিখা পার হয়ে চলে এসেছেন এ পারে, রথে উঠে তিনি ছুটে চলেছেন দেওয়ালের স্কেয়ান গেটের কাছাকাছি। তিনি ভাবছেন এখন কি করা যায়? সরাসরি পেট্রোক্লাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নামবেন? না, ট্রজানদের সবাইকে সংগঠিত করে একসঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন? কিন্তু তার সময় কৈ? পেট্রোক্লাস তাঁর পেছনে ছুটে আসছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর নাগালের মধ্যে পড়বেন। মুহূর্তের ভেতর হেক্টর তাঁর রথের মুখ ঘুরিয়ে রথের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন পেট্রোক্লাসের দিকে। তাঁর মুখোমুখি হতেই পেট্রোক্লাস রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন, এবড়োখেবড়ো খাঁজকাটা একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন হেক্টরের রথ লক্ষ করে। বিশাল সেই পাথর এসে লাগল হেক্টরের রথের চাকায়, রথটা একদিকে গড়িয়ে পড়তে না পড়তেই হেক্টর সোজা খাড়া হয়ে পড়লেন মাটিতে। তিনি কিন্তু মাটিতে গড়িয়ে পড়েন নি, বরং এমন খাড়া হয়ে পড়েছেন যে তাই দেখে পেট্রোক্লাস বিদ্রূপের সঙ্গে হেসে বললেন, 'বাঃ। ডাঙার ওপরেই তুমি তো চমৎকার ডাইভ দিতে পার। সমুদ্রে এই ডাইভটা দিলে না জানি কত চিংড়ি মাছই না ধরতে।' বলতে বলতে তিনি লাফিয়ে পড়লেন হেক্টরের রথের চালক সেব্রিওনসের শবদেহের ওপর। তাঁর পাথরের আঘাতে সেব্রিওনসও ঘায়েল হয়েছেন, তাঁর চোখ ছিটকে পড়েছে ধুলায়, তাঁর লাশ মাটিতে গড়াগড়ি খায়। মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দুজনেই, হেক্টর আর পেট্রোক্লাস লাশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য অস্থির। শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ দলের সৈন্যরা এসেও এই শবদেহ নিয়ে তুমুল সংঘর্ষে নামল। সন্ধ্যার দিকে গ্রীকদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটল, সেব্রিওনসের মৃতদেহ থেকে সমস্ত অস্ত্র ও পোষাক খুলে নিতে পারল তারাই। পেট্রোক্লাস এক এক বার চিৎকার করে উঠছিলেন, আর তিন তিনজন করে ট্রজান সৈন্য খতম করে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। এর মধ্যে এ্যাপোলো দেবতা এসে হেক্টরের কথা ভেবে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে হেক্টরের সাহস আরো বেড়ে গেলে তিনি হঠাৎ করে পেট্রোক্লাসকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলেন। পেট্রোক্লাস নিজের শরীরের পতন ঠেকাতে ভার দিয়েছিলেন তাঁর বর্শার ওপর, দীর্ঘ বর্শাটি ভেঙে ছিটকে পড়ল। তাঁর হাতে এখন কোনো অস্ত্র নেই, মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়তেই তরুণ একজন ট্রজান সৈন্য এসে তাঁর পিঠ লক্ষ করে বর্শা ছুঁড়ে মারলেন। হেক্টর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর বর্শা গেঁথে দিলেন পেট্রোক্লাসের কণ্ঠনালী ভেদ করে। গোঙাতে গোঙাতে পেট্রোক্লাস অভিশাপ দিতে লাগলেন, 'হেক্টর, তোমার ওপর এ্যাপলোর আশীর্বাদ আছে বলে তুমি আমাকে এভাবে মারতে পারলে। দেখ না তোমার কি হয়, একিলিস তোমাকে একেবারে টুকরা টুকরা করে ফেলবে দেখ।'

পেট্রোক্লাস মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে অস্ত্র ও অলঙ্কার ও পোষাক খুলে নেওয়ার জন্য গ্রীক আর ট্রজানদের মধ্যে সারাদিন ধরে লড়াই চলল।

ওদিকে পেট্রোক্লাসের মারা যাওয়ার খবর শুনে একিলিসের মুখে শোকের ঘন মেঘ নেমে এল। তাঁর মাথা ঘুরে গেলে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন এবং তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বন্ধুর জন্যে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না শুনে সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে এলেন তাঁর মা থেটিস। একিলিসের বাবা পেলুস একজন মানুষ হলেও তাঁর মা ছিলেন দেবী। মাকে দেখে একিলিসের শোক আরো উথলে উঠল, 'মা, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জন পেট্রোক্লাস নিহত হয়েছে। আমি আজকেই যুদ্ধে নামব, আমার বন্ধুর খুনীকে শেষ না করা পর্যন্ত আমার আর বিশ্রাম নেই।'

থেটিসের কিন্তু ইচ্ছা নেই যে তাঁর ছেলে যুদ্ধে যাক। যুদ্ধে তাঁর ছেলে একিলিসের খুব নামডাক হবে, পৃথিবীর মানুষ বীরত্বের জন্যে যুগ যুগ ধরে একিলিসকে মনে রাখবে, হয়তো চিরকালের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু দেবতারা আগেই ঠিক করে রেখেছেন যে যুদ্ধে গেলে তাঁর আয়ু কমে আসবে। একিলিস তাহলে বেশিদিন বাঁচবেন না। থেটিস তাঁকে বোঝান, 'বাবা, যুদ্ধে গেলেই তোমার আয়ু কমে যাবে, নাম দিয়ে কি করবে যদি বাঁচতেই না পারলে?'

'না মা, আমার বন্ধু পেট্রোক্লাস এই দূর দেশে, নিজের দেশ থেকে, নিজের মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন থেকে কত শত মাইল দূরে বিদেশ বিভুঁইয়ে মারা গেল, মরার আগে আমার সাহায্য পাওয়ার জন্যে সে না জানি কতবার এদিক ওদিক তাকিয়েছে, কি কষ্ট পেয়ে, কত ছটফট করতে করতে তার মৃত্যু হয়েছে, আহা। মা, এই হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই।'

থেটিস যখন দেখলেন যে একিলিসকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা অসম্ভব, তিনি তখন ধর্ণা দিলেন অস্ত্র তৈরিতে ওস্তাদ দেবতা হেফাস্টাসের কাছে। বাঁকা পা ওয়ালা দেবতা হেফাস্টাস একিলিসের জন্যে খুব শক্ত ও মজবুত দেখে কয়েকটি অস্ত্র গড়িয়ে দিলেন।

জানথাস ও ব্যালিয়াস নামে সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া দুটিকে রথে জুড়ে একিলিস তীক্ষ্ণ চিৎকার করে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লেন। ছুটতে ছুটতেই কয়েকজন ট্রজান তাঁর হাতে মারা পড়ল। এই ধাক্কায় নিহতদের মধ্যে একজন হলেন হেক্টরের ছোট ভাই পলিডোরাস। ছোট ভাইয়ের এই দশা দেখে হেক্টরের চোখ ছল ছল করে উঠল। মনে মনে তৈরি হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন একিলিসের দিকে। তাঁকে দেখে একিলিস একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, 'এই যে, পাওয়া গেছে। এই যে আমার বন্ধুর খুনী। এস এস তাড়াতাড়ি এস। তোমার ভাগ্যে কি আছে একবার দেখ।'

হেক্টর কিন্তু নির্ভয়। তাঁর শিরস্ত্রাণ বরাবর যেমন বিদ্যুতের মত ঝলকায় এখনো তেমনি ঝলকাচ্ছে। স্থির গলায় তিনি জবাব দিলেন, 'তুমি খুব বড় যোদ্ধা একিলিস, এতে কারো কোনো সন্দেহ নেই। এর ওপর তোমার মা একজন দেবী। সবই জানি। কিন্তু আমার বর্শার ধারও নেহায়েত কম নয়। একবার পরীক্ষা করে

দেখাই যাক।' বলতে বলতে হঠাৎ করে তিনি বর্শা ছুঁড়ে মারলেন একিলিসের দিকে। হেক্টরের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। বর্শাটা একিলিসকে ঠিকই বিঁধত, কিন্তু তাঁর মা দেবী থেটিস নিজে অদৃশ্য থেকে বর্শাটা আস্তে করে একটু অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রোঞ্জের বর্শা দিয়ে একিলিস তিন বার আঘাত করলেন হেক্টরকে, হেক্টর তিনবারই কৌশলে একিলিসের বর্শা ফিরিয়ে দিলেন।

একিলিস একটু কায়দা করে সরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ট্রজানদের মধ্যে। এইবার শুরু হল তাঁর হত্যাযজ্ঞ। সামনে যাকে পান তাকেই মেরে চলেছেন তিনি। অনেক সময় গভীর অরণ্যে হঠাৎ করে আগুন জ্বলে ওঠে, বাতাসে সেই আগুনের লেলিহান জিহ্বা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, ঠিক সেইভাবে একিলিস বর্শা হাতে ছুটতে লাগলেন চারদিকে, ট্রজানদের মেরে মেরে তিনি কালো মাটিকে লাল টকটকে করে তুললেন।

ট্রয়ের সৈন্যদের যারা সুযোগ পেল তারা পড়িমরি করে ছুটল নগরীর দিকে, ভেতরের ঢুকে পড়ায় তারা প্রাণে বাঁচল। একিলিসের তাড়া খেয়ে যারা স্ক্যামানডার নদীর দিকে এসেছিল তারা আর উপায় না দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্ক্যামানডার নদীতে। একিলিস কিন্তু তাদেরও ছাড়লেন না, বর্শা ডাঙায় রেখে তিনিও লাফ দিলেন স্ক্যামানডার নদীতে, পানিতে সাঁতরাতে থাকা ট্রজানদের কাটতে লাগলেন তাঁর তলোয়ার দিয়ে। নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে উঠল। তখন মনে হচ্ছিল যেন ঘন লাল রক্ত বুকে নিয়ে স্ক্যামান্ডার নদী যেন ক্রমাগত ফুলে ফুলে উঠছে।

হঠাৎ করে হেক্টরের কথা মনে পড়ায় একিলিস তাঁর খোঁজে ডাঙায় উঠে পড়লেন। তখন তাঁর ক্রোধে আরক্ত মুখ থেকে আগুন ঠিকরাচ্ছে। তাই দেখে ট্রয়ের দেওয়ালে বসে থাকা রাজা প্রায়াম চিৎকার করে ডাকলেন হেক্টরকে, 'হেক্টর, হেক্টর, ভেতরে এস, দেওয়ালের ভেতর চলে এস। ইচ্ছা করে মরতে যাচ্ছ কেন?' হেক্টর তাঁর কথায় সাড়া না দিলে তিনি ফের বললেন, 'ওখানে থাকলে তোমার মৃত্যু অবধারিত। বুঝতে পারছ না, একিলিসের সঙ্গে জেতা তোমার পক্ষে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। আমার কথাটা একবার ভাব হেক্টর। তুমি না থাকলে এই বুড়ো মানুষটার দশা কি হবে, বল তো? তুমি না থাকলে একিলিস আমার সব কটা ছেলেকে একে একে শেষ করবে, আর আমাকে মেরে আমার লাশ টুকরা টুকরা করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। হেক্টর, ভেতরে এস, ভেতরে এস বাবা।'

ডুকরে কেঁদে উঠলেন হেক্টরের মা হেকুবা, 'বাবা হেক্টর, আমাকে একটু দয়া কর বাবা। দেওয়ালের ভেতর থেকেই দুশমনকে শায়েস্তা কর। বাইরে থেক না। ঐ একিলিসটা কি মানুষ? ঐ অসভ্য শয়তানের সঙ্গে তুমি পারবে না, চলে এস, ভেতরে এস।'

বাবা, মা কি দেওয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা কারো দিকে তাকাতে পারছিলেন না [হেক্টর]। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলেন। অনেক সময় বিষাক্ত লতা খেয়ে পাহাড়ী সাপ নির্জীব হয়ে শুয়ে থাকে, শিকারী মানুষ দেখলেও এক পা নড়তে

পারে না। হেক্টর তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন যে একিলিস তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। একিলিসের ডান কাঁধে ছাই রঙের বর্শা, শরীর দেবনির্মিত বর্মে আবৃত। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনিই যেন যুদ্ধের দেবতা। হেক্টর ভাবলেন যে একিলিস আজ আমাকে শেষ করে ফেলবে। হঠাৎ করে তিনি মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছে ছুটতে লাগলেন একিলিস। পাহাড়ী বাজপাখির মত হালকা শরীরে একিলিস দৌড়াচ্ছেন। মনে হয় পাহাড়ী বাজপাখি যেন তাড়া করে চলেছে একটি ঘুঘু পাখিকে। হেক্টর জানেন যে তাকে নাগালের মধ্যে পেলে একিলিস তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবেন, তাঁর দয়ামায়া বলে কিছু নেই, তিনি অত্যন্ত রাগী মানুষ, ক্ষমা কাকে বলে তিনি জানেন না। তাই হেক্টর ছুটছেন দ্রুতগতিতে, যতটা দ্রুত পারেন ছুটে চলেছেন। দেওয়াল ঘেঁষে তিনি দৌড়ুচ্ছেন, কিন্তু ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই, একটু বাঁক নিতে যে সময় নেবে তাতেই একিলিস তাঁকে ধরে ফেলবেন। দুজনেই প্রাণপণে ছুটছেন, একজন দৌড়াচ্ছেন প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে, আর একজন দৌড়ুচ্ছেন প্রাণ হরণের বাসনায়। দুঃস্বপ্নের ভেতর দৌড়ুলে যেমন কেউ কাউকে ধরতে পারে না, এখানেও ঠিক সে রকমই ঘটছে।

তিনবার শহরটা ঘিরে দৌড়নো হয়ে গেছে, এমন সময় এথিনী দেবী করলেন কি হেক্টরের এক ভাই ডাইওফোবুসের ছদ্মবেশ ধরে দাঁড়ালেন হেক্টরের পাশে, বললেন, 'ভাইয়া, আমি তোমার পাশে আছি, তুমি একিলিসের সঙ্গে লড়তে শুরু কর, আমি পাশে থাকব।'

গ্রীকদের প্রতি এথিনির দুর্বলতা এত বেশি যে হেক্টরকে শেষ করার এই সুযোগ তিনি ছাড়তে চাইলেন না। এথিনির ছদ্মবেশ হেক্টর ধরতে পারলেন না। ভাই পাশে আছে ভেবে তিনি বুকে বল পেলেন। দাঁড়িয়ে তিনি একিলিসের মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'এস একিলিস, যুদ্ধ করেই সব ফয়সালা করা যাক। তবে তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তুমি যদি আমার হাতে মর তো তোমার লাশের আমি অপমান করব না। তুমিও কথা দাও, তোমার হাতে আমার মৃত্যু হলে আমার লাশ তুমি অক্ষত অবস্থায় আমার বাবার হাতে পৌছে দেবে। কথা দাও, একিলিস।'

'অত সোজা?' একিলিস শ্লেষ-ঝরানো হাসি হেসে বললেন, 'আরে, তোমার সঙ্গে আমার কথা দেওয়া কি? সিংহ কি মানুষকে কথা দিয়ে তাকে হত্যা করে? না কি নেকড়ের সঙ্গে ভেড়ার কোনো চুক্তি হতে পারে? আমার বন্ধুকে তুমি খুঁচিয়ে মেরেছ, দেখি এবার, তোমার গায়ে কত জোর।' কথা বলতে বলতেই একিলিস তাঁর লম্বা বর্শাটি নিক্ষেপ করলেন হেক্টরের দিকে। হেক্টর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলায় বর্শাটি তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। এবার বর্শা ছোঁড়েন হেক্টর। সেই বর্শা একিলিস আটকে ফেললেন তাঁর ঢাল দিয়ে। এথিনি দেবী নিজে অদৃশ্য থেকে একিলিসের বর্শা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হেক্টরের কাছে আর কোনো

বর্শা নেই। ভাইয়ের হাত থেকে বর্শা আসছে না দেখে হেক্টর ডানদিকে তাকালেন, সেখানে কেউ নেই। বাঁদিকে তাকালেন, সেখানেও তাঁর ভাই নেই। তাঁর ছদ্মবেশে তো এসেছিলেন এথিনি, তিনি এখন অদৃশ্য থেকে সাহায্য করে চলেছেন একিলিসকে। হেক্টর দেবীর এই প্রতারণা বুঝতে পেরেও কিন্তু ঘাবড়ালেন না। ভাবলেন, মরতেই যদি হয় তো একিলিসকে একবার দেখে নেওয়া দরকার। বর্মের ভেতর থেকে ভারী ও ধারালো তলোয়ার বের করে তিনি ডান হাতে নিলেন। মাটিতে চরে বেড়ানো কচি ভেড়া কি গুটিশুটি হয়ে বসে থাকা খরগোশকে ছোঁ মেরে নেওয়ার জন্য যেমন উঁচু থেকে ঈগল শোঁ করে নেমে আসে, হেক্টর তেমনি করে লাফিয়ে পড়লেন একিলিসের ওপর। তড়িৎ গতিতে সরে গিয়ে একিলিস সেই আঘাত সামলালেন। তাঁর সামনে উড়ন্ত পাখির ছবি খচিত কারুকার্যময় ঢাল, তাঁর ডান হাতে বর্শা। বর্শার মাথাটা সন্ধ্যাতারার মত জ্বলজ্বল করছে। চঞ্চল চোখে তিনি হেক্টরের সারা শরীর তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন, বর্শাটা ঠিক জুতমত লাগানো যায় কোথায়। কাজটা একটু কঠিন, কারণ হেক্টরের সর্বাঙ্গ বর্মে ঢাকা। এই বর্মটা আবার পেট্রোক্লাসের, পেট্রোক্লাসকে মারার পর তাঁর মৃতদেহ থেকে হেক্টর এটা খুলে নিয়েছিলেন। একিলিস আচমকা তাঁর বর্শার সুচলো মাথা জোরে বিঁধে দিলেন হেক্টরের কণ্ঠার নরম জায়গাটায়। হেক্টর মাটিতে পড়ে গেলেও বর্শা তখনো তাঁর শ্বাসনালী ভেদ করতে পারেনি বলে তিনি হাঁসফাঁস করে হলেও বলতে পারলেন, 'আমার লাশ নিয়ে তুমি যে কি জঘন্য ব্যবহার করবে তা বেশ অনুমান করতে পারছি। কিন্তু একিলিস, মনে রেখ তোমার মরণটাও দেবতারা নির্ধারণ করে রেখেছেন এই দেওয়ালের এখানেই, দেখ, প্যারিস এই স্কেয়ানটের এখানে তোমার কি দশাটা করে।'

হেক্টরের মাথাটা ধুলায় লুটিয়ে পড়লে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। একিলিসের রাগ তখনো কমে নি। গ্রীক সৈন্যরা হেক্টরের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে দলে দলে ওখানে আসতে লাগলো। যে আসে সেই মৃত হেক্টরের দেহে যা দিয়ে পারে একটু খোঁচা মেরে যায়। তারা বলাবলি করছিল, 'আমাদের জাহাজের বহরে আগুন ধরিয়েছিল যখন তখনকার চেয়ে এই হেক্টরকে ঘায়েল করা অনেক সোজা।'

হেক্টরকে হত্যা করার পরও বন্ধুহন্তার ওপর একিলিসের বিদ্বেষ একটুও কমল না। মৃত হেক্টরের দুই পায়ের গোড়ালীর একটু ওপরে ছুরি দিয়ে চিরে শক্ত রগের ভেতর দিয়ে একটা চামড়ার দড়ি ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। দড়ির শেষ প্রান্ত বেঁধে দিলেন নিজের রথের সঙ্গে। তারপর রথে উঠে একিলিস ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতেই রথ ছুটে চলল তীরের বেগে। মাটিতে ছেঁচরাতে ছেঁচড়াতে চলল হেক্টরের শবদেহ। তাঁর মাথার নিচ থেকে ছোট ছোট ধূলিঝড় উঠতে লাগল। ধূলিঝড়ের ওপর নিশানের মত উড়ে চলছিল বীর হেক্টরের ঝাঁকড়া চুলের রাশি।

সোহরাব ও রোস্তম

আজ থেকে অনেক অনেক দিন আগে ইরানের সবচেয়ে বড় বীর রোস্তম একদিন বেরিয়েছিলেন শিকার করতে। ঘোড়ার পিঠে সারাটা দিন ছুটে শেষ পর্যন্ত মস্ত একটা হরিণ পাওয়া গেল। আগুনে ঝলসে কাবাব বানিয়ে গোটা হরিণটাই চেটেপুটে খেয়ে রোস্তম একটা গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিলেন, সে এদিক ওদিক চরে বেড়াতে লাগল।

রোস্তম বেশ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন, জেগে উঠে দেখলেন যে সূর্য ডুবু ডুবু, সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। এখন ঘরে ফেরা দরকার। কিন্তু ঘোড়াটা কোথায়? রোস্তম এদিক ওদিক খুঁজলেন, কিন্তু ঘোড়াটাকে দেখতে পেলেন না। তাঁর দুশ্চিন্তা হল, রাখশ নামে ঘোড়াটা তো যে সে প্রাণী নয়, এর যেমন তেজ তেমনি এর গতি, এর ওপর অনেকেরই দারুণ লোভ। রোস্তম তার খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে একটি প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছলেন, রোস্তম চিনতে পারলেন, এটা হল সমানগানের রাজপ্রাসাদ।

এত বড় একজন বীরকে বাড়িতে পেয়ে সমানগানের বাদশা খুব খুশি। রাখশ হারিয়ে গেছে শুনে তিনি কিন্তু একটুও ঘাবড়ালেন না। রোস্তমের এই ঘোড়ার কথা ইরানে কে না জানে? রাখশকে চুরি করে বেশিক্ষন ধরে রাখতে পারবে এমন মানুষ ইরানে কে আছে? বাদশা জানেন যে ঐ আগুনের মত গতি আর হাতির মত শক্তি নিয়ে রাখশ একাই কয়েকজন মানুষকে ঘায়েল করতে পারে। মেহমানের জন্যে তিনি বিপুল খাওয়া দাওয়ার ইন্তেজাম করলেন, বললেন, 'আপনি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্তে আরাম করুন, আমি চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, সকাল হতে না হতে তারা রাখসকে ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবে।'

সমানগানের বাদশার মেয়ে তাহমিনা রোস্তমকে দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। দেশের এই মহাবীরের নাম তো তিনি অনেকদিন থেকেই জানেন, ইরান তুরান জুড়ে রোস্তমের বীরত্বের খ্যাতি প্রচারিত। এখন নিজের চোখে তাঁকে দেখে

রাজকন্যা তাহমিনা বুঝলেন যে বিশাল লম্বা চওড়া এই মানুষটিকে নিজের চোখে না দেখলে তাঁর বিশাল দেহ আর প্রবল আকর্ষণের কথা কিছুই অনুমান করা যায় না। ওদিকে শাহজাদী তাহমিনাও দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের একজন। তাঁর চেহারা চাঁদের মত স্নিগ্ধ, গালের রঙ ইয়েমেনের প্রবালের মত উজ্জ্বল, তাঁর সারা শরীর সূর্যের মত ঝকঝকে আলো ছড়ায়। তাঁকে দেখে রোস্তমও একেবারে মুগ্ধ।

কিন্তু রোস্তমের মত বীর কি আর ঘরের কোণে বসে থাকতে পারেন? ঘরের সুখ কি তাঁর নসিবে আছে? নাকি এই ধরনের শান্তশিষ্ট নিরিবিলি জীবন তাঁর ভালো লাগে? যখনই শুনলেন যে সমানগানের বাদশার লোকজন তাঁর রাখশকে খুঁজে নিয়ে এসেছে, বেরিয়ে পড়ার জন্যে রোস্তম একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। রোস্তম চলে যাবেন শুনে তাহমিনার মন খুব খারাপ, মাত্র একরাত্রি ঘর করার পর স্বামী কোন অজানা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হচ্ছেন। বীর যোদ্ধা স্বামী ফের কবে আসেন কোনো ঠিক নেই। শাহজাদী তাহমিনা কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার সন্তানকেও দেখে যাবে না?' না, রোস্তমের অতদিন অপেক্ষা করার মতো সময় কোথায়? সন্তানের কথায় তিনি থমকে দাঁড়ালেন। নিজের বাহু থেকে তিনি মণিভূষিত বাজুবন্ধ খুলে তাহমিনার হাতে দিলেন, এই বাজুবন্ধের সুখ্যাতি দুনিয়ার সবাই জানে। রোস্তম বললেন, 'তাহমিনা, এটা খুব যত্ন করে রেখ। সৌভাগ্যক্রমে যদি তোমার মেয়ে হয় তো এটা তার বেণীতে বেঁধে রেখ, রক্ষাকবচ হয়ে এটা তাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে, এর জোরে সে দুনিয়া আলো করে রাখবে। আর ওপরওয়ালা যদি ছেলে দেয়, তবে তার বাপের চিহ্ন হিসাবে তার বাহুতে বেঁধে দিও এটা। তাহলে সে তার পূর্বপুরুষদের সাহস অর্জন করতে পারবে, বীরত্বে, শক্তিতে, তেজে সে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। তার গায়ে এমন জোর হবে যে মেঘের ভেতর থেকে উড়ন্ত ঈগলকে ধরে আনা তার কাছে হবে ছেলেখেলার সামিল।'

শোকের পানিতে ভেসে তাহমিনা বিদায় দিলেন রোস্তমকে।

তারপর আকাশে এক চাঁদ উঠে তিরিশ দিন পর সেই চাঁদ নিভে গেলে ফের উঠে আসে নতুন চাঁদ। এইভাবে নয়টি চাঁদের আসা যাওয়ার পালা শেষ হলে দশম চাঁদ উঠলে তাহমিনার কোল জুড়ে উদয় হল আর একটি চাঁদ। সত্যি, তাহমিনার একটি ছেলে হল আর মনে হল যেন সমানগানের রাজপ্রাসাদে আলো ঝলমল করছে। তাহমিনা ছেলের নাম রাখল সোহরাব। দেখতে সে তার বাবার মতোই শক্তসমর্থ, যেন তারই একটি খুদে সংস্করণ। শিশুটি এত তাড়াতাড়ি বড় হতে লাগল যে এক মাস বয়সে তাকে মনে হয় এক বছরের ছেলে। ঐ বয়সে তার সিনা হল তার বাবার সিনার মতো চওড়া। তিন বছর বয়সে মাঠে মাঠে লড়াই লড়াই খেলা ছাড়া আর কিছুই করতে তার ভালো লাগত না। পাঁচ বছর বয়সে সোহরাবের বুকে এল সিংহের বল। আর যখন সে দশ বছরে পড়ল তখন এই মুলুকে কেউ রইল না যে কি-না মল্লযুদ্ধে তার সঙ্গে টিকতে পারে।

কিন্তু একটি ব্যাপারে সোহরাবের মনে খটকা রয়ে যায়। সে যে কার ছেলে এই কথাটি কিন্তু তার জানা নেই। একদিন তার মাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আম্মা, এখানে আমিই তো সবচেয়ে লম্বা, আমার মাথা তো প্রায় আকাশ ছোঁয় ছোঁয়, এ তল্লাটে আমার মতো গায়ের জোর তো আর কারো নেই। কিন্তু আমার এই শরীর, এই শক্তি, এই সাহস আমি পেলাম কার কাছ থেকে? আমি কোন বংশের ছেলে? আমার পিতা কে?'

ছেলের কথা শুনে তাহমিনার বুক কাঁপে। বংশ পরিচয় জানলে এ কি আর ঘরে থাকবে? এতো তার বাপের মতোই এক লড়াই পাগল ছেলে। কিন্তু তার পিতৃপরিচয় সে কতদিন লুকিয়ে রাখবে? তাহমিনা তাই বলেই ফেললেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বীরবংশের সন্তান তুমি, তোমার পিতা বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা রোস্তম। তোমার পূর্বপুরুষ দস্তান, সাম, নিরাম, জাল—এঁদের সবার মাথা আকাশ ফুঁড়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল।'

'আমাকে এতদিন আমার পিতৃ পরিচয় জানাও নি কেন?' সোহরাব জিজ্ঞেস করলে তাহমিনা তাঁর বাক্স থেকে একটি গোপন চিঠি বের করলেন। ছেলের জন্ম সংবাদ পেয়ে রোস্তম তিনটে উজ্জ্বল রুবি আর কয়েকটি সোনার পাতের সঙ্গে এই চিঠিটাও পাঠিয়েছিলেন। এতদিন পর তাহমিনা ছেলেকে ঐ চিঠি পড়ে শোনালেন। চিঠিতে রোস্তম লেখেন যে ছেলে হওয়ার খবর শুনে রোস্তম খুশিতে আত্মহারা, কিন্তু তাঁর একটু ভাবনাও হচ্ছে বৈ কি।

'কেন?' চিঠি শুনতে শুনতে সোহরাব বলে, 'এত বড় বীর, তাঁর আবার ভয় কিসের?'

'না বাবা, ভয় তাঁর নিজের জন্যে নয়,' তাহমিনা ছেলেকে বুঝিয়ে বলেন, 'আমাদের এই উত্তরের এলাকায় তুরানের শাহের দাপটটাই বেশি। তুরানের শাহ আফরাসিয়াব যে ইরানের সেনাবাহিনীর হাতে প্রায়ই পর্যুদস্ত হন তার প্রধান কারণ তোমার বাবা। ইরানের শাহ কাভুস যে একটা অপদার্থ মানুষ এ কথা তো সবাই জানে। তাঁর বাহিনীতে রোস্তম না থাকলে তাঁর সিংহাসন কবেই উল্টে যেত। আফরাসিয়াবের তাই সব রাগ রোস্তমের ওপর। তিনি যদি কোনোভাবে টের পান যে রোস্তমের ছেলে এখানে বড় হচ্ছে তবে যে কি করবেন কে জানে? তাই তোমার বাবা তোমার কথা কাউকে বলতে আমাকে নিষেধ করেছেন।'

'অসম্ভব। এই কথা গোপন রাখা অসম্ভব। আফরাসিয়াবের সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমি যুদ্ধে যাব। ঐ অপদার্থ কাপুরুষ শাহ কাভুসকে উৎখাত করে ইরানের সিংহাসনে বসাব আমার বীর পিতা রোস্তমকে।' সোহরাবের মুখে এই কথা শুনে তাহমিনা বললেন, 'কিন্তু তুমি তো বাবা এখনো বালক। তুমি বড় হতে হতে দেখবে তোমার বাবা নিজেই এসে তোমাকে যুদ্ধে নিয়ে যাবেন।'

'আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি আম্মা। আমি এখনি যুদ্ধে ইরানের শাহকে হারিয়ে ইরানের সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করব তুরানের শাহ আফরাসিয়াবকে। আমার

পিতাকে শাহানশাহ আর তোমাকে বেগমের আসনে প্রতিষ্ঠা করে দেশে দেশে সিংহের মত লড়াই করে বেড়াব আমি।'

না, এই ছেলেকে আর ঘরে বেঁধে রাখা যায় না। সোহরাব তাঁকে ছেড়ে যুদ্ধে যাবে বুঝতে পেরে তাহমিনা মন খারাপ করলেন বটে, তবে ছেলের সাহস ও সংকল্প দেখে তাঁর গর্বও হল। রোস্তমের বাজুবন্ধ ছেলের হাতে বেঁধে দিয়ে তিনি তার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে দোয়া করলেন। সোহরাব বলল, 'আম্মা, তুমি তোমার লোকজন পাঠিয়ে আমার জন্যে তেজি দেখে একটা ঘোড়া জোগাড় করে দাও। ঐ ঘোড়ার গায়ে হাতির মতো শক্তি থাকা চাই, তার গতি হবে পাখির মতো, ডাঙায় সে দৌড়াবে হরিণের মতো আর পানিতে চলবে মাছের মতো।' তাহমিনা তাঁর লোকদের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন, তারা ঐরকম একটি ঘোড়া ধরে নিয়ে এল।

ইরান আক্রমণের জন্য সোহরাবের আয়োজনের কথা শুনে তুরানের শাহ্ আফরাসিয়াব মহা আনন্দিত। তিনি তাঁর সিপাহসালারদের বললেন, 'এই তো সুযোগ। ইরানে যুদ্ধ করতে গিয়ে রোস্তম যদি সোহরাবের হাতেই মারা পড়ে তো তার চেয়ে সুখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? রোস্তম না থাকলে ইরানের শাহকে উচ্ছেদ করতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হবে না। পরে সোহরাবকে কি করে খতম করতে হয় সে ফন্দিও বের করতে হবে।

ওদিকে ইরানের শাহ কাভুস খবর পেলেন যে তরুণ একজন বীরের নেতৃত্বে উত্তর থেকে তুরান সৈন্যরা আসছে ইরান আক্রমণ করতে। সেই বীরপুরুষের পদভারে মেদিনী কাঁপে, তার হুঙ্কারে পাহাড় টলে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাভুস জরুরি খবর পাঠালেন রোস্তমকে, রোস্তম যেন দেরি না করে তুরানী ঐ তরুণ বীরকে মোকাবেলা করতে তৈরি হয়। কিন্তু এই হুঁশিয়ারিতে রোস্তম গা করলেন না, শাহের কথা তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। রোস্তম ভাবলেন তুরানে এমন বীর কেউ থাকতেই পারেন না যিনি তাঁর সঙ্গে লড়াইতে নামতে পারেন। সমরগানের শাহজাদী তাহমিনার গর্ভে তাঁর একটি ছেলে হয়েছে বটে, তাকে তিনি এখনো চোখে দেখেন নি। তাঁর নিজের ছেলে একদিন তাঁর মতোই বীরপুরুষ যোদ্ধায় পরিণত হবে এতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে একেবারেই বালক ছাড়া আর কিছুই নয়। রোস্তম ভাবতেও পারেন নি যে তাঁর পুত্র এত অল্প বয়সেই এত বল, এত শক্তি ও এত সাহস অর্জন করেছে। রোস্তম তাই শাহানশাহ কাভুসের সতর্কবাণীকে পরোয়াই করলেন না।

রোস্তমের বেপরোয়া ভাবের কথা শাহের কানে গেলে তিনি রোস্তমের ওপর খুব রাগ করেছিলেন, এমন কি তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার হুকুমও দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর উজির নাজির যখন তাঁকে বোঝালেন যে, এবার তুরানী সেনাদল যাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে আসছেন এক রোস্তম ছাড়া তাঁকে ঠেকাবার হিম্মৎ ইরানে আর কারো নেই, শাহ তখন রোস্তমের কাছে মাফ চাইলেন। ইরানের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে রোস্তমও যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিলেন।

ইরান ও তুরানের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের মাঠে এসে সমবেত হল। একদিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোস্তম, অন্যদিকে সামনে রয়েছেন সোহরাব। পরস্পরকে এঁরা চেনেন না। তবে সোহরাব জানেন যে তাঁর পিতা ইরানী বাহিনীর একজন বিশিষ্ট সিপাহসালার। তিনি শত্রুপক্ষের বড় বড় যোদ্ধাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। পিতাকে সনাক্ত করার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ইরানের এক সৈন্যকে বন্দী করে সোহরাব একবার জানতেও চাইলেন, 'আপনাদের বাহিনীতে রোস্তম কে, আমাকে একটু দেখিয়ে দিন না। কিন্তু সোহরাবের বীরত্বে ঐ ইরানী সিপাহী এতই ভয়ে পেয়ে যায় যে তার ভয় হয় যে এঁর পক্ষে রোস্তমকে ঘায়েল করাও কিছু নয়। সুতরাং তাঁকে চিনিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে সে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'না হুজুর, রোস্তম এখানে নেই।'

চিতাবাঘের চামড়ার পোষাকে সজ্জিত রোস্তম তাঁর প্রিয় ঘোড়া রাখশে সওয়ার হয়ে বিপক্ষ সেনাবাহিনীর দিকে এগুতে লাগলেন। শত্রুসেনাদলের ভেতর প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল সোহরাবের ওপর। তাঁকে দেখে রোস্তম একেবারে স্তম্ভিত। এত বিশাল শরীর, মুখে এমন দৃঢ় সংকল্প, চোখে এমন অকুতোভয় দৃষ্টি—আহা এরকম মানুষও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে?

রোস্তমকে সামনে দেখে সোহরাবও বিস্ময়ে হতবাক। কি দীর্ঘ, কি বলবান, ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ তাঁর সামনে হাজির হয়েছেন। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তো এমন বীরের সঙ্গেই করা উচিত। সোহরাব এগিয়ে গিয়ে রোস্তমকে বললেন, 'আমার মনে হয় আর কারো যুদ্ধে নেমে কাজ নেই। বৃথা লোকক্ষয়ে কার কি লাভ? ইরানের পক্ষে আপনি এবং তুরানের পক্ষে আমি—এই দুজনে লড়াই করেই তো যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারি, তাই না?'

এই প্রস্তাবে রোস্তম রাজি হলে সোহরাব বললেন, 'আপনি অবশ্য আমার কাছে কিছুই নন, আমার একটি ঘুষিও আপনি সামলাতে পারবেন কি-না সন্দেহ। আপনি খুব লম্বা, আপনার ঘাড়ও বিশাল, আপনার হাত দুটিও হাঁটু ছুঁয়েছে। কিন্তু বয়সে বয়সে আপনার শক্তির ক্ষয় হয়েছে। আমার সঙ্গে আপনি পারবেন কেন?'

ছেলেটির কথা শুনে রোস্তম হেসে বললেন, 'ওহে বালক, পৃথিবীর মাটি শক্ত আর হাওয়া খুব নরম। তুমি এখনো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছ, বুঝলে? তোমার জন্মের আগে থেকে আমি যুদ্ধ করে আসছি, আমার হাতে বড় বড় সেনাপতি ঘায়েল হয়েছে, কত সেনাবাহিনী তছনছ করে ফেলেছি। তবে হ্যাঁ, তোমার মত অল্পবয়েসী সৈন্যের এত সাহস আমি দেখিনি। তোমাকে মেরে ফেলতে আমার খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু যুদ্ধে নামলে তোমাকে মেরে না ফেলে আমার আর উপায় কি?'

তাঁর কথা শুনতে শুনতে সোহরাবের মনে হচ্ছিল এই বীরসিংহ যেন তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠজন। মনে হল এই সেনাপতিই হয়তো রোস্তম। তিনি সরাসরি বললেন, 'আচ্ছা, সত্যি বলুন তো আপনি কে? আমার মনে হচ্ছে যে আপনি বোধ হয় রোস্তম। আপনার নাম কি?'

'আরে না'। রোস্তম হেসেই উড়িয়ে দিলেন, তাঁর ভয় হল যে এ যদি রোস্তম বলে তাঁকে চিনতে পারে এবং এর হাতে যদি তাঁর পরাজয় হয় তবে এর মনোবল এতই বেড়ে যাবে যে মুহূর্তের মধ্যে সে সমস্ত ইরানী সেনাবাহিনীকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তিনি তাই মিথ্যা কথা বললেন, 'রোস্তম কত বড় বীর, আর আমি হলাম এক সামান্য মানুষ। রোস্তমের সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়?'

এইসব কথা বার্তা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পরদিন দীর্ঘ একটি বর্শা হাতে সোহরাব যুদ্ধের মাঠে হাজির। ওদিকে রোস্তমও এসেছেন রাখশের পিঠে চড়ে। দুজনেই বাঁদিকে নিজেদের ঘোড়ার লাগাম ধরে টানলেন। শুরু হল বর্শা নিয়ে দুজনের যুদ্ধ। কিন্তু বর্শা দিয়ে কেউ কাউকে কাবু করতে পারলেন না, সুতরাং দুজনেই হাতে তুলে নিলেন হিন্দুস্থানী তলোয়ার। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণ লেগে আগুন ছুটতে লাগল, কিছুক্ষণের মধ্যে দুটি তলোয়াড়ই খান খান হয়ে ভেঙে গেল। এরপর ঘোড়ার পিঠে বসেই শুরু হল রোস্তম আর সোহরাবের মুষ্ঠিযুদ্ধ। এরপর পরস্পরের কঠিন থাবার নিচে পরস্পরের একেবারে ঘায়েল হওয়ার জোগাড়, দুজনের শরীর ঘামে চপচপে, মুখ ধূলিতে ভর্তি, পিপাসায় জিভ শুকিয়ে কাঠ। রোস্তম অবাক হয়ে ভাবেন, এরকম প্রচণ্ড যোদ্ধা তো আমি জীবনে দেখিনি। ছেলেটি কে? কিন্তু বেশি ভাববার সময় পাওয়া যায় না। কারণ ঘোড়ায় বসে থেকেই তাঁর ঘাড়ে সোহরাব এমন জোরে একটি ঘুষি মারলেন যে রোস্তমের সারা শরীর টলে উঠল। তাঁর ঘাড় ও পিঠ ব্যথায় টনটন করতে লাগল, দাঁতে দাঁত চেপে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করলেন। রোস্তম যে বেশ কাবু হয়েছে তা বুঝতে পেরে সোহরাব হাসলেন, বললেন, 'আপনি নাকি জাঁদরেল সব সেনাপতিদের ঘায়েল করেছেন, আর আমার মতো সামান্য এক সৈন্যের আঘাতে আপনার এই হাল হয়? আর আপনার এই যে ঘোড়া নিয়ে এত বড়াই করেন, এটা তো একটা গাধারও অধম।'

রোস্তম হঠাৎ করে খুব ভয় পেলেন। তিনি করলেন কি কোনো কথা না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা চলে গেলেন নিজের শিবিরের দিকে, তাঁর মনে হল ইরানী সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে সোহরাবের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটলে তারা যেন সাবধানে যুদ্ধ করে, নইলে এই ছেলেটি একাই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু নিজের শিবিরে পৌঁছতে না পৌঁছতে তিনি দেখেন যে সোহরাব তার পিছে পিছে ছুটে এসেছে। রোস্তম বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এখানে এসেছো কেন? যুদ্ধ তো করছি আমি আর তুমি, তবে আমার সেনাবাহিনীর সবাইকে আক্রমণ করতে আসা কি তোমার উচিত হয়েছে?'

'আমার তুরানী সেনাবাহিনী তো এখান থেকে অনেক দূরে। আমি আপনার সঙ্গেই লড়ব। কিন্তু আপনি পালিয়ে এলেন কেন?'

পালিয়ে আসব কেন? লজ্জা পেয়ে রোস্তম বললেন, 'সন্ধ্যার আর বাকি নেই বলে আজকের মতো যুদ্ধ শেষ, তাই আমি শিবিরে ফিরলাম।'

ভোর হলে সূর্য তার সবগুলো ডানা মেলে অন্ধকারকে শুষে নিল, রোস্তম আর সোহরাব ফের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হল। আজ সোহরাবের ফের মনে হল, এই বীর

যোদ্ধাটি বোধহয় তাঁর আপনার লোক। এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি মন থেকে সায় পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, 'আপনার শরীর ভালো তো? রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছে? শুনুন, এইসব তীরধনুক আর তলোয়ার ফেলে দিন। যুদ্ধ করে লাভ কি? আপনি আমাকে আপনার পরিচয় দিচ্ছেন না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনিই বোধ হয় রোস্তম। যাক, আপনি যে-ই হোন না কেন, আপনাকে আঘাত করতে আমার খারাপ লাগছে। এই যুদ্ধটুদ্ধ বাদ দিয়ে আসুন দুজনে একটু ভালো খাওয়াদাওয়া করি।'

রোস্তম ভাবলেন, ছেলেটি বোধহয় কারো কাছে তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছে, এইসব মন ভোলানো কথা বলে তাকে দুর্বল করে তুলে হঠাৎ করে আঘাত হেনে বসবে। তিনি তাই ধমকের সুরে বললেন, 'আমার সঙ্গে ছলনা করতে এসো না, আমার বয়স কম হল না।'

'আপনি বয়স্ক মানুষ, আমার মুরুব্বির মত।' সোহরাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, 'আপনাকে দেখে ভাবছিলাম সময় এলে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় আত্মীয়স্বজনের চোখের সামনে আপনার মৃত্যু ঘটবে। তা বোধহয় আপনার কপালে নেই।'

সোহরাব কিন্তু সত্যি চাইছিলেন যে তাঁর প্রতিপক্ষ প্রাণ নিয়ে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু তাঁর যা মনোভাব, যুদ্ধ না করে আর উপায় নেই। তাই দুজনেই নিজ নিজ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন। আজ বল্লমযুদ্ধ। একটা পাগলা হাতির মত সোহরাব রোস্তমকে এক ধাক্কায় মাটিতে শুইয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর ওপর বসে পড়লেন শক্ত হয়ে। তারপর বুনো মোষের শরীরে সিংহ যেভাবে নখ গেঁথে দেয়, সোহরাব তেমনি রোস্তমের মাথায় গেঁথে দেওয়ার জন্যে ছুরি তুললেন। এবার রোস্তমের আর রক্ষা নেই। নিশ্চিত মরণ ঠেকাবার জন্যে রোস্তম বললেন, 'একটু শোনো।' অন্য কোনো শত্রু হলে সোহরাব কিন্তু শুনতেন না। কিন্তু রোস্তমকে দেখার পর থেকেই তাঁর প্রতি তীব্র ভালোবাসা বোধ করছিলেন বলেই সোহরাব ছুরি নামিয়ে রোস্তমের কথা শুনতে লাগলেন। রোস্তম বললেন, 'আমাদের নিয়ম কিন্তু অন্যরকম। এভাবে দ্বৈতযুদ্ধ করতে করতে কোনো বীর যদি তার চেয়ে বয়সে বড় প্রতিপক্ষের মাথা মাটিতে লুটিয়ে দেয় তাহলে সে কিন্তু তাকে প্রথমেই মেরে ফেলে না, তাকে আর একবার যুদ্ধ করার সুযোগ দেয়। তাহলেই আমরা তাকে সিংহ বলে অভিহিত করতে পারি।'

রোস্তমের এই কথা আসলে সোহরাবের হাত থেকে তাঁর বাঁচার ফন্দি। সোহরাব এই কথা মেনে নিলেন। রোস্তম লাফিয়ে উঠে সোজা চলে গেলেন ঝর্ণার দিকে। তীব্রবেগে প্রবাহিত ঝর্ণার জলস্রোতে তিনি অনেকক্ষণ ধরে গোসল করলেন। শরীরটা ঝরঝরে হলে ঝর্ণার পানি আকণ্ঠ পান করলেন।

নতুন শক্তি নিয়ে রোস্তম ফের যুদ্ধের জায়গায় ফিরে এলে সোহরাব বললেন, 'সিংহের থাবা থেকে বেরিয়ে আপনি ফের মরতে এসেছেন? আপনার কি প্রাণের মায়া বলে কিছু নেই?'

সোহরাব কিন্তু সত্যি চাইছিলেন যে রোস্তম যেন ফের যুদ্ধ করতে না আসেন, রোস্তমকে আঘাত করতে তাঁর প্রাণ কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

কিন্তু তাঁকে লড়াইতে নামতেই হল। রোস্তম নিজের বাঁ হাত হঠাৎ করে সোহরাবের ঘাড়ে রেখে আচমকা ধাক্কা দিয়ে তাকে ধরাশায়ী করল, অন্য হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে চিতাবাঘের ভঙ্গিতে বুকের ওপর নিজের বুক শুইয়ে দিল। সোহরাবের তখন কিছুই করার নেই। এক মুহূর্তে কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে রোস্তম তাই গেঁথে দিল সোহরাবের বুকের মাঝখানে। সোহরাবের বুক থেকে রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস, তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি আর কি করব? আমার প্রাণ তোমার হাতেই বাঁধা ছিল। আমার শুধু দুঃখ রইল আমার বিশ্ববিখ্যাত বাবার সঙ্গে আমার দেখা হল না। এই আফসোস নিয়েই আমাকে মরতে হচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসছে তার দুর্বল মুখের কথা, 'তবে আপনাকে বলে রাখি, আমার বাবার হাত থেকে কিন্তু আপনার রক্ষা নেই। রোস্তম যখন শুনবেন যে তাঁর ছেলেকে আপনি বিনা কারণে, অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন তখন তিনি যে করে হোক প্রতিশোধ নেবেন। আপনি যদি সমুদ্রের মাছ হয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে থাকেন, লক্ষ তারার মধ্যে লুকিয়ে থাকেন কিংবা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়েও যান, তবুও আমার বাবা রোস্তম আপনাকে ঠিক সনাক্ত করে মেরে ফেলবেন।'

শত্রুর মুখে নিজের নাম শুনে রোস্তম ছটফট করে ওঠেন, এই বালকটি কে? কিন্তু তাঁর ছেলেকে না দেখলেও এখন তার যা বয়স তাতে তো এমন লম্বা চওড়া, এমন বলশালী হওয়ার কথা নয়। এই ছেলেটি আজ কি বলছে? তিনি উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন, 'তুমি কি বলছ? তুমি কি রোস্তমের ছেলে? সোহরাব অনেক কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকালে রোস্তম কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমিই তো রোস্তম। তুমি রোস্তমের ছেলে? ঠিক বলছ? এর প্রমাণ কি?'

'আপনিই রোস্তম? আপনি পরিচয় দিচ্ছিলেন না কেন? বাবা, আপনি মিছেমিছি আমাকে মারলেন?' একটু গোঙাতে গোঙাতে তিনি বললেন, 'আমার বর্ম খুলে ফেলুন। আহ, মা আমার হাতে আপনার বাজুবন্ধ বেঁধে দিয়েছিলেন। এটা আমার রক্ষাকবচ, এটাই আমার বাবার পরিচয়। আমার বাবা বীরযোদ্ধা রোস্তম এটা আমার মাকে দিয়ে এসেছিলেন।'

সোহরাবের বর্মের ভেতর থেকে কবচ বের করে চোখের সামনে তুললে রোস্তমের চোখের সামনে ঘোরতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই তরুণ বীর তাঁরই ছেলে? এ তো একেবারে বালক, মুখে তো এর মায়ের দুধের গন্ধ লেগে রয়েছে। তাঁর বালক সন্তান এত বড় হয়েছে, এ বিশ্বাস না করে সে যে কি ভুল করেছে। নিজ হাতে সে হত্যা করল নিজের ছেলেকে, তার চোখের মণি যেন সে নিজেই উপড়ে ফেলল। আহা কি অকুতোভয় পুত্র তার। গায়ে কি অপরিমেয় শক্তিও তার, কি অসাধারণ যুদ্ধকৌশল এই বয়সেই সে রপ্ত করেছে। স্তম্ভিত হয়ে রোস্তম বসে রইলেন সোহরাবের পাশে।

ওদিকে সূর্য ডোবে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাতলা অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, মুমূর্ষু ছেলের মুখ ভালো করে দেখার জন্য রোস্তম একেবারে ঝুঁকে বসলেন। সন্ধ্যার পরও রোস্তম তাঁর শিবিরে ফেরেন না দেখে একজন সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে এল। সোহরাবকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'সিপাহসালার, শত্রু তবে আপনার হাতে মারা গেছে, আমাদের জয় হয়েছে, আপনার হাতে, একা আপনিই ইরানী বাহিনীকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিলেন। আপনার জয় হোক।'

এই কথা শুনে রোস্তম সেই সৈন্যের দিকে তাকিয়ে বাষ্পরুদ্ধ গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'না, না, আমি আমার ছেলেকে নিজ হাতে মেরে ফেলেছি। আমার আবার জয় কিসের? আমি হেরে গেলাম, আমি হেরে গেলাম।' রোস্তমের ঘোড়া রাখশ মনিবের এই অবস্থা দেখে বেদনায় বিহ্বল হয়ে সোহরাব রোস্তম দুজনের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে রইল। রোস্তম তাঁর কোলে তুলে নিলেন সোহরাবের রক্তাক্ত শরীর। ওদিকে ইরানী শিবিরে জয়ের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো জয়ধ্বনিই রোস্তমের কানে আসছে না। দেখতে দেখতে সোহরাবের ক্লান্ত চোখজোড়া একবার তাঁর বাবার চোখে স্থির হয়ে থেকে তারপর চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

সেই বিশাল ফাঁকা মাঠে তখন পাতলা কুয়াশা ঝুলছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার ছাঁকনি চুঁয়ে-পড়া চাঁদের আলো পড়েছে সোহরাবের মুখে। মুখটিকে আর একটি চাঁদের মত দেখায়, রোস্তম যেন আকাশের চাঁদের নিচে আর একটি চাঁদ কোলে করে বসে রয়েছে। উত্তর থেকে একটু একটু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শোকে, অনুতাপে, দুঃখে ও বেদনায় নির্বাক রোস্তমের অনুক্ত আর্তনাদ সেই হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে গোটা মাঠ জুড়ে। তারপর মাঠ পেরিয়ে তা ছুটে যাচ্ছে ইরানের ও তুরানের সেনা ছাউনিতে। এই এলাকা অতিক্রম করে তা বিস্তারিত হয় সমস্ত ইরানের লোকালয়ে লোকালয়ে।

আবু হাসানের গল্প

'আপনি আমার মেহমান, আপনার কাছে আমার চাইবার কিছুই নেই।' আবু হাসান বারবার এই কথা বললেও মসুলের সওদাগর একেবারে নাছোড়বান্দা, যে করে হোক এই যুবকটিকে তিনি কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করবেনই। তার আতিথেয়তায় তিনি মুগ্ধ, প্রতিদানে তাকে কিছু দেওয়ার জন্য তিনি বড় ব্যগ্র।

বাগদাদের এই যুবকটি বেশ অদ্ভুত প্রকৃতির, একটি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকে, দিন কাটায় একরকম একাই, কোথাও বেরোয় না পর্যন্ত। বিকালবেলা হলে করে কি চলে যায় বাড়ির কাছেই একটি খালের ধারে। খালের সাঁকোর রেলিঙে বসে বসে সে পথচারীদের দেখে। নানা জায়গা থেকে কাজে কারবারে কত লোক বাগদাদে আসে। তাদের অনেকেই সন্ধ্যার আগে ফিরে যেতে পারে না, শহরেই কোনো সরাইখানায় রাত্রি কাটায়। প্রতি সন্ধ্যায় এরকম একজন মুসাফিরকে আবু হাসান নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। তাকে পেট পুরে খাইয়ে তার ঘুমোবার জন্য বিছানা করে দেয়। আজ সে ডেকে এনেছে মসুলের এই সওদাগরকে। খাওয়া দাওয়ার পর শরাব খেতে খেতে সওদাগর তাকে কিছু সওগাত দেওয়ার প্রস্তাব করলে আবু হাসান তা কিছুতেই নিতে চাইছিল না। সওদাগর শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি তোহফা না নাও, আমি কি তোমার কোনো উপকারও করতে পারি না?'

'না, আপনি বিদেশী মুসাফির, আপনি আমার জন্যে কি করতে পারেন? আমি যে ঝামেলায় পড়েছি তা কেবল সমাধান করতে পারেন আমাদের খলিফা স্বয়ং।'

'কেন? তুমি কি সাংঘাতিক কোনো বিপদে পড়েছ?'

'আর বলবেন না! আমার দুশমন আমার বাড়িওয়ালা। এর ভাব দেখে মনে হয় ব্যাটা এক খুদে নবাব। রাতদিন সময় নেই, অসময় নেই সে আমার সঙ্গে, আমার আম্মার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন আমরা তার প্রজা। ঘরে মশলা বাটলে লোকটা চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তোলে, ওর মেঝে নাকি ফুটো হয়ে গেল।

একটু বেশি পানি ব্যবহার করলে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করে। ওর দুটো চাকর আছে, দুটি মনে হয় ইবলিসের দুটি ছেলে। এই তিনজন মিলে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। ওর সব ভাড়াটেদের সঙ্গেই শয়তানটা এই ব্যবহার করে।'

'তা খলিফাকে তুমি বললেই তো পার' মসুলের সওদাগরের এই পরামর্শে আবু হাসান উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'কি যে বলেন, বাড়িওয়ালা হল বড়লোক, খলিফার আমলাদের সঙ্গে তার দোস্তি। আমি সেখানে পাত্তা পাব কি করে?'

কথা বলতে বলতে রাত বাড়ে, শরাবের নেশায় আবু হাসানের কথা জড়িয়ে আসে। এর মধ্যে সওদাগর আবু হাসানের শরাবের পেয়ালায় একটুখানি আফিমের টুকরা ঢেলে দিলে তার আরো ঘুম পায়। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে জড়ানো গলায় সে বলে, 'যদি একদিনের জন্যেও খলিফা হতে পারতাম তো এই বাড়িওয়ালার জুলুম বন্ধ করে দিতাম।'

আবু হাসান কিন্তু খলিফা হারুনুর রশিদের সঙ্গেই কথা বলছিল। বাগদাদের অধিবাসীদের অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্য খলিফা রোজ রাত্রে নিজে ছদ্মবেশ ধরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। আজ মসুলের সওদাগরের বেশ ধরে বেরিয়ে আবু হাসানের আহ্বানে এখানে এসেছেন। সব সময়ের মত তাঁর বিশ্বস্ত খাস নওকর সঙ্গে আছে, সে লুকিয়ে রয়েছে আবু হাসানের ঘরের বাইরে গলির অন্ধকারে। এদিকে আফিমের নেশায় আবু হাসান গালিচায় ঘুমিয়ে পড়েছে। খলিফা জানালার ফাঁকে মুখ গলিয়ে মশরুরকে ডাকলেন। তাঁর চোখের ইশারায় ঘুমন্ত আবু হাসানকে তুলে নিয়ে মশরুর চলল খলিফার প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদে পৌঁছে খলিফা তাঁর দাসদের হুকুম করলেন, 'ওকে আজ আমার বিছানায় শুইয়ে দাও। পোষাক পাল্টে আমার পোষাক পরাও।' তারপর তিনি এত্তেলা পাঠালেন তাঁর উজির জাফরকে। উজির হাজির হলে বললেন, 'জাফর, চাঁদনি চকের এই যুবক আবু হাসান আগামী কাল ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত দেশের খলিফা, তোমাদের সকলের মনিব। কালকের জন্য সে খলিফা হারুনুর রশিদ। আমার সঙ্গে যে ব্যবহার কর কাল ওর সঙ্গে অবিকল ঠিক তাই করবে। কালকের জন্য এই প্রাসাদ ওর দখলে, রাজত্ব ওর এখতিয়ারে বুঝলে তো?'

পরদিন আবু হাসানের কাণ্ডকীর্তি দেখার জন্য খলিফা তাঁর ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি এমনভাবে দাঁড়িয়েছেন যে তিনি আবু হাসানকে দেখতে পারেন, কিন্তু আবু হাসান তাঁর উপস্থিতি টেরও পাবে না।

আফিমের নেশায় আবু হাসান পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। উজির জাফর ও বান্দা মশরুর বিছানার পাশে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আছে খলিফার খাস খিদমতগারের বাহিনী। একজন খিদমতগার আস্তে আস্তে আবু হাসানকে ডাকল, 'জাঁহাপনা, অনেক আগেই ফজর হয়েছে, নামাযের সময় যায়, উঠবেন না?'

ঘুম ভাঙলে চারদিকে দেখে আবু হাসান ফের চোখ বুজলো, আহা কি সুন্দর স্বপ্ন সে দেখছে, এই বাদশাহী খোয়াব যতক্ষণ দেখা যায় ততই ভাল। কিন্তু উজির এবার ডেকে বলে, 'জাঁহাপনা, বেলা অনেক হল। দরবারে যাবেন না?'

আবু হাসান এবার দুই হাতে চোখ কচলে চোখ বড় বড় করে তাকায়, না, এ তো স্বপ্ন মনে হচ্ছে না। তবে সে কোথায় এসে পড়েছে? স্বপ্নই যদি না হবে তো চারদিকে সে এসব কি দেখছে? তার সেই শয়তান বাড়িওয়ালার গালাগালিতো এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। তার বদলে মিহি সুরে রবাবের মিষ্টি বাজনা শোনা যাচ্ছে। ব্যাপার কি? সে কোথায় এল?

মশরুর এগিয়ে এসে মেঝে ছুঁয়ে কুর্নিশ করে বলল, 'জাঁহাপনা গুস্তাখি মাফ করবেন। এবার উঠতে হয়।'

'কে তুমি? আমার সঙ্গে এসব কি ঠাট্টা করছ?'

'জাঁহাপনা বোধ হয় কোন বদ খোয়াব দেখে আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না। আমি মশরুর খলিফার খাস বান্দা মশরুর, হুজুরের খেদমতের জন্যেই আমার জন্ম।'

আবু হাসান চিন্তিত হয়ে বলে, 'খলিফা কে?'

এবার এগিয়ে আসেন উজির জাফর, দুবার কুর্নিশ করে বলেন, 'জাঁহাপনা, ভুলে গেলেন যে আপনি, খলিফা হারুনুর রশিদ, হলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মশহুর বাদশা? আপনার সাক্ষাৎ পাবার আশায় দূর দূরান্ত থেকে কত প্রজা এসে দরবারে এন্তেজার করছে।'

আবু হাসান জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায়, এসব কি শুনছে সে? সে কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে? ব্যাপারটি ভালো করে বোঝার জন্যে তার কড়ে আঙুলটি এগিয়ে দেয় এক খিদমতগারের দিকে, 'এই, একটু কামড়ে দাও তো।' একজন বাঁদি তার আঙুলে জোরে কামড় দিতে সে চিৎকার করে ওঠে, 'রাখো, রাখো, লাগছে।' আবু হাসান ভাবে, ঘুমিয়ে থাকলে তো আঙুলে এভাবে ব্যথা পেত না। তাহলে সে তো জেগেই রয়েছে। তবে সে তো খলিফা হারুনুর রশিদ। তাহলে আবু হাসান কে? ভাবতে ভাবতে সে নিশ্চিত হল, না সে-ই খলিফা হারুনুর রশিদ। আবু হাসান নিশ্চয়ই অন্য কেউ। আবু হাসানকে সে বোধহয় স্বপ্নে দেখেছে, অনেকক্ষণ ধরে ঐ স্বপ্ন দেখার ফলে হয়তো নিজের খলিফা পরিচয় তার নিজেরই কাছে চাপা পড়ে গেছে।

এবার খিদমতগারদের সেবা যত্ন নিতে তার কোনো দ্বিধা হল না। হাম্মামে কয়েকজন বান্দা তাকে গোলাপ পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিল। তারপর তাদের দুজনের কাঁধে হাতের ভর দিয়ে আবু হাসান গেল দরবারে।

দরবারে যেতে যেতে সে একেবারে নিশ্চিত হল যে, সেই খলিফা হারুনুর রশিদ। দরবারে কয়েকজন কবিকে তার চেনা চেনা ঠেকলে সে পিটপিট করে তাদের দিকে তাকাল। আসলে সে তাদের দেখেছে বাগদাদের কয়েকটি মুশায়েরায়। এখন তার মনে হচ্ছে যে এরা তার দরবারের খাস শায়ের।

উজির তার হাতে একটি ফর্দ তুলে দিলে সে মনোযোগ দিয়ে তা পড়ে। এই ফর্দে বিভিন্ন প্রজার আরজি, ফরিয়াদ লেখা রয়েছে। কোন মামলার কি রায় দিতে

হবে, আজ কি কি ফরমান জারি করা দরকার তারও নির্দেশ চাওয়া হয়েছে এই ফর্দে। কিন্তু পড়া হলে ফর্দ পাশে সরিয়ে রেখে আবু হাসান বলে, 'আজ এসব থাক। চাঁদনি চকের দারোগাকে একটু এত্তেলা দিন।'

দারোগা এলে আবু হাসান হুকুম ছাড়ে, 'চাঁদনি চকে মুস্তফা পট্টির রমযান শেখ আর তার দুই সাগরেদকে পাকড়াও কর। ধাপ্পাবাজি করে লোকটা টাকার কুমির হয়ে বসেছে। গরিবের রক্ত-চোষা পয়সায় বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেয় আর ভাড়াটেদের ওপর দিনরাত জুলুম করে। ওকে আর ওর দুই শয়তান সাগরেদকে ধরে গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা মহল্লা ঘোরাবে, তারপর তিনটেকেই কতল করবে।'

ফৌজি সালাম দিয়ে দারোগা তার হুকুম তামিল করতে চলে গেলে আবু হাসান খাজাঞ্চিকে ডেকে হুকুম করে, 'চাঁদনি চকে মুস্তফা পট্টিতে থাকেন আবু হাসানের মা। মহিলা বড় নেকদার, কিন্তু গরিব। বায়তুল মাল থেকে এক হাজার দিনার তুলে তাঁকে দিয়ে এস। আমার রাজ্যে খেটে খাওয়া মানুষের ওপর যেন জুলুম না হয়, উজির জাফর, এদিকে খেয়াল রেখো।'

দরবার শেষ হতে হতে সন্ধ্যা। এবার প্রাসাদের খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল আবু হাসানকে। দাসদাসীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে। সোনার থালায় সাজান রয়েছে বিরিয়ানি, তার ওপর আস্ত দুম্বার রোস্ট। অন্যান্য থালায় মোরগ মুসল্লম, মাছের কাবাব, ভেড়ার গোশতের আফগানি কোরমা, খাসির গোশতের শাহি কাবাব, বটি কাবাব, সুতি কাবাব, কোফতা মেশানো পোলাও, পায়রার ঝোল, ভেটকি মাছের কাঁটা ছাড়ানো ভাজা এবং আরো সব খাবার আবু হাসান সব নামও জানে না। খিদমতগারদের মধ্যে কয়েকজন অপূর্ব সুন্দরী দাসীও ছিল। আবু হাসান খেতে খেতে তাদের নামধামও জিজ্ঞেস করল। এসব খাওয়া শেষ হলে বারকোষে করে দাসীরা নিয়ে এল কত মিষ্টি, ফিরনি, জরদা, পেস্তার বরফি, দুধের সরের নিচে সাজিয়ে রাখা গাজরের হালুয়া, কত রকমের মোরব্বা। এরপর আসে একটার পর একটা ফলের ঝুড়ি। আপেল, নাসপাতি, আঙুর, পিচ, তরমুজ, খরমুজ। আবু হাসান কি এত খেতে পারে? একটু একটু করে খেতেই তার পেট ভরে গেল। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের ঘরে। এখানে কি? না, রঙ বেরঙের শরাব। নানা স্বাদের, নানা ঝাঁঝের শরাব সে এক এক পেয়ালা চুমুক দিতে লাগল। খলিফা হারুনুর রশিদ তো আড়াল থেকে সবই দেখছিলেন। এবার তাঁর ইশারায় আবু হাসানের পেয়ালায় মিশিয়ে দেওয়া হল আফিমের ছোট এক টুকরা। এই পেয়ালায় চুমুক দিতেই আবু হাসান গালিচার ওপর শুয়ে পড়ল। তার খুব ঘুম পাচ্ছে। দেখতে না দেখতে আবু হাসান গভীর ঘুমে নেতিয়ে পড়ল।

খলিফা হারুনুর রশিদ মশরুরকে ডেকে হুকুম করলেন, 'মশরুর, আবু হাসানকে তুলে নিয়ে ওর মুস্তফা পট্টির বাড়িতে ওর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এস। দেখো কেউ যেন টের না পায়।'

পরদিন নিজের ঘরে আবু হাসানের ঘুম ভাঙল তখন বেলা গড়িয়ে দুপুর। চোখ বুঁজেই সে ডাকল, 'কৈ বাদিরা সব কোথায়?' সাড়া না পেয়ে চোখ মেলে

তাকিয়ে আবু হাসান দেখে কেউ নেই। একটু কড়া গলায় সে হাঁক দেয়, 'মশরুর। এই মশরুর।' কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে সে রাগ করে, 'মশরুর। এই হারামাজদা মশরুর।' না, তবু কোনো সাড়া নেই। আবু হাসান ভাবে, এদের ছাঁটাই করতে হবে। সে কি-না খলিফা হারুনুর রশিদ, আর তার এত ডাকাডাকি উপেক্ষা করে তার বান্দা ও বাঁদির দল? এবার আবু হাসান ডাকল উজিরকে, 'জাফর, জাফর, কোথায় গেল সব, এঁ্যা?' চারদিকে তাকিয়ে সে হতভম্ব হয়ে যায়। তাকে এখানে এনে ফেলল কে? কারা? এ তো তার প্রাসাদের কোনো কামরা নয়, এ এক পুরনো বাড়ির অগোছালো কোঠরি, চারদিকে ঝুল ঝুলছে ছাদ থেকে, দেওয়ালের চুন পলেস্তারা খসে পড়ছে, স্যাঁতসেঁতে মেঝে। এ কোথায় এসেছে সে? এবার রাগে আবু হাসান হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এই জাফর। এই মশরুর।'

কিন্তু তার উজির আসে না, বান্দাও আসে না, এদের বদলে ছুটে আসে তার মা। ছেলের মুখচোখের ভঙ্গি দেখে মা ভয় পান, বলেন, 'কি বাবা, খারাপ খোয়াব দেখে ভয় পেয়েছিস?'

'খোয়াব দেখছ তুমি, ডাইনি বুড়ি কোথাকার? খলিফা হারুনুর রশিদের সঙ্গে তুমি কথা বল এইভাবে? তোমার গর্দান থাকে কি করে আমি দেখব। কে আছ, দারোগাকে এত্তেলা দাও।'

'এসব কি বলছিস বাবা?' মা বললেন, 'খলিফা কোথায়? হায় হায় কি সব স্বপ্ন দেখে এরকম চ্যাচামেচি শুরু করলি? আমাকে চিনতে পারলি না? আমি তোর মা, আবু হাসানের মা। এখন বুঝতে পারছিস তো?'

আবু হাসান বলে, 'তুমি আবু হাসানের মা হতে পার, তাতে আমার কি? তুমি কাল এক হাজার দিনার পাওনি?'

'হ্যাঁ বাবা, খলিফার খাজাঞ্চি এসে আমাকে হাজার দিনারের তোড়া দিয়ে গেল। কাল কত কাণ্ড হল। তা তুই ছিলি কোথায় বাবা?'

আবু হাসান এবার নিশ্চিত হয় যে সে আসলেই খলিফা হারুনুর রশিদ, তার হুকুমেই তো মুস্তফা পট্টির আবু হাসানের মা এতগুলো টাকা পেয়েছে। মহিলার ওপর রাগে সে ফেটে পড়ে, 'নিমকহারাম বুড়ি, ডাইনি কোথাকার আমার হুকুমে এতগুলো টাকা পেয়ে আবার আমাকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিস এই এঁদো গলির নোনা-ধরা ঘরে, দাঁড়াও, তোমাকে কি করে শায়েস্তা করি, দেখো।' বলতে বলতে সে তার মার চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়। মা চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে আবু হাসান, আমি তোর মা,' এবার আবু হাসান দরজার পাশে রাখা ঘর বন্ধ করার হুড়কো দিয়ে মায়ের পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে মা চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকে, 'ওগো, কে আছ, দেখ, আমার আবু হাসান কিসব স্বপ্ন দেখে কি শুরু করেছে।'

তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে সামলায়। তারা সব হতভম্ব, এ কি, তাদের শান্তশিষ্ট ও একটু খেয়ালি ধরনের আবু হাসান এ কি করছে। মুরুব্বী

গোছের এক প্রতিবেশী বলেন, 'ছি, ছি, কালে কালে আর কি দেখব, মাকে ধরে ছেলে মারে, এ-ও দেখতে হল?'

'গর্ভধারিণী জননীকে প্রহার করলে তাকে রাজদণ্ড প্রদান করা উচিত।' পাড়ার বুড়ো শিক্ষক বললেন, 'একে কোতোয়ালের হস্তে সোপর্দ করা কর্তব্য।' এই শিক্ষক আবার কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে কথা বলেন। কিন্তু এতেও আবু হাসান ভয় পায় না, বরং উল্টে তেড়ে ওঠে, 'আমাকে কোতোয়ালের হাতে তুলে দেবে তুমি?'

'দেবই তো। কাল দারোগা এসে ঐ বেটা রমযান শেখকে ধরে নিয়ে গেল। রমযান শেখ আর ওর দুই চামচার গর্দান গেল কাল, এবার তোমার পালা।'

রমযান শেখ আর তার ইবলিসের মত দুই চেলার গর্দান যাওয়ার কথা শুনে আবু হাসান চিৎকার করে ওঠে, 'জান, কার হুকুমে ঐ শয়তানগুলোকে কতল করা হয়েছে? জান আমি কে?'

পাড়ার এক ছোকরা টিটকিরি দিয়ে ওঠে, 'জানব না কেন? তুমি হলে আমাদের চাঁদনি চকের মহামান্য আধপাগল আবু আল হাসান। মুস্তফা পট্টির হাসান পাগলা।'

'না!' গর্জন করে ওঠে আবু হাসান, 'আমি হলাম খলিফা হারুনুর রশিদ। সারা আরব জাহানের মালিক, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাদশা।'

'তওবা, তওবা' বলতে বলতে প্রতিবেশীরা তার মাকে আড়ালে ডেকে বলে, 'তোমার ছেলে তো পুরো পাগল হয়ে গেছে গো। একে মহল্লায় রাখলে বিপদ, এক্ষুনি পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিই।'

পাগলা গারদের কোতোয়াল সব শুনে রেগে টং। এরকম জোয়ান ছেলে তার মাকে ধরে মারে, এ জন্যে তো শাস্তি পাবেই। আরো বড় অপরাধ এই যে সে নিজেকে খলিফা হারুনুর রশিদ বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। তার হাতে পায়ে বেড়ি বেঁধে কোতোয়ালের হুকুমে পাগলা গারদের সেপাইরা তাকে ষাঁড়ের চামড়ার চাবুক দিয়ে এমন মারতে লাগল যে বেচারা আবু হাসানের পিঠ ফেটে লাল দগদগে দাগ পড়ে গেল। এই খবর পেয়ে ছুটে এল তার মা। ছেলের অবস্থা দেখে মা তো কেঁদেই অস্থির। কোতোয়ালের হাতে পায়ে ধরে ছেলেকে সে ছাড়িয়ে নিল।

ঘরে এসে পিঠের যন্ত্রণায় আবু হাসান না পারে শুতে, না পারে বসতে। বুড়ি মা রোজ মলম লাগায় ছেলের পিঠে, হেকিমের দাওয়াই এনে খাওয়ায়। আস্তে আস্তে আবু হাসান সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু পিঠের দাগ রয়েই যায়, সেখানে হাত দিলে এখনও ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

আবু হাসান এখন অন্য মানুষ। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও বেরোয় না। চুপচাপ ঘরে বসে শুধু ভাবে আর ভাবে। তার এ কি হল? ঐ রাত্রে মশুলের সওদাগর তার ঘরে এসে খানাপিনা করল, তারপর কোথেকে যে কি হল, সে কিছুই বুঝতে পারে না। মা বলে, ঐ সওদাগরের সঙ্গে কোন জিন ছিল, সেই জিনই তার সর্বনাশের গোড়া। তো তার মায়ের হাতে হাজার দিনার দিয়ে গেল কে?

তারপর সে তার মাকে ধরে মারধোর করল, এসব কিসের আসর হয়েছিল তার ওপর! এইসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে কোনো খেই পায় না। আবু হাসানের মা ছেলের এই চেহারা দেখে মন খারাপ করেন। একদিন বিকালে বলেন, 'বাবা, রাতদিন ঘরে বসে থাকলে ভালো মানুষেরও অসুখ করে। যা না, খালের ধার থেকে ঘুরে আয়।'

অনেক দিন পর খালের ওপর সাঁকোর সেই প্রিয় জায়গাটিতে বসে আবু হাসান পথচারীদের দেখে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলে উঠছে, রাস্তার দুই পাশের চেরাগ জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সরকারী লোক। লোকজন দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরছে, কেউ বা আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যাচ্ছে শহরের বাইরে নিজ নিজ বাড়ির দিকে। এর মধ্যে একজন লোক এসে দাঁড়ায় আবু হাসানের গা ঘেঁষে। লোকটির পরনে লম্বা আলখেল্লা, ঘাড়ে ঝোলানো একটি ঝোলা। তার দিকে তাকাতেই লোকটি বলল, 'আবু হাসান, আমাকে চিনতে পাচ্ছো না ভাই?' লোকটিকে চিনতে পেয়ে আবু হাসানের রক্ত শিরশির করে ওঠে, ভয়ে সে আর কথা বলতে পারে না, আরে এতো মশুলের ঐ সওদাগর। একে ঘরে নিয়ে আপ্যায়ন করার পরই তো ওর এত বিপর্যয়, এত হেনস্থা, এত বিপদ। সেই লোক আবার এসেছে? আবু হাসান সাড়া না দিলে লোকটি ফের বলে, 'ভাই আবু হাসান, আজ আবার আমি তোমার মেহমান হতে চাই। আমার তো এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই।'

'না, না।' আবু হাসান তাকে আর তার ঘরে নিয়ে যাবে না, 'আপনি আমাকে মাফ করুন। আপনার জন্যে আমার অনেক বিপদ গেছে। আপনাকে আমি ঘরে নিয়ে যেতে পারব না।'

এবারেও কিন্তু খলিফা হারুনুর রশিদই ঐ আগের ছদ্মবেশ ধরেই এসেছেন। তিনি বললেন, 'কেন ভাই এ আমি তোমার কি ক্ষতি করলাম? চল, তোমার ঘরে মেহমান হয়ে সব শুনব।'

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছদ্মবেশী খলিফার পীড়াপীড়িতে আবু হাসান তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু সে খুব ভয়ে ভয়ে আছে, লোকটিকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবু মেহমান তো। আবু হাসানের মাও ঘরে মেহমান এসেছেন শুনে খুশি, যাক, ছেলে আবার আগের মত হচ্ছে ভেবে তিনি সাধ্যমত রান্নাবান্না করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর দুই এক পেয়ালা শরাব পেটে গেলে আবু হাসানের মুখ খুলল। সে সব বলতে শুরু করল। ঐ যে একদিন সওদাগর তার ঘরে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তার ওপর জিনের আসর হয়। কি আজব খোয়াব দেখল সে, কোথায় খলিফার প্রাসাদে গিয়ে নিজেই খলিফা হারুনুর রশিদ বনে গেল। তারপর কি আজব উপায়ে ফের নিজের ঘরে ফিরল আল্লাহই মালুম। মাকে ধরে মারধোর করার কথাও সে বলল। তারপর পাগলা গারদে ষাঁড়ের চাবুক দিয়ে তার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে আবু হাসান কেঁদেই ফেলল। কামিজ খুলে সে তার পিঠ দেখালে খলিফা আফসোস করলেন, 'আহা, হাসান, এ

যে ঘা, এখনও ভাল করে শুকায় নি। তা ভাই আমার জন্যেই কি তোমার এত ভোগান্তি?'

আবু হাসান তো খলিফাকে এবারেও চিনতে পারে নি। সে বিরক্ত হয়েই বলল, 'তা ছাড়া আর কি, বলুন। আপনার সঙ্গে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করলাম, তারপর থেকেই যত আমার বিপদের পর বিপদ।'

আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো শয়তান জিন কি মাহাঙ্কাল ছিল, সেই এই সব অনিষ্টের গোড়া।'

খলিফা আবু হাসানের বিপর্যয়ে সত্যি অনুতপ্ত হলেন। এখন কি করা যায়? তিনি বললেন, 'হতে পারে, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে তো, খুব ভোরে আমি দরজা খুলে বাইরে চলে গেলে জিন হয়তো তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তা তুমি যে স্বপ্নে খলিফার প্রাসাদে গিয়েছিলে বলছ, ওখানে কোন বাঁদিকে তোমার ভালো লেগেছিল বল তো?'

'চুমকি বলে একটি মেয়ে ছিল, ভারি ভালো, দেখতেও সুন্দর, কথাবার্তাও মিষ্টি, যাক,' আবু হাসান বলল, 'যাক ওসব বাদ দিন, স্বপ্নে দেখা সুখের কথা বলতেই আমার ভয় করে।'

এদিকে কথা বলতে বলতে খলিফা আগেকার মতই আবু হাসানের শরাবের পেয়ালায় আফিমের একটুখানি টুকরা ফেলে দিলেন। আবু হাসান আজও ঘুমে ঢলে পড়ল। খলিফার ইশারায় তাঁর খাশ বান্দা ঘুমন্ত আবু হাসানকে নিয়ে সোজা হাজির হল খলিফার প্রাসাদে।

পরদিন সকালে মশরুর জাগিয়ে দিতেই আবু হাসান দেখে সে শুয়ে রয়েছে বাদশাহী বিছানায়। তার চারপাশে দাসদাসী, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে উজির জাফর। এইসব দেখে আবু হাসান ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আম্মা, আম্মা, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও। ঐ জিন আবার আমাকে আসর করেছে।'

'জাঁহাপনা, আপনি কি আবার আজ খারাপ খোয়াব দেখলেন? এবার উঠে পড়ুন, নামায কাযা হবে তো।'

'বেরিয়ে যাও, কে তোমাদের জাঁহাপনা? তোমাদের সর্দার সেই মণ্ডলের সর্দার আমাকে নিয়ে এ কি নিষ্ঠুর খেলা খেলছে?' অনুতাপে সে ভেঙে পড়ল, এত ভোগান্তির পর কেন সে আবার ঐ শয়তানটাকে ঘরে নিয়ে গেল?

'হুজুর, দরবারে সবাই এন্তেজার করছে। আজ অনেক ফরিয়াদি, অনেক মামলা।' জাফরের এই কথা শুনে তার ভয় আরো বেড়ে গেল, সবই তো আগের মত, সবই হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এই দৃশ্যকে সে অস্বীকার করে কি করে? ঐ তো সেই মেয়েটিকেও দেখা যাচ্ছে, আবু হাসান তাকে ডাকল, 'এই মেয়ে, তোমার নাম চুমকি না?'

'জি হাঁ, জাঁহাপনা। আপনার বাঁদির নাম চুমকিই বটে।' এই জবাব শুনে আবু হাসান দ্বিধায় পড়ে, সে কি স্বপ্ন দেখছে না জেগে রয়েছে জানার জন্যে চুমকিকে বলে, 'তুমি আমার কানটায় একটু চিমটি দাও তো।'

চুমকি এগিয়ে এসে এ্যায়সা জোরে এক চিমটি কাটে যে আবু হাসান ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে। তাহলে এসব সত্যি। সে ফের জিজ্ঞেস করে, আমি তোমাদের খলিফা হব কি করে? আমি তো আবু আল হাসান।'

'চুলোয় যাক মুস্তফা পট্টির আবু হাসান, ও তো পাগলা হাসান। আপনি আমাদের খলিফা হারুনুর রশিদ।'

আবু হাসান এবার সত্যি সাঙ্ঘাতিক দ্বিধায় পড়ল। সে কে? সে কি তবে আবু হাসান নয়? তার কোনটা স্বপ্ন? তার মাথা এলোমেলো হয়ে গেল, বিছানা থেকে নেমে সে অস্থির হয়ে পাগলের মত একবার নাচে,একবার হাসে, একবার কাঁদে।

পর্দার আড়াল থেকে এবার বেরিয়ে আসেন খলিফা হারুনুর রশিদ। এবার তিনি খলিফার বেশেই এসেছেন। কিন্তু আবু হাসান তাঁকে মশুলের সওদাগর ভেবে তাঁর দিকে তেড়ে আসে, 'এই যে, নিমকহারাম সওদাগর, আমাকে নিয়ে তুমি এ কি খেলা খেলছ? তুমি যত বড় শয়তানের বাদশা হও আল্লাহরাসূলের নাম নিয়ে এবার আমি তোমাকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব, দাঁড়াও।'

খলিফা হো হো করে হেসে ফেললেন; বললেন, 'আবু হাসান, রাজপ্রাসাদে এই পোষাকে আমাকে দেখেও তুমি চিনতে পারছ না?'

দাসদাসী, উজির সবাই বুঝল যে খলিফা তাঁর রহস্য আর রাখতে চান না। তারা তাঁকে কুর্ণিশ করলে আবু হাসানও তাই করল। খলিফা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার ভাই। আমি তোমাকে নিয়ে একটু মশকরা করতে গিয়েছিলাম, তাতে তোমার অনেক কষ্ট হল। দেখি এখন তোমার জন্য কি করতে পারি।'

তাঁর বেগম জুবেদাকে জিজ্ঞেস করে খলিফা জানতে পারলেন যে তাঁর সুন্দরী দাসী চুমকি একটু খ্যাপাটে ধরনের ও সরলচিত্ত যুবক আবু হাসানকে খুব পছন্দ করেছে। এরপর খলিফা বেশ শানশওকত করে আবু হাসানের সঙ্গে চুমকির বিয়ে দিয়ে তাঁর প্রাসাদেই এক জায়গায় তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঝড়

নীল সমুদ্রের বুকে একটি জাহাজ প্রবলভাবে দুলছিল। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, এখানে ওখানে বজ্রপাত ঘটছে, পাল খুলে ফেলার জন্য খালাসীদের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেছে। ভয়ে উদ্বেগে ত্রাসে যাত্রীরা জড়সড়, তাদের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। জাহাজে যাত্রী বেশি নেই, তবে যে কজন আছেন তাঁরা সব যে-সে মানুষ নন। এই জাহাজে আছেন নেপলসের রাজা অলনসো, তাঁর ভাই সেবাসতিয়ান, মিলানের দখলদার জমিদার আন্তোনিও, রাজপুত্র ফার্দিনান্দ, রাজার অনেক দিনের সভাষদ গনজালিও। আর আছে নাবিক ও খালাসিরা। এই ভয়ানক দুর্যোগে সবাই খুব বিচলিত। রাজা বল আর জমিদার বল কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। এত বড় বড় মানুষ, তা এরাও কিছু জানতে চায় তো নাবিকরা তাদের ধমক দিয়ে নিজ নিজ কামরায় গিয়ে চুপচাপ দোয়া করতে বলছে। শেষ পর্যন্ত আর রক্ষা হল না, দেখতে দেখতে জাহাজটি গভীর সমুদ্রের অতল তলে ডুবে গেল।

ওদিকে ছোট একটি দ্বীপে বাপের পাশে বসে মিরানডা নামে এক মেয়ে জাহাজডুবি দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে উঠছিল। তার বৃদ্ধ বাবা প্রসপেরো জাদুবিদ্যার রাজা। দ্বীপের পাহাড়ী গুহায় তাঁদের বাড়িঘর, এর একটি কামরায় জাদুর ওপর লেখা সব বইপত্র পড়ে প্রসপেরোর দিন কাটে, রাত্রেও তিনি কেবল বইই পড়েন। চোখের সামনে এতগুলো মানুষের সলিল সমাধি সহ্য করতে না পেরে মিরানডা বলেই ফেলল, 'বাবা, জাদু করে সাগরের পানি তুমি এরকম উত্তাল করে তুলেছ। তোমার পায়ে পড়ি, ঢেউয়ের গর্জন তুমি থামাও। ঐ জাহাজের যাত্রীদের কষ্ট দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছে বাবা, এদের তুমি বাঁচাও।'

প্রসপেরো মেয়েকে বড় ভালোবাসেন, এই মেয়েটি ছাড়া আপনজন বলতে তাঁর আর কেউ নেই। কিন্তু মেয়ের মিনতিতে সাড়া না দিয়ে তিনি কেবল বললেন, 'আমি কার কি করলাম? ঐ জাহাজ সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। যা জান না তা

নিয়ে কথা বল না। তোমার বাবা এই যে প্রসপেরো তার সম্বন্ধেই বা তুমি কি জান?'

তা মিরানডা সত্যি তেমন কিছু জানে না। এই দ্বীপে মানুষ বলতে সে আর তার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। সেই কবে ছোট্ট থাকতে বাবার সঙ্গে এখানে চলে এসেছে তার ভালো করে মনেও নেই। সে দেখেছে যে জাদুবিদ্যা দিয়ে প্রেতাত্মাদের বশ করতে তার বাবা খুব পটু। বাবার হাতে বন্দী সব প্রেতাত্মাদের একমাত্র কাজই হল তার হুকুম তামিল করা। বাবা সম্বন্ধে কৈ এর বেশি তো সে আর কিছুই জানে না।

আজ এই ঝোড়ো সন্ধ্যায় প্রসপেরোর কি হল মেয়ের কাছে হঠাৎ করে তিনি তাঁর আগের জীবনের গল্প বলতে শুরু করলেন। প্রসপেরো প্রথমে জিজ্ঞস করলেন, 'মিরানডা, খুব ছেলেবেলার কথা তোমার কিছু মনে পড়ে?'

'না বাবা। আবছা আবছা মনে হয়, চার পাঁচজন মহিলা আমার আদর যত্ন করছেন।'

'না, আরো বেশি লোক তোমার সেবাযত্ন করত। বারো বছর আগে আমি ছিলাম মিলানের জমিদার। মস্ত জমিদারি ছিল আমার। আমি তো কেবল পড়াশোনা করতেই ভালোবাসতাম, শুধু বইপত্র নিয়েই আমার দিন কাটত। জমিদারি দেখাশোনার ভার দিয়েছিলাম আমার ভাই আন্তোনিওর ওপর। কিন্তু নিজের ভাই হলে কি হবে, জমিদারি দখল করার জন্যে আন্তোনিও মেতে উঠল। নেপলসের রাজার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না, তাঁর সঙ্গে যোগসাজস করে তাঁর সাহায্য নিয়ে আন্তোনিও নিজেই জমিদার বনে গেল।'

কথা শুনতে শুনতে মিরানডা বিস্ময়ে হতবাক, বাবা সম্বন্ধে সে এসব কিছুই জানত না। তার চোখের পলক পড়ে না। প্রসপেরো বললেন, 'কি হল? আমার কথা শুনছ তো?'

'শুনছি বাবা। তোমার এই কথা শুনলে কালারও কান খুলে যায়। তারপর?'

'আন্তোনিও সমস্ত জমিদারি নিজের নামে করে নিল। রাজা ওর পক্ষে, আমি আর কি করতে পারি,' প্রসপেরো ফের বলতে শুরু করলেন। 'একদিন মধ্যরাত্রে ঘোরতর অন্ধকারের ভেতর আন্তোনিও বেঈমান কয়েকজন সৈন্যকে দিয়ে মিলান থেকে আমাদের বের করে দিল। প্রজারা আমাকে খুব ভালোবাসত বলে তোমাকে কিংবা আমাকে প্রাণে মারতে সাহস করেনি। আমাদের দুজনকে নিয়ে আন্তোনিও আর তার দলবল জাহাজে উঠল। মাঝ সমুদ্রে এসে একটা ছোট্ট নৌকায় আমাদের দুজনকে তুলে ভাসিয়ে দিল মহাসমুদ্রের পানিতে।'

'তারপর?' ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করে মিরানডা, 'আমরা এখানে ভীড়লাম কি করে?'

'খোদার দয়ায়। নেপলসের একজন রাজসভাষদ ছিলেন গনজালিও, রাজার সঙ্গে থাকলেও লোকটার মনটা ভালো। তিনিই দয়া করে সঙ্গে কিছু খাবার দিয়েছিলেন, কাপড়চোপড় আর খাবার পানিও তুলে দিয়েছিলেন। আর আমার

লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়েছিলেন বেশ কিছু বই। ঐসব বইয়ের দাম আমার জমিদারির চেয়ে অনেক বেশি।'

'বাবা, ঐ দুর্যোগের সময় আমি তোমাকে কি কষ্টটাই না দিয়েছি।' মিরানডার এই কথায় প্রসপেরো হাসলেন, 'কি যে বল। সেই নোনা পানির অথৈ সমুদ্রে তোমার হাসিই আমার কাছে ছিল বেহেশতের আলো। মা, তুমি ছিলে বলেই আমি বেঁচে ছিলাম।' তাঁর আলখেল্লা পরে নিতে নিতে প্রসপেরো বললেন, 'এবার শেষটা শোন। ঐ ছোট্ট নৌকাটা ভিড়ল এই নির্জন দ্বীপে। এখানেই বড় হলে তুমি। তোমার বাবা বল, মা বল, শিক্ষক বল সবই হলাম আমি। এখানে এসে তোমার বরং লাভই হয়েছে, রাজকন্যাদের শিক্ষকগণ কি পড়াবার জন্যে এত অঢেল সময় পায়?'

নিজেদের পরিণতির কথা শুনতে শুনতে মিরানডা অভিভূত হয়ে পড়ছিল। সে জানতে চাইল, 'কিন্তু বাবা, আজকের এই ঝড়ের কারণটা কি? জাহাজে কারা আছেন?'

প্রসপেরো বললেন, 'শুধু এইটুকু বলি, আজকের দুর্ঘটনায় আমাদের শত্রুরা এই দ্বীপে এসে পড়েছে।'

গল্প শুনতে শুনতে মিরানডার ঘুম পাচ্ছিল। প্রসপেরোও চাইছিলেন যে মেয়ে তাঁর ঘুমিয়ে পড়ুক। তাঁর এখন অনেক কাজ।

বাইরে এসে প্রসপেরো ডেকে আনলেন দৈত্য এরিয়েলকে। এইসব দৈত্যদানো, প্রেতাত্মা সবাই প্রসপেরোর বশ, এরা সবাই তাঁর দাস, তাঁর কথায় ওঠে বসে, এরা তাঁর সেবাতেই নিয়োজিত। তাঁর হুকুমে সমুদ্রে ঝড় তুলেছে এরিয়েল, জাহাজডুবির কাজটাও সম্পন্ন করেছে সে-ই। প্রসপেরো বললেন, 'সব কাজ ঠিকঠাক করা হয়েছে?'

"জী। এখন সব ভাল। ঝড় শুরু করলে প্রত্যেকেই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। রাজপুত্রের চুল একেবারে কাঁটার মত খাড়া হয়ে যায়। জাহাজে লাফ দিয়ে উঠে রাজপুত্র চিৎকার করে উঠলেন, 'দোযখ ফাঁকা করে দিয়ে সব শয়তান এখন এখানে।'"

প্রসপেরো তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন? এখন সবাই নিরাপদ তো?'

'কারো একটি চুলও নষ্ট হয়নি, বরং আগের চেয়ে সবাই আরো তাগড়া হয়ে গেছে। রাজপুত্রকে ডাঙায় তুলেছি আমি নিজে। দ্বীপের এক কোণে নিরাপদে রেখে দিয়েছি। রাজা আর তাঁর সঙ্গীদের রেখে দিয়েছি আর এক প্রান্তে। তাঁরাও ভালো আছেন। জাহাজটিও ঘাটে নোঙর করা রয়েছে।' তার কৃত কর্মের বিবরণ দিয়ে এরিয়েল মাথা নুয়ে নিবেদন করল, 'হুজুর আপনার সব হুকুমই তো তামিল করেছি। এবার আমাকে মুক্তি দিন।'

প্রসপেরো কিন্তু তখন তাকে মুক্তি দেবেন না, তাকে দিয়ে তাঁর আরো কাজ করাতে হবে। তিনি খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এখনি যেতে চাও? বললেই হল? তুমি কি ভুলে গিয়েছ কি অবস্থা থেকে তোমাকে আমি উদ্ধার করেছি?'

সে কথা কি এরিয়েল ভুলতে পারে? আজ থেকে বার বছর আগে নৌকায় আসতে আসতে শিশুকন্যাকে নিয়ে প্রসপেরো যখন এই দ্বীপে এসে নামলেন তখন এখানে বাস করত সাইকোরাক্স নামে এক ডাইনি। আলজিয়ারের এই ডাইনির উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে নাবিকরা তাকে ধরে বেঁধে এই জনশূন্য দ্বীপে ফেলে যায়। এখানে মানুষজন না পেয়ে সাইকোরাক্স সব দত্যিদানো প্রেতাত্মা ধরে তাদের বন্দী করে অসহ্য যন্ত্রণা দিত। এরিয়েলকে সে আটকে রেখেছিল একটা গাছের সঙ্গে, সাইকোরাক্সের অত্যাচারে নিদারুণ যন্ত্রণায় দিনরাত সে কেবল চিৎকার করত। প্রসপেরোই তাকে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন।

রাগে লাল হয়ে প্রসপেরো ধমক দিলেন, 'তুমি যদি ফের বিড়বিড় কর একটা ওক গাছ ফেড়ে তার ভেতর তোমাকে এমনভাবে গেঁথে রাখব যে বারটি বছর ওখানে বন্দী থেকে তুমি কেবল হামলাতে থাকবে।'

এরিয়েল এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেল, মাথা নুয়ে বলল, 'হুজুর, এবারকার মত আমাকে মাফ করে দিন। আপনার যা হুকুম করার করুন, আমি সব তামিল করব।'

'মনে থাকে যেন।' সাবধান করে দিয়ে প্রসপেরো তাকে একটি জলপরির আকার নিতে আদেশ দিলেন। তারপর কি কি করতে হবে বলে দিয়ে ফের সতর্ক করে দিলেন, 'খবরদার, আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। অদৃশ্য থেকে কাজ করা চাই।'

এরিয়েল চলে গেলে প্রসপেরো ডাকলেন ক্যালিবানকে। এ হল সেই অত্যাচারী ডাইনি সাইকোরাক্সের কদাকার পুত্র। এর মাকে শায়েস্তা করার পর প্রসপেরো একে সম্পূর্ণ নিজের বশে রেখেছিলেন। কাঠ কেটে আনা থেকে সব পরিশ্রমের কাজ তিনি করিয়ে নিতেন একে দিয়ে। ক্যালিবান সব সময় বড্ড অসন্তুষ্ট হয়ে থাকত, তার ক্ষোভ ছিল এই যে, মায়ের পর এই দ্বীপের মালিক তো সেই হত। প্রসপেরো এসে তার রাজত্ব দখল করে নিয়েছে, তাকে রেখেছে বন্দী করে। আবার এরিয়েলও তাকে দেখতে পারত না, সাইকোরাক্স এককালে তার ওপর যে নির্যাতনটা করেছে তার শোধ সে তুলতে চাইত তার ছেলের ওপর। সুযোগ পেলেই এরিয়েল নানা আকার ধারণ করে ক্যালিবানকে কষ্ট দিত, তাকে মুখ ভ্যাংচাত।

প্রসপেরোর ডাকে খুব বিরক্ত হয়ে এসেই ক্যালিবান একচোট অভিশাপ দিল। প্রসপেরো বললেন, 'দাঁড়াও, আজ রাতে তোমার কি হাল করি দেখ।'

ক্যালিবান বলল, 'তুমি আমাকে ভাষা শিখিয়েছ। তোমার কাছেই শিখেছি যে দিনে যে মস্ত আলো জ্বলে তার নাকি নাম আছে, রাতের ছোট বাতিটিরও কি একটা নাম তুমি শিখিয়েছ।' ক্যালিবান আসলে সূর্য আর চাঁদের কথা বোঝাচ্ছিল। তারপর সে চিৎকার করে উঠল, 'তোমার শেখানো ভাষাতেই আমি অভিশাপ দিই, তোমরা সব ব্যারাম হয়ে মর।'

এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রসপেরো বললেন, 'চুপ। বেয়াদব কোথাকার। যাও এক্ষুনি কাঠ কেটে আনো। কথা না শুনলে তোমার হাতের গিঠে গিঠে এমন ব্যথা ওঠাব যে তোমার চিৎকারে বনের জানোয়ারও কাঁদবে। ভয় পেয়ে ক্যালিবান প্রসপেরোর হুকুম তামিল করতে রওয়ানা হল।

ওদিকে অদৃশ্য জলপরি হয়ে মধুর সুরে গান করতে করতে এরিয়েল ডেকে আনছিল রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে।

এই যে এদিকে হলুদ বালির পর
এসো, এসো, এসো, হাত ধরো তারপর,
কুরনিশ হলো, দিলে চুম্বন
খেপা তরঙ্গে চাপা আলোড়ন
এখানে ওখানে নিশ্চিতে ফেলো পা
ভার তো বইবে মধুর প্রেতাত্মা।

ফার্দিনান্দ ভাবছিল সমুদ্রের জলরাশি থেকে কেউ বুঝি গান করছে। সে জানে তার বাবা আর তাঁর সঙ্গীরা সব জাহাজডুবিতে মারা গেছে। অদৃশ্য পরির গলায় গাওয়া এরিয়েলের জাদুকরি গান অনুসরণ করে সে এসে পৌছল একটা গাছের নিচে, সেখানে বসে রয়েছে প্রসপেরো আর মিরানডা।

মিরানডা বাবা ছাড়া জীবনে আর কোনো মানুষ চেনে না। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল রাজপুত্রের দিকে। তারপর বাবার গলার স্বরে চমকে উঠে বলল, 'বাবা, এ তো ভারি সুন্দর দেখতে। এ কি দৈত্য না আত্মা?

'না মা, এ হল মানুষ। আমাদের মতই খায়, ঘুমায়। এই যুবকটিকে তুমি ঝড়ের সময় জাহাজে দেখেছ, চিনতে পারলে না?'

আবার ফার্দিনান্দও এই বিজন দ্বীপে এমন রূপসী দেখে হতবাক। সে নিশ্চিত হল, সে নিশ্চয়ই কোনো জাদুর দ্বীপে এসে পড়েছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনো দেবী। মাথা নুয়ে সে বলল, 'দেবী, আপনি ...।' মিরানডা তাকে শুধরে দিল, 'না না আমি একজন মানবী।' এখন ফার্দিনান্দ কি বলবে বুঝতে পারছে না। তার দুর্ভাগ্যে মিরানডা বেশ ভেঙে পড়েছে, ফার্দিনান্দও মিরানডার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে প্রসপেরো ভেতরে ভেতরে খুশি। কিন্তু এই ছেলেকে বিশ্বাস কি? এর বাবা নেপলসের রাজা তো তার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করেনি। একে একটু বিপদে না ফেললে একে পরীক্ষা করবেন কি করে? তিনি তাই এগিয়ে এলেন। রাগী গলায় ফার্দিনান্দকে বললেন, 'তুমি তো একটা আস্ত ভণ্ড হে। এখানে কার গুপ্তচর হয়ে এসেছ? দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। তোমার গলার সঙ্গে তোমার হাতপা বেঁধে রাখব। তোমাকে শুধু শামুক আর গাছের শেকড় খেয়ে থাকতে হবে। তোমাকে খেতে হবে সমুদ্রের পানি।'

মিরানডা বাবার দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলল, 'কেন বাবা, এত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? ওকে ছেড়ে দাও বাবা। এত সুন্দর মানুষ কি কখনো খারাপ হতে পারে?'

ফার্দিনান্দ অবশ্য ভয় পাবার ছেলে নয়। প্রসপেরোর কথা শোনবার পরপরই সে তলোয়ার বের করল খাপ থেকে। জাদুর বলে প্রসপেরো তাকে তার জায়গায় স্থির করে রাখলেন, তার আর নড়াচড়া করার শক্তি রইল না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রসপেরো রাগে ফেটে পড়লেন, 'মিরানডা, এই গুপ্তচরটার হয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না। জীবনে কটা মানুষ তুমি দেখেছ? এর চেয়ে হাজার গুণে ভালো মানুষ পৃথিবীতে মেলা আছে।'

'এর চেয়ে ভালো মানুষ দেখার ইচ্ছা আমার নেই বাবা।' মিরানডার এই কথা শুনে প্রসপেরো ফার্দিনান্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খবরদার আমার অবাধ্য হবার চেষ্টা কর না। এখন ইচ্ছা করলেও তুমি কিছু করতে পারবে না।'

ফার্দিনান্দ অবাক হয়ে ভাবছিল সত্যি সে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে অদৃশ্য কেউ তার সমস্ত বল হরণ করে নিচ্ছে। তার কেবলি ইচ্ছা করছিল এই বন্দিত্ব থেকে এক দিনের জন্যে মুক্তি পেলেও এই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে সময়টা কাটাতে পারে। কিন্তু এখন তার কিছুই করার নেই। প্রসপেরো তাকে একটি শক্ত কাজ করার হুকুম দিলেন। খুব ভারী ভারী কাঠ কেটে আনার কাজ তার ওপর চাপিয়ে প্রসপেরো সরে পড়লেন।

ওদিকে দ্বীপের অন্য প্রান্তে জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত রাজা অলনসো, তাঁর ভাই সেবাসতিয়ান, প্রসপেরোর ভাই আন্তোনিও, রাজার সভাষদ গনজালিও এবং তাঁদের অন্য সঙ্গীরা কম অবাক হন নি। এত বড় জাহাজ দুর্ঘটনার পরও তাঁরা এরকম অক্ষত রইলেন কি করে? তাঁদের গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। আবার এরই ভেতর এরিয়েল অদৃশ্য অবস্থায় গনজালিওর কানে কানে গানের সুর ভাঁজছিল একটু একটু করে। এই অপরিচিত জায়গাতেও সবাই বেশ স্বস্তিতেই ছিলেন।

কষ্ট বরং হচ্ছিল মিরানডার। ফার্দিনান্দকে অমন ভারী ভারী কাঠ তুলতে দেখে বেচারীর মনটা একেবারে ভেঙে যাচ্ছিল। এমন রূপবান ও কোমলদেহ যুবককে দিয়ে তার বাবা কি-না এরকম কষ্টের একটি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। ফার্দিনান্দকে রেহাই দেওয়ার জন্যে সে এগিয়ে এল, বলল, 'আমার বাবা এখন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে তুমি বরং কয়েক ঘণ্টা একটুখানি জিরিয়ে নাও।'

কিন্তু ফার্দিনান্দের সাহস হচ্ছিল না। মিরান্দা তাকে ফের অভয় দিয়ে বলল, 'তুমি একটু বসো। কয়েকটা কাঠ না হয় আমি কেটে দিই।'

ফার্দিনান্দ কি তাই পারে? মিরানডাকে কষ্ট করতে দেখলে সেও সহ্য করতে পারবে না। দুজনেই তখন শুধু গল্প করতে লাগল। মিরানডা তাকে সাহায্য করবে কি, বরং সে থাকায় ফার্দিনান্দের কাজ একটুও এগোচ্ছিল না।

আড়াল থেকে প্রসপেরো কিন্তু সবই দেখছিলেন। দুজনের মেলামেশা দেখে ভেতরে ভেতরে তিনি খুব সন্তুষ্ট। তিনি শুধু পরীক্ষা করতে চান ফার্দিনান্দ তাঁর মেয়েকে কতটা ভালোবাসে। সত্যি ফার্দিনান্দ তার মেয়ের সঙ্গে এত সুন্দর করে কথা বলছিল যেমন করে শুধু রাজকুমাররাই বলতে পারে। হঠাৎ করে প্রসপেরো

তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, তোমরা গল্প কর, আমি আসছি, একটু কাজ আছে।'

সরে গিয়ে প্রসপেরো ডেকে পাঠালেন এরিয়েলকে। তাঁর হুকুমে এরিয়েল দ্বীপের অন্য প্রান্ত থেকে রাজা অলনসো, প্রসপেরোর ভাই আন্তোনিও, রাজ সভাষদ গনজালিও এবং তাঁদের অন্য সঙ্গীদের প্রসপেরোর সামনে হাজির করল। প্রসপেরো কিন্তু অদৃশ্য থেকেই রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, 'মহারাজ, যে জমিদারের প্রতি আপনি অন্যায় ব্যবহার করেছেন সেই প্রসপেরোকে দেখুন। আপনাকে আমি স্বাগত জানাই।'

হতভম্ব হয়ে রাজা বললেন, 'কণ্ঠস্বরে আপনাকে তো রক্তমাংসের মানুষই মনে হচ্ছে। আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই। কিন্তু প্রসপেরো এখনো বেঁচে থাকবেন কি করে?'

প্রসপেরো তখন গনজালিওর সামনে নিজেকে সশরীরে প্রকাশ করলেন। তারপর একে একে সবাই তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে আন্তোনিও হাত জোড় করে ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন। রাজা বললেন, 'সবই তো ভালো হল। কিন্তু আমার ছেলেটিকে হারালাম।' তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'এই ক্ষতি আমার জীবনভর বইতে হবে।'

রাজাকে সরাসরি কিছুই না জানিয়ে প্রসপেরো তাঁদের সবাইকে তাঁর গুহাগৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে একটি উপহার দিতে চাই।'

ভেতরে ঢুকে রাজা যা দেখলেন তা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য। খুশিতে, আনন্দে তিনি একেবারে অভিভূত। তিনি দেখলেন যে যুবরাজ ফার্দিনান্দ অপূর্ব সুন্দরী একজন দেবীর সঙ্গে বসে দাবা খেলছে। মিরানডাকে তিনি দেবী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। মিরানডাও এতগুলো মানুষকে চোখের সামনে দেখে খুশিতে চিৎকার করে উঠল, 'কি আশ্চর্য। এতসব মহৎ প্রাণী এই পৃথিবীতেই বাস করে!'

মিরানডাকে রাজা তখনও মানুষ বলে কল্পনাও করতে পারেন নি, তিনি বললেন, 'এই দেবীই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল?'

'না। তা নয়।' ফার্দিনান্দ এগিয়ে এসে বললেন, 'এ একজন নারী। বাবা, একে স্ত্রী বলে গ্রহণ করব বলে আমি স্থির করেছি। আগেই আপনার অনুমতি নিতে পারি নি, আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনি বেঁচে আছেন।'

রাজা একটুও রাগ করলেন না। তিনি বরং মহা খুশি। দেবীর মত এই মেয়েটি তাঁর পুত্রবধূ হবে এই খুশিতে তিনি বলে উঠলেন, 'মিরানডা তো তাহলে আমার মেয়ে।' একটু থেমে তিনি ফের একটু আফসোস করলেন, 'আমার কপাল। নিজের মেয়ের কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'দরকার নেই,' প্রসপেরো তাঁকে ভরসা দিলেন, 'ওসব পুরনো কথা মনে করার কোনো দরকার নেই।'

আন্তোনিও লজ্জায়, অনুতাপে কাঁদতে লাগলেন। গনজালিও চোখের পানি চেপে রাখতে পারছিলেন না।

প্রসপেরো সবাইকে জানিয়ে দিলেন, 'ঘাটে তোমাদের জাহাজ নোঙর করা রয়েছে। পরদিন পাল তুলে জাহাজ রওয়ানা হবে, সবাই ঐ জাহাজে এই দ্বীপ থেকে চলে যাব।' তিনি নিজের কথা বললেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে মিরানডাকে নিয়ে রওয়ানা হচ্ছি।'

এই দ্বীপে মেয়েকে নিয়ে বারটি বছর কাটল তাঁর। জনমানবহীন দ্বীপের অধিবাসী সব দৈত্যদানো আর প্রেতাত্মারা ছিল তাঁর বন্দী, তাঁদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন তিনি। বিদায় নেওয়ার আগে তিনি তাদের সবাইকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিলাভের আনন্দে এরিয়েল গান গেয়ে উঠল,

মধু খাব আমি যেখানে যেখানে মধু চোষে মৌমাছি
কাঠটগরের পরাগে কেশরে আমি আছি ঠিক আমি আছি।
প্যাঁচারা চ্যাঁচায় আমি গা এলিয়ে শুই যে আমার সুখের হাল
গরমের শেষে বাদুড়ের পিঠে মহাসুখে আমি দিই উড়াল।
শাখা ও প্রশাখা ডালপালা থেকে ফুলকুঁড়ি সব ঝুলন্ত
তার তলে আমি থাকি মহাসুখে, আমার কেবলি আনন্দ।

ক্যালিবানকে মুক্তি দিলে সে বলল, 'আসলে আমি একটা গাধা ছিলাম। এখন থেকে আমি ভালভাবে চলব, আর কারো ওপর কোনো অন্যায় করব না।' প্রসপেরোকে সে কথা দিল যে তার চেহারা আর প্রকৃতি দুটোই সে শোধরাবার চেষ্টা করবে।

প্রসপেরো দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। নেপলসে গিয়ে তিনি আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে জীবনযাপন করবেন, এইসব জাদুবিদ্যা দিয়ে সেখানে তিনি কি করবেন? জাদুর বই তিনি মাটিতে পুঁতে ফেললেন। বন্দীদের তিনি মুক্তি দিয়েছেন, অপরাধীদের ক্ষমা করেছেন। এখন তিনি নিজে কি চাইলেন? তিনি সবার ভালবাসা প্রার্থনা করলেন। প্রসপেরো বললেন,

জাদুমন্ত্র বিসর্জন দিয়ে আমি নিজ শক্তিবলে
জীবন কাটাবো সেই শক্তিটুকু প্রায় অস্তাচলে।
আমার মার্জনা পেয়ে তোমাদের নিষ্কৃতি হয়,
আমার মুক্তি ঘটে পেলে তোমাদের প্রশ্রয়।

ডেভিড কপারফিল্ড

আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্মের ছ'মাস আগে আমার বাবার চোখ থেকে এই পৃথিবীর আলো চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছিল, তিনিও আমাকে দেখেননি। আমার একটু একটু মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলায় আমার বাবার কথা ভেবে আমার ভয়ানক খারাপ লাগত, মনে হত, আমরা এই আলো ঝলমল ঘরে আগুনের উত্তাপে বসে রয়েছি আর গীর্জার প্রাঙ্গণে অন্ধকার কবরে একা শুয়ে রয়েছেন আমার বাবা।

আমি থাকতাম আমার মায়ের সঙ্গে। মা হালকা গড়নের মহিলা, আমার এক দাদী তাঁকে বলতেন মোমের পুতুল। মোমের পুতুলের মতই নরম। মার স্বভাবটিও কোমল প্রকৃতির, তিনি কখনো রাগ করতে পারতেন না। আমাদের বাড়িতে কাজ করত পেগোটি বলে একটি মেয়ে, ওর সঙ্গেও মাকে কোনদিন উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি। পেগোটি থাকত আমাদের পরিবারের একজন হয়ে, আমাদের খেলাধুলা সব একসঙ্গে, খাওয়াদাওয়াও একসঙ্গে, একই টেবিলে। পড়াশোনা আমি করতাম মায়ের কাছেই, মায়ের কাছে লেখাপড়ার ব্যাপারটা খেলাধুলার মতই ভালো লাগত। মা আর পেগোটির সঙ্গে আমার বেশ ভালোই কাটছিল।

আমার এই ছিমছাম সুখের জীবনে প্রথম ধাক্কা আসে আমার আট বছর বয়সে। মা একদিন ফের বিয়ে করলেন। আমার সৎবাবা মার্ডস্টোন সাহেব দশাসই পুরুষ, তাঁর মস্ত জুলফি, পুরু গোঁফ এবং জোড়া ভুরু। তাঁকে দেখে প্রথম থেকেই আমার ঠিক নিজের লোক বলে মনে হয়নি। এর ওপর আমাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন তাঁর বোন। ভাইবোনের চেহারায় খুব মিল, গলার স্বরও প্রায় একই রকম। মেয়েমানুষ হওয়ায় তাঁর গোঁফ ছিল না বটে, তবে বাজখাঁই গলার স্বরে এই অভাবটি সুদেআসলে মিটে গিয়েছিল। ভাইবোনের স্বভাবও একইরকম— যেমন মার্ডস্টোন সাহেব তেমনি তাঁর বোন—দুজনেই কড়া মেজাজের মানুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমি তাঁরা বরদাশত করতে পারতেন না, আসার পর থেকেই

আমার কাথাবার্তায়, আদব কায়দায় খুঁত বার করার জন্য একেবারে হন্যে হয়ে উঠলেন।

এমন কি আমার লেখাপড়া শেখাবার কাজটিও মার্ডস্টোন সায়েব নিজের হাতে নেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আমি কিন্তু কোন ব্যাপারেই তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইতাম না, পড়াশোনা করে পড়া দিতে যেতাম মাকেই। কোথাও আটকে গেলে মা আদর করে বলতেন, 'বাবা ডেভি, মনে করতে পারছ না? একটুখানি চেষ্টা করে দেখ তো।'

মার্ডস্টোন সাহেব কর্কশ গলায় বলতেন, 'আঃ। ক্লারা, ওভাবে বললে হবে না।'

মার্ডস্টোন সাহেবের বোনও একই রকম কণ্ঠে ভাইয়ের সমর্থনে এগিয়ে আসতেন, 'সোজা বলে দাও, পড়া মুখস্থ করে আসুক।'

এখন তাদের মুখের ওপর কিছু বলা আমার মায়ের সাধ্যে কুলায় না। আমি আবার বই নিয়ে বসি। কিন্ত মুশকিল হল এই যে, মায়ের কোল ঘেঁষে বসে যে কাজটি আমি পানির মত সহজ করে বুঝতে পারি, যে পড়া অবলীলায় বলে যাই, মার্ডস্টোন সাহেব কি তাঁর বোন সামনে থাকলে সেটি আর হয়ে ওঠে না। মার্ডস্টোন সাহেব জিজ্ঞেস করলে আমার জানা অংক ভুল হয়, মুখস্থ পড়া ভুলে যাই। ভাইবোন মিলে আমার ওপর ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন, আমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শ চলতে লাগল। এই ব্যাপারে মা তেমন সায় দিতে পারেননি। বোধ হয় এর ফলেই আমার ওপর মার্ডস্টোন ভাই-বোনের রাগ আরো চড়ে যেতে লাগল।

ঠিকমত পড়া দিতে পারলেও তাঁদের মন পাওয়া যায় না, মার্ডস্টোন সাহেব এমন সব কঠিন অংক কষতে দিতেন যে আমার একেবারে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হত। তাঁদের এড়িয়ে চলার জন্য আমি গিয়ে ঢুকতাম আমার ঘরের লাগোয়া ছোট ঘরে, এখানে আমার বাবার কয়েকটি বই স্তূপ করে রাখা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এসব কেউ ছুঁয়েও দেখত না। এখানে একা একা বসে আমি 'রডারিক র‍্যানডম,' 'টম জোনস,' দি ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড,' 'ডন কুইকসোট,' 'রবিনসন ক্রুসো,' 'আরব্য রজনী'—এসব বইপত্র পড়তাম। কিন্তু মার্ডস্টোন সাহেবের হাত থেকে তবু আমার রেহাই নেই। আর আমার এমন অবস্থা যে তাঁর হাতে পড়লেই পড়া আর বলতে পারি না।

আমাকে শায়েস্তা করার জন্য আমার সৎবাবা একদিন ঘরে বেত নিয়ে এলেন। ছেলেদের গায়ে বেত তোলা আমার মায়ের একটুও পছন্দ নয়। কিন্তু মার্ডস্টোন সাহেবের ধারণা, 'বেত না মারলে ছেলেদের মানুষ করা যায় না। বেতের বাড়ি আমিও কম খাইনি।'

'তাতে তোমার কিছু লাভ হয়েছে?' মায়ের এই কথা শুনে মার্ডস্টোন সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাতে কি আমার ক্ষতি হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।' মায়ের এই জবাবে আমার চোখের কোণে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। তাই লক্ষ করে মার্ডস্টোন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ডেভিড, এখন থেকে ভালো ছেলে হওয়ার চেষ্টা করো।'

আমি প্রাণপণে পড়াশোনায় মনোযোগ দিই, মুখস্থ পড়া বারবার পড়ি, কিন্তু ওঁদের সামনে দেখলেই ভয়ে সব ভুল হয়ে যায়। একদিন এমনি কি ভুল হয়ে গেল, মার্ডস্টোন সাহেব আমার ঘরে ঢুকলেন হাতে বেত নাচাতে নাচাতে। পেছনে তাঁর বোন। প্রায় ফৌজি কায়দায় দুজনকে ঢুকতে দেখে মা ভয়ে কাঁপছিলেন। আমার ওপর হঠাৎ করে বেতের বাড়ি পড়তে শুরু করলে আমি চিৎকার করে বললাম, 'পায়ে পড়ি, মারবেন না, মারবেন না। আমি তো আজ সারাদিন ধরে পড়লাম, আপনাদের দুজনকে দেখেই সব ভুলে গিয়েছি, আপনাদের দেখলেই আমার জানা পড়া গুলিয়ে ফেলি।'

'তাই?' বাজখাঁই গলায় মার্ডস্টোন সাহেব বললেন, 'সব গুলিয়ে ফেল, না? দেখি কি করে মনে রাখতে পার, সেই ব্যবস্থা করি।'

আমার মাথাটা তিনি আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি মাথা গলিয়ে তাঁর হাত থেকে মুক্ত হলে তিনি আমার মুখ চেপে ধরে পিঠে সপাং সপাং করে বেতের কয়েকটা ঘা মারলেন, আমি আর সহ্য করতে না পেরে আমার মুখে চেপে ধরা তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলে এ্যায়সা জোরে এক কামড় বসিয়ে দিলাম যে যন্ত্রণায় তিনি একেবারে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর আসল মার, বেতের মুহুর্মুহু আঘাতে আমার শরীর একেবারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম আজ আমি একেবারে মরেই যাব। মারতে মারতে মার্ডস্টোন সাহেবও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার ঘরে আমাকে ঠেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল, কিন্তু ঘরে আমার একটি বাতিও জ্বলল না। এর মধ্যে মিস মার্ডস্টোন রুটি আর কয়েক টুকরো গোশত দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধকার হওয়ার পর আর কেউ এল না। আমি একা একাই ঘুমিয়ে পড়লাম। এইভাবে পাঁচদিন কাটল, আমার মনে হল, মার্ডস্টোন সাহেবের হাত কামড়ে দিয়ে আমি বোধ হয় ভয়ানক একটি অপরাধ করে ফেলেছি। আমার মা একদিনও এলেন না, তাঁকে পেলেও না হয় আমি মাফ চাইতে পারতাম।

এরপর বাড়িতে আমাকে রাখা মার্ডস্টোন সাহেব কি তাঁর বোনের কাছে মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে হল না। পেগোটি আমাকে চুপচুপ করে খবর দিয়ে যায় যে লন্ডনের একটি আবাসিক স্কুলে আমাকে ভর্তি করার আয়োজন চলছে। তা পেগোটির সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলাও সম্ভব নয়, আমার কাছাকাছি তাকে ঘুর ঘুর করতে দেখলেই তার নতুন মনিব যে কি করতে পারে পেগোটি তা ভালোভাবেই জানত।

দেখতে দেখতে আমার বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। আমি বিদায় নেওয়ার সময় মার গলা বেশ ভারী হয়ে আসছিল। এতে মার্ডস্টোন সাহেব এবং

তাঁর বোন দুজনেই খুব বিরক্ত। আমার জন্যে মা যে একটু প্রাণ খুলে কাঁদবেন এঁরা সে অধিকারটুকুও তাঁকে দিতে রাজি নন।

ঘোড়ার গাড়ি যাত্রা শুরু করল। পকেট থেকে রুমাল বের করে আমি চোখে চেপে ধরলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি তা ভিজে একেবারে চপচপে হয়ে গেছে। আধ মাইল পথ পেরিয়ে গাড়িটা একটু থামে, থামতে না থামতে পথের ধারে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে পেগোটি। এক লাফে গাড়িতে উঠে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বাড়িতে আমাকে আদর করা দূরে থাক, বেচারী কথা বলার সুযোগটা পর্যন্ত পায় না। আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটি কাগজের টুকরো আমার হাতে তুলে দিয়ে আর একবার সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর গাড়ি থেকে নামবার আগে গাড়িতে একটি ব্যাগ রেখে দিল।

গাড়ি ফের গড়িয়ে চলতে শুরু করলে আমি ব্যাগটা খুলে দেখি এক টুকরো কাগজে আমার মার লেখা, 'ডেভিকে অনেক আদর ও ভালোবাসা।' কাগজটির সঙ্গে কয়েকটি টাকা।

কিছুক্ষণ পর এই এক্কাগাড়ি থেকে নেমে উঠতে হল লন্ডনগামী কোচে। বিকাল তিনটেয় ঘোড়ায় টানা সেই কোচ ছাড়ল, লন্ডন পৌছবার কথা সকাল আটটায়। তখন গ্রীষ্মকাল, বিকালটা ভারি স্নিগ্ধ। গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চলছে আর আমার কত কথাই যে মনে পড়ছে। মনে হচ্ছিল, আচ্ছা গ্রামের এই বাড়িগুলির ভেতরে দেখতে কেমন? এখানকার লোকজন সব কেমন? ছোট ছোট ছেলেরা সব ছুটে আসছে গাড়ির পিছে পিছে। পেছনের পাদানিতে কেউ কেউ হাত দিয়ে ধরে একটুখানি দোল খেয়েই ফের নেমে যাচ্ছিল। এইসব ছেলেরা কি সুখী। আর সব সময় মনে পড়ছিল মার কথা আর পেগোটির কথা। মার্ডস্টোন সাহেব আর তাঁর বোন আসার আগে কি চমৎকার বাড়ি ছিলো আমাদের।

কোচে রাত্রিটা কিন্তু তেমন আরামে কাটেনি। দুই পাশে দুজন ভদ্রলোক ঘুমোতে শুরু করলেন, আমার দুই ঘাড় হল তাঁদের দুজনের বালিশ। মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকলে যদি বলি, 'একটু যদি'—তো তাঁরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন, যেন তাঁদের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে আমি মহা অপরাধ করে ফেলেছি। আর একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন আমার উল্টোদিকে, তাঁর বিশাল শরীর জুড়ে এতসব কাপড় জড়িয়ে জবুথবু হয়ে বসেছেন যে তাঁকে একটি খড়ের গাদা ছাড়া আর কিছুই ভাববার জো নেই। তাঁর বাস্কেটটি কোথায় রাখবেন, এটা নিয়ে কি করবেন তা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তা ঠেলে দিলেন আমার পায়ের নিচে। আমার অবস্থা একেবারে শোচনীয়।

শেষ পর্যন্ত সূর্য উঠল। আমার দুই দিকের দুই সহযাত্রীর ঘুম ভাঙল। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে লন্ডন শহর দেখে আমার যে শিহরণ হল তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। এই আমাদের স্বপ্নের লন্ডন শহর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এখানে আমি একেবারে একা। রবিনসন ক্রুসোর চাইতেও একা। রবিনসন ক্রুসো যে একা তা

তো আর কেউ দেখেনি, আর এই জনাকীর্ণ শহরে আমার একাকিত্ব যেন সকলের চোখে পড়ছে।

নানারকম ঝামেলার পর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। 'তুমিই তো নতুন এলে?' আমার দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'এসো, আমি সালেম হাউসের শিক্ষক।' আমি জানি যে সালেম হাউসে আমাকে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু ঐ স্কুলের এই শিক্ষকের চেহারা একটুও আকর্ষণীয় নয়। দেখতে তিনি বড়ো রোগা, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, তাঁর পোষাকও বিবর্ণ, প্যান্টের ঝুল ও শার্টের হাতা বেশ খাটো। আমার হাত ধরে তিনি চলতে শুরু করলেন। এদিকে আমার তখন খুব খিদে পেয়েছে, শরীর বেজায় ক্লান্ত। খিদের কথা বলতে আমার বাধো বাধো ঠেকছিল, তবে আমার নতুন শিক্ষকের চেহারা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি বললাম, 'কাল দুপুরের পর থেকে কিছুই খাইনি।' আরো সাহস করে বললাম, 'কিছু কিনে খেলে ভালো হত।' তিনি রাজি হলে একটা দোকান থেকে ডিম আর মাংস কিনে নিলাম। এখন এগুলো খাব কি করে? আমার নতুন শিক্ষক একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে কোথায় যে নিয়ে চললেন আমি ঠিক বুঝতেও পাচ্ছিলাম না। রাস্তায় সাঙ্ঘাতিক কোলাহল, হৈ চৈ, এইসব আওয়াজে আমার মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল, লন্ডন ব্রীজ পেরোবার সময় ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ চলবার পর শিক্ষক আমাকে নিয়ে নামলেন। তাঁর সঙ্গে আমি যে ছোট ঘরটিতে ঢুকলাম সেটি বেশ গরীব কোনো মানুষের বাসস্থান, দেখেই বোঝা যায় এটা কোনো অনাথ আশ্রমের অংশ। আবার একটি পাথরে খোদাই করা রয়েছে, 'পঁচিশ জন দরিদ্র রমণীর জন্য প্রতিষ্ঠিত।'

ছোট স্যাঁতসেঁতে ঘরটিতে ঢুকতেই বৃদ্ধা এক মহিলা খুশিতে ডেকে উঠলেন, 'বাবা চার্লি।' কিন্তু আমার দিকে তাঁর চোখ পড়তেই একটু থতমত খেয়ে চুপ করলেন। নতুন শিক্ষক তাঁর হাতে ডিম দিলে সসপ্যানে সেটা ভেজে দিলেন, মাংসের টুকরো সেদ্ধ করে দিলেন। আমি তো তখন ক্ষুধার্ত, গোগ্রাসে ঐসব খাচ্ছি তো শুনি যে বৃদ্ধা মহিলা শিক্ষককে বলছেন, 'বাঁশিটা সঙ্গে থাকলে একটু বাজাও না।'

কোটের ভেতর হাত দিয়ে শিক্ষক বাঁশির তিনটে টুকরা বের করলেন, টুকরাগুলি জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বাঁশি ঠিক করে নিয়ে তিনি বাজাতে শুরু করলেন।

তিনি কি সুর বাজালেন আমি জানি না, কেমন বাজিয়েছিলেন তাও বুঝিনি, কিন্তু তাঁর বাঁশির তীব্র ধ্বনি আমার বুকে দারুণ প্রতিধ্বনি তুলল, আমার সমস্ত বেদনার কথা যেন বুক খুঁড়ে ওপরে উঠে এল, আমার সব কষ্টের কথা মনে পড়ল, শেষ পর্যন্ত চোখের পানি আর চেপে রাখতে পারলাম না। এর মধ্যে ঐ মহিলা এবং আমার নতুন শিক্ষকের চেহারার মিল দেখে আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম যে এঁরা মা এবং ছেলে। আমার শিক্ষকের মা এত গরীব কেন, দাতব্য ভবনে বাস করেন কেন—এসব প্রশ্ন মনে একটু উঁকি দিলেও আমার সমস্ত মাথা জুড়ে তখন কেবল

বাঁশির সুর। আমার আস্তে আস্তে ঘুম পেতে লাগল। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি আমি ঘোড়ার গাড়িতে বসে রয়েছি, পাশে পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে আরেকটি পা রেখে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন আমার নতুন শিক্ষক। আমি ফের ঘুমিয়ে পড়ি।

গাড়ি থামলে স্যার আমাকে নিয়ে নিচে নামলেন। সামনে উঁচু দেওয়ালে মস্ত একটি বাড়ি, সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা 'সালেম হাউস।' এটাই তাহলে আমার নতুন স্কুল।

দরজায় কড়া নাড়লে শক্তসমর্থ একটি লোক বেরিয়ে আসে। ঘাড়টা ষাঁড়ের ঘাড়ের মত মোটা, একটা পা কাঠের, ছোট করে কাটা মাথার চুল। স্যার আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে সে আমাকে ভালো করে দেখল। জুতো এনে সামনে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'মেল সাহেব, মুচি আপনার জুতো ঠিক করতে চায় না। এটার মেরামত করার কিছু নেই, তালি দিতে দিতে একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

জুতোজোড়া হাতে আমার নতুন শিক্ষক মেল সাহেব ওপরে উঠতে লাগলেন, পিছে পিছে আমি। দোতলায় উঠে শেষ প্রান্তের ঘরে হাঁটছি, হঠাৎ চোখ পড়ল একটি বোর্ডের দিকে, বোর্ডে সুন্দর করে লেখা 'সাবধান, এটা কামড়ায়।' আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো কুকুর আছে এবং সেটা অবশ্যই কামড়ায় এই ভেবে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মেলসাহেব পেছনে তাকিয়ে বললেন, 'কি হল?'

'এখানে বোধহয় কুকুর আছে স্যার।' বোর্ডের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কুকুর নয়, কপারফিল্ড। আমাকে বলা হয়েছে, ঐ বোর্ডটা যেন তোমার পিঠের সঙ্গে আটকে দিই। এখানে এসে প্রথমেই তোমার মনটা খারাপ করে দিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু এটা আমাকে করতেই হবে।'

আমার সৎ বাবার হাতের আঙুলে কামড়ে দিয়েছিলাম, সেই খবর তাহলে এখানেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তার শাস্তি কি আমাকে পেতে হবে এভাবে? সত্যি, আমি একেবারে দমে গেলাম। ক্লাসের সহপাঠীরা আমার পিঠ দেখবে আর আমাকে নিয়ে যে কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে ভাবতেই লজ্জায়, ভয়ে আমি একেবারে কুঁকড়ে যেতে লাগলাম।

স্কুল তখন বন্ধ, মেল সাহেবের কাছে প্রতিদিন পড়াশোনা করি, স্যার আমাকে বকেন না, খুব ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু স্কুল খুললে ছেলেরা এসে আমার পিঠের এই বোর্ডটা নিয়ে আমাকে যে কি রকম নাস্তানাবুদ করবে ভেবে আমার রক্ত প্রায়ই হিম হয়ে আসে। আমার কিছুই ভালো লাগে না।

স্কুলের মালিক এবং প্রধান ক্রিকল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সুন্দর বৈঠকখানায় বসেছিলেন মিসেস ক্রিকল আর তাঁদের মেয়ে। এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম কাঠের পা ওয়ালা ঐ লোকটিকে।

ক্রিকল সাহেবের মুখ টকটকে লাল, মনে হয় সবসময় সেখানে আগুন জ্বলছে, চোখজোড়া তাঁর ছোট, কপালের রগগুলো সব স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর নামে কোনো রিপোর্ট আছে?'

'না স্যার', কাঠের পা ওয়ালা জবাব দিল, 'নতুন এসেছে, এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই করার সুযোগ পায়নি।'

'এদিক এসো।' ক্রিকল সাহেব আমাকে এই আদেশ দিলে কাঠের পা ওয়ালা বলে ওঠে, 'এদিক এসো।'

আমি তাঁর দিকে এগিয়ে এলে আমার কান ধরে ক্রিকল সাহেব বললেন, 'তোমার সৎ বাবাকে আমি চিনি, শক্ত স্বভাবের মানুষ। তা তিনিও আমাকে ভালো করেই চেনেন। তুমি আমাকে চেন?'

'না স্যার।'

'চেন না, না?' আমার কানে একটা মোচড় দিয়ে তিনি বললেন, 'চিনবে হে চিনবে।' কাঠের পা ওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'চিনবে হে চিনবে।'

ক্রিকল সাহেবের গলা একটু চাপা, কথা বললে ঘ্যাসঘ্যাসে আওয়াজ বেরিয়ে আসে। ঐ গলায় আরো কিছুক্ষণ নিজের বাহাদুরির কথা ঘোষণা করে আমার কানের লতি ধরে এমন মোচড় দিলেন যে চোখে আমার পানি এসে গেল।

ক্রিকল সাহেবের এই ব্যবহারে আমার যতই খারাপ লাগুক, অনেক বেশি ভয় করতে লাগল স্কুল খুললে ছেলেদের আচরণটা কি হবে সেই ভাবনা করে। তো একদিন স্কুল খুলল, ছেলেরা হোস্টেলে এসে পড়ল। ছেলেরা যথারীতি আমার পেছনে লাগল, কারো পিঠে অমনি একটা বোর্ড সাঁটা থাকলে কিছু ঝক্কি তো তাকে পোয়াতে হবেই। তবে যা ভেবেছিলাম সেরকম ভয়াবহ গোছের কিছু ঘটল না। 'সাবধান, এটা কামড়ায়' বলতে বলতে ছেলেরা আমাকে খ্যাপাত, কেউ কেউ আঁতকে ওঠার ভান করত, আবার বুনো মানুষের মত নাচতে নাচতে 'কুকুর কুকুর' বলে চিৎকারও করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই তেমন উৎপাত করেনি। এর ওপর ক্রিকল সাহেব ক্লাসে একদিন আমাকে বেদম মারতে গিয়ে দেখলেন যে পিঠে সাঁটা ঐ বোর্ডের জন্য বেতের বাড়ি ঠিক জুৎমত লাগানো যাচ্ছে না, তাই তিনি নিজেই ওটা খুলে ফেললেন।

তবে ছেলেদের উৎপাতের হাত থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে। ওর নাম জে, স্টিরফোর্ড। আমার চেয়ে কয়েক বছর বড় এই ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর, ছাত্র হিসেবেও মেধাবী বলে তার বেশ নামডাক রয়েছে। তার প্রতি ক্রিকল সাহেবের একটু পক্ষপাতিত্বও লক্ষ করা যায়। তো এই ছেলেটি প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলে। 'রবিনসন ক্রুসো,' 'আরব্য রজনী,' 'ডন কুইকসোট'—এইসব বইয়ের গল্প আমি বেশ জমিয়ে বলতে পারতাম বলে ছেলেরা অনেকেই আমার পাশে ভিড় করত। আর স্টিরফোর্ড আর আমি রাত্রে পাশাপাশি বিছানায় ঘুমোতাম, ঘুমোবার আগে তাকে রোজ ঐসব গল্প বলে শোনাতে হত। এইসব কারণে ছেলেটি আমাকে একটু বিশেষ চোখে দেখত। যেদিন সে আমাকে বলল, 'তুমি রোজ রাত্রে গল্প বলে বলে আমাকে ঘুম পাড়াবে,' আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু প্রতিদিন রাত্রে গল্প শোনাবার কাজটি একটু একঘেঁয়ে। এমনিতে স্টিরফোর্ড আমাকে ভালোবাসত আর স্বয়ং

ক্রিকল সাহেব তাকে সমীহ করতেন বলে কোনো ছেলে আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পেত না। কিন্তু স্টিরফোর্ড কখনো কখনো বড্ডো নিষ্ঠুর হয়ে উঠত।

একদিন বিকালবেলার কথা আমার খুব মনে পড়ে। মেল সাহেবের ক্লাসে গোলমাল হচ্ছিল। মেল সাহেব এমনিতে নিরীহ গোছের মানুষ, সহজে বড়গলা করে কথা বলতে পারতেন না। সেদিন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়া দিচ্ছিলাম। ছেলেরা প্রায় সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলেই চলেছে, ক্লাসে যে একজন শিক্ষক আছেন তা বোঝাই যাচ্ছিল না। গোলমাল এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে আমার পড়া দেওয়া আর শোনাই যায় না। মেল সাহেবের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি হঠাৎ করে চিৎকার করে ধমক দিলেন, 'চুপ। চুপ কর।' তাঁর মুখে এরকম ধমক শুনতে অনভ্যস্ত ছেলেরা অবাক হয়ে চুপ করে গেল। শেষ সারিতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে শিস দিচ্ছিল স্টিরফোর্ড, সে কিন্তু থামল না, শিস দিয়েই চলল। মেল সাহেব বললেন, 'স্টিরফোর্ড, চুপ কর।'

'আপনিই চুপ করুন'। স্টিরফোর্ড পাল্টা ধমকের সুরে বলল, 'জানেন আপনি চোখ রাঙিয়ে কথা বলছেন কার সঙ্গে?'

'স্টিরফোর্ড, তুমি কি ভেবেছ তোমার বেয়াদবি আমি লক্ষ করিনি? ছোট ছোট ছেলেদের তুমি বারবার উস্কে দিচ্ছ, আমি কি দেখছি না ভেবেছ?'

'আপনি কি দেখেন না দেখেন আমি কি তার পরোয়া করি?'

'বোধহয় কর না।' বলতে বলতে মেল সাহেবের ঠোঁটজোড়া কাঁপছিল, 'সবাই জানে যে এখানে তোমার দিকে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, সেই সুযোগ নিয়ে তুমি একজন ভদ্রলোককে এভাবে অপমান করতে সাহস পাও?'

'ভদ্রলোক?' স্টিরফোর্ড মহা বিস্মিত হবার ভান করে বলল, 'ভদ্রলোকটি কোথায় বলুন তো?'

'স্টিরফোর্ড, একজন হতভাগ্য মানুষকে এভাবে অপমান করে তুমি খুব ইতর ব্যবহার করলে। তুমি খুব অভদ্র আচরণ করলে, স্টিরফোর্ড।' বলতে বলতে মেল সাহেব আমার পিঠে আলতো করে চাপ দিয়ে বললেন, 'কপারফিল্ড, পড়া বলে যাও।'

স্টিরফোর্ড বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, 'শুনুন, একজন ভিখেরির মুখে এরকম কথা মোটেই মানায় না।'

হঠাৎ ঘরের ভেতর ক্রিকল সাহেবের ফ্যাসফেসে গলায় আওয়াজ গর্জে উঠল, 'মেল সাহেব, কি হচ্ছে?' মেল সাহেব চমকে উঠলেন। স্টিরফোর্ড বলল, 'স্যার, আমার প্রতি নাকি এখানে পক্ষপাতিত্ব করা হয়?—মেল সাহেবের এই কথার আমি প্রতিবাদ করছিলাম।'

'পক্ষপাতিত্ব?' ফ্যাসফেসে গলায় যতটা সম্ভব হুঙ্কার ছেড়ে ক্রিকল সাহেব বললেন, 'আমার স্কুলে পক্ষপাতিত্বের বদনাম? আপনি কি বলতে চান মেল সাহেব?'

মেল সাহেব মাথা নিচু করে বললেন, 'আমি খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছি, স্যার, ঠাণ্ডা মাথায় থাকলে ও রকম কথা বলতাম না।'

মেল সাহেব বিনীত হলেও স্টিরফোর্ডের উত্তেজনা কিন্তু বেড়েই চলে, সে বলে, 'স্যার, আমাকে ইতর বলা হয়েছে, অভদ্র বলা হয়েছে, তাই আমি রেগে গিয়ে তাঁকে ভিখেরি বলেছি।'

মেল সাহেব আমার পিঠে আস্তে আস্তে হাতের চাপ দিয়েই চলেছেন, তিনি যেন আমার কাছে আশ্রয় চাইছিলেন। ক্রিকল সাহেব বললেন, 'ভিখেরি? মেল সাহেব ভিক্ষে করেন কোথায়?'

'তিনি ভিক্ষে না করলেও তাঁর নিকট আত্মীয়তো করেন, একই হল।' বলতে বলতে স্টিরফোর্ড আমার দিকে তাকায়। মেল সাহেব তখনো আমার ঘাড়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছেন। লজ্জায়, অনুতাপে, আফসোসে আমি মাথা নিচু করে থাকি, আমিই একদিন কথায় কথায় মেল সাহেবের মায়ের গল্প করেছিলাম, তিনি যে দাতব্য আলয়ে বাস করেন সে কথাটিও বলা হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ নিচের দিকে, মেল সাহেব কিন্তু আমার ঘাড়ে আদর করে আস্তে আস্তে চাপ দিয়েই চলেছেন। এর মধ্যে স্টিরফোর্ড বলেই ফেলল, 'মেল সাহেবের মা দাতব্য আলয়ে অন্যের খয়রাতের ওপর বেঁচে থাকেন।' মেল সাহেব তখন ঐ সুন্দর বালকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'মেল সাহেব,' অনেক কষ্টে ক্রিকল সাহেব উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, 'স্টিরফোর্ড কি বলছে এসব? আপনি প্রতিবাদ করছেন না কেন?'

'স্টিরফোর্ড ঠিকই বলেছে, ওর কথায় একটুও ভুল নেই।' মেল সাহেবের এই স্পষ্ট জবাবে ঘরে পাথরের মত নীরবতা নেমে এল, মেল সাহেব ফের বললেন, 'ও যা বলেছে ঠিকই বলেছে।'

'আমার এই প্রতিষ্ঠানে তো এরকম লোককে থাকতে দেওয়া যায় না।' ক্রিকল সাহেবের কপালের রগ দপ করে ফুলে উঠল, তিনি বললেন, 'আপনি কি এটা একটা দাতব্য স্কুল ভেবেছেন? আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে গিয়ে আমাদের অপমান থেকে অব্যাহতি দিন।'

মেল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আর সময় নেই।'

তাঁর সমস্ত সম্বল যা ছিল, কয়েকটি বই এবং তাঁর বাঁশিটি নিয়ে মেল সাহেব আমাদের স্কুল থেকে চলে গেলেন।

ঐ রাত্রেও স্টিরফোর্ডকে গল্প শোনাতে শোনাতে আমি মেল সাহেবের বাঁশির বিষণ্ন সুর শুনতে পাচ্ছিলাম। রাত অনেক হলে স্টিরফোর্ড ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম যে এখান থেকে অনেক দূরে, অন্য কোথাও বসে মেল সাহেব যেন বিষাদাচ্ছন্ন সুরে এক নাগাড়ে বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন। আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম।

হাতির পেটে লড়াই

অনেক অনেক কাল আগে গভীর বনের পাশে ছিল একটি ছোট গ্রাম, গ্রামের এক কোণে ছোট্ট একটি বাড়ি, সেখানে বাস করত উনানানা। তার দুটি ছেলে, দুটিই দেখতে ভারি সুন্দর। রাস্তার পাশেই বাড়ি, বাড়ির সামনে ছেলে দুটিকে খেলতে দেখে পথিকেরা প্রায়ই থমকে দাঁড়াত, এত সুন্দর ছেলেও হয়! তাদের হাত পা কি গোলগাল, তাদের চামড়া কি চিকন, কি চকচকে তাদের দুজোড়া চোখ। দেখলে দুদণ্ড দাঁড়াতেই হয় বৈকি!

মেয়েমানুষ হলে কি হয়, কেউ নেই বলে কাজকর্ম সব করতে হয় উনানানাকেই। একদিন ভোরবেলা কাঠ কুড়োতে উনানানা গেছে বনে, ছেলে দুটিকে রেখে গেছে তার ভাগ্নীর কাছে, ভাগ্নীটি তার কাছেই থাকত। বাচ্চারা হৈ চৈ করে খেলছিল। কে কতদূর লাফ দিতে পারে তাই পরখ করতে করতে হয়রান হয়ে রাস্তায় ধুলোর ওপর নুড়িপাথর নিয়ে দুজনে খেলতে বসল।

তো ওরা খেলছে, এমন সময় কাছেই বড় বড় ঘাসে খসখস আওয়াজ শোনা গেল। তড়িঘড়ি করে পাথরে উঠে বসে ছেলে দুটি দেখে কি একটি বেবুন এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। বেবুন হল বাঁদর জাতীয় এক ধরনের জন্তু, হঠাৎ করে দেখলে গা শিউরে ওঠে। বেবুন ওদের সামনে দাঁড়িয়ে উনানানার ভাগ্নীকে জিজ্ঞেস করে, 'বাচ্চা দুটি কার রে?'

'উনানানা খালার ছেলে, আমার খালাতো বোন।' উনানানার ভাগ্নী জবাব দিলে বেবুন অবাক হয়ে গম্ভীর গলায় বলে, 'এরকম সুন্দর ছেলে কখনও দেখিনি বাপু। তাই একটু জানতে ইচ্ছে করল।'

বেবুন চলে গেলে বাচ্চারা ফের খেলতে শুরু করল। একটু পর সামনের ঝোপে পাতার আওয়াজে তাকিয়ে দেখে একটা বারো-শিঙে হরিণ বড় বড় চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কার বাচ্চা গো?' ওদের খালাতো বোনকে হরিণ জিজ্ঞেস করে, 'বাচ্চা দুটো কার?'

'উনানানা খালার ছেলে।' খালাতো বোনের জবাব শুনে বারো-শিঙে হরিণ অবাক হয়ে নরম গলায় বলে, 'এরকম সুন্দর ছেলে আগে তো দেখিনি।' বলতে না বলতে সে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফের খেলতে খেলতে ছেলে দুটি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খুব তেষ্টাও পায়। ছোট দরজায় রাখা জালা থেকে লাউয়ের খোল দিয়ে পানি তুলে ঢকঢক করে সবে খাচ্ছে, এমন সময় খুব তীক্ষ্ণ একটি আওয়াজে খালাতো বোনের হাত থেকে লাউয়ের খোল পড়ে গেল। সামনেই চিতাবাঘের ফোঁটাকাটা গা আর বেঈমান ধরনের এক জোড়া চোখ চকচক করছে। বনের ভেতর থেকে এটা কখন যে চুপচাপ বেরিয়ে এসেছে ওরা টেরই পায়নি।

চিতাবাঘ হুঙ্কার করে বলে, 'এসব কার?'

'উনানানা খালার।' কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিতে দিতে খালাতো বোন ঘরের দিকে একটু একটু করে পিছু হটতে থাকে, চিতাটা আবার কখন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। না, ঠিক ঐ মুহূর্তে ভোজনে চিতাবাঘের কোনো আগ্রহ নেই।

'এত চমৎকার দেখতে মানুষের বাচ্চা আগে দেখিনি।' বেশ অবাক স্বরে এই কথা বলে ল্যাজের একটি ঝলক দেখিয়ে চিতাবাঘ ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

এইসব জন্তু জানোয়ারদের এরকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখে ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে গেল। চিৎকার করে তারা মাকে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু কোথায় মা? মায়ের বদল জঙ্গল থেকে হেলতে দুলতে এসে হাজির হল একদন্তী হাতি। একটা দাঁত নেই বলে হাতিটার এরকম নাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে সে ছেলে দুটিকে দেখতে লাগল। ভয়ে বাচ্চাগুলোর তখন নড়াচড়া করার শক্তিও নেই। সুন্দর সুন্দর ছেলে দুটির দিকে শুঁড় নাড়াতে নাড়াতে হাতি গর্জন করে ওঠে, 'এসব ছেলে কার, এ্যাঁ, কার ছেলে?' ছেলে দুটি তখন বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করছে।

'এরা, এরা, এ্যাঁ এরা হল', ভয়ে খালাতো বোনের জিভ জড়িয়ে যায়, গলা আটকে আসে, 'উনা, উনানা, উনানানা খালার ছেলে।'

হাতি আর এক ধাপ এগিয়ে আসে, 'এত সুন্দর ছেলে তো আগে দেখিনি।' হাতির গলার ধ্বনিতে চারদিক গমগম করে ওঠে, 'এদের আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।' বলতে বলতে মুখ হাঁ করে এক গ্রাসে সে দুটি বাচ্চাকে গিলে ফেলল।

বেচারা ছোট খালাতো বোনটি ভয়ে চিৎকার করে ঘরে ঢুকে পড়েছে। নিরাপদ ঐ ঘর থেকে সে শুনতে পায়, হাতির ভারী পদধ্বনি আস্তে আস্তে মৃদু হতে হতে জঙ্গলের ভেতর মিশে গেল।

এর অনেক পরে ঘরে ফিরল উনানানা, মাথায় তার মস্ত কাঠের বোঝা। খালাকে দেখে ছোট মেয়েটি দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, ভয়ে দুঃখে শোকে তার গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ, প্রথমে তো গলা দিয়ে তার কথাই বেরোয় না। তারপর কাঁদতে কাঁদতে একটু একটু করে ভয়াবহ ঘটনাটি সে সব বলল।

'হায়! হায়! কি হল।' উনানানা চিৎকার করে, 'ওদের কি আস্ত গিলে ফেলেছে? তোর কি মনে হয় বল তো? হাতির পেটে কি ওরা এখনও জ্যান্ত থাকতে পারে, বল তো?'

'কি জানি? জানি না!' বলতে বলতে মেয়েটি আরো জোরে কেঁদে উঠল।

'কাঁদিস না।' উনানানা একটু ভেবে বলে, 'এক কাজ করি। আমি এখন বনে যাই। পশুদের জিজ্ঞেস করে দেখি, একদন্তী হাতিকে কেউ দেখেছে কি-না জেনে নিই।'

'তুমি যাবে?' ভাগ্নী কাঁদে আর বলে, 'আবার তোমার যদি কিছু হয়?'

'না। আমি বরং যাই। দাঁড়া একটু তৈরি হয়ে নিই।'

উনানানা উনোনে একটি হাঁড়িতে মটরশুঁটি চড়িয়ে দিল। মটরশুঁটি ভালো করে সেদ্ধ হলে হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে বড় ছুরিটা হাতে সে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। ভাগ্নীকে বলল, 'হাতি খুঁজে বার করে আমি ফিরব। তুই ততক্ষণ ঘরের দিকে খেয়াল রাখিস, বুঝলি?'

বিশাল জানোয়ারটার পদচিহ্ন ধরে উনানানা বনের মধ্যে অনেক দূর হাঁটল। কিন্তু হাতির কোনো পাত্তা নেই। মস্ত একটা গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা হল বেবুনের সঙ্গে। বেবুনকে সে মিনতি করে বলে, 'বেবুন ভাই, আমাকে একটু সাহায্য করবে? এক দাঁতওয়ালা হাতিকে দেখেছ? হাতিটা আমার দুই ছেলেকেই খেয়ে ফেলেছে। ওটাকে আমার ধরতেই হবে।'

বেবুন বলল, 'এই পথ ধরে সোজা চলে যাও। যেতে যেতে বড় বড় গাছ দেখতে পাবে, ঐসব গাছের পাশে সাদা পাথরের স্তূপ। ঐখানে হাতির দেখা পাবে।'

ঐ ধুলোভরা পথ ধরে উনানানা চলল, অনেকক্ষণ চলল, কিন্তু কৈ হাতির তো দেখা নেই। হঠাৎ করে চোখে পড়ে একটি বারো-শিঙা হরিণের দিকে, রাস্তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় যাচ্ছে।

'হরিণ ভাই, হরিণ ভাই।' উনানানার ডাকে হরিণ দাঁড়ায়। উনানানা কাছে গিয়ে বলে, 'একটা একদন্তী হাতি দেখেছ আজ? আমার দুটি মোটে ছেলে, দুটোকেই খেয়ে সে যে কোথায় গেল।'

'এই সরু রাস্তা ধরে চলতে থাক। যেতে যেতে এক জায়গায় অনেকগুলো বড় গাছ দেখতে পাবে, গাছগুলোর পাশে সাদা সাদা পাথরের স্তূপ। এক দাঁতওয়ালা হাতি থাকে ঠিক ওখানেই।' হরিণের মুখে পথের খবর নিয়ে উনানানা ফের হাঁটতে থাকে। এত কি হাঁটা যায়? সারাটা দিন আজ নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, খিদেয় শরীর ভেঙে পড়ে। এর ওপর মাথায় খাবার ভরা হাঁড়ি। কষ্টে উনানানা হাঁপায়। তবু হাঁটার আর শেষ নেই। উনানানা চলছে তো চলছেই। রাস্তার একটি বাঁকে দেখা হল চিতাবাঘের সঙ্গে। গুহার বাইরে এসে রাস্তায় বসে চিতাবাঘ জিভ দিয়ে চেটে চেটে নিজের শরীর সাফ করছে।

'চিতাবাঘ, ভাই চিতাবাঘ,' ক্লান্ত গলায় উনানানা মিনতি করে, 'আমাকে একটু সাহায্য করবে ভাই? এদিকে এক দাঁতওয়ালা একটা হাতি দেখেছ? ওকে আমার দারুণ দরকার, আমার দুটি বাচ্চাকেই ও এক সঙ্গে খেয়ে ফেলেছে।'

'এই পথ ধরে হাঁটো, হাঁটতেই থাকো, হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে দেখবে অনেকগুলো লম্বা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর পাশে সাদা পাথরের স্তূপ। একদন্তী হাতি ওখানেই থাকে।' পথের খবর দিয়ে চিতাবাঘ ফের জিভ দিয়ে নিজের গা সাফ করার কাজে মনোযোগ দিল।

ফের শুরু হল উনানানার হাঁটার পালা। পা দুটো তার ব্যথায় টনটন করে, এগুলো আর চলতে চায় না। উনানানা ভয় পায়, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পড়ে যেতে পারে, হয়তো আর একটি কদমও সে চলতে পারবে না। এই অবস্থাতেই পা জোড়া ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে সে আরো কিছুদূর চলার পর দেখে তার সামনে বড় বড় গাছের সারি, এর পাশে সাদা পাথরের স্তূপ। পাথরে গা এলিয়ে গাছের ছায়ায় পরম তৃপ্তির সঙ্গে শুয়ে রয়েছে মস্ত বড় একটা হাতি। এক নজরেই দেখা গেল, হাতিটির একটিমাত্র দাঁত। এটাই তাহলে ঐ একদন্তী জানোয়ার। যাক শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। বড় বড় নিশ্বাস ফেলে উনানানা এগিয়ে যায়। রাগে উত্তেজনায় সে চিৎকার করে ওঠে, 'এই যে হাতি। তুমি এখানে? আমার বাচ্চা দুটোকে খেয়ে এখানে আরাম করে বসে রয়েছ?'

'কে বলল?' হাই তুলতে তুলতে হাতি জবাব দেয়, 'না আমি না। এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও। বেশ কিছুদূর গেলে কয়েকটা লম্বা গাছ পাবে, পাশে সাদা পাথরের স্তূপ, ঐ হাতি থাকে ঠিক ঐসব গাছের নিচে।'

উনানানা কিন্তু নিশ্চিত যে তার ছেলে দুটোকে গিলে খেয়েছে এই হাতিটাই। এটাকেই সে খুঁজছে। রাগে পা দিয়ে মাটিতে বাড়ি মারতে মারতে উনানানা ফের ধমক দেয়, 'হাতি, মিথ্যা কথা বলো না, তুমিই আমার বাচ্চাদের গিলে খেয়েছো। তুমিই সেই শয়তান হাতি।'

'আরে না। এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও, যেতে যেতে দেখবে—।' হাতির কথা শেষ করতে দেয় না উনানানা, তার একেবারে সামনে গিয়ে সে হাতের ছুরি নাচায় আর জোরে জোরে চিৎকার করে, 'বলো, আমার বাচ্চারা কোথায়? বলো ওরা কোথায়? বলো, বলো, বলো।'

এবার জবাব না দিয়ে হাতি তার মুখ হাঁ করল, এমন কি দাঁড়াবার কষ্টটুকুও সে করল না, ঐভাবে বসে থেকেই এক গ্রাসে উনানানাকে সে গিলে ফেলল তার মাথার হাঁড়ি আর হাতের ছুরিসুদ্ধ। উনানানা ঠিক এটাই চাইছিল।

হাতির গলার ভেতর দিয়ে নিচের দিকে গড়াতে গড়াতে উনানানা শেষ পর্যন্ত পৌছল হাতির পেটের ভেতর, একেবারে পাকস্থলিতে। চোখ দিয়ে কিসব অদ্ভুত দৃশ্য সে সেখানে দেখল। হাতির পেটের ভেতরটা অনেকটা ছোট ছোট পাহাড়ের সারির মত, মনে হয় টিলার মালা। ঐসব টিলার ভেতর খোপে খোপে আটকে

রয়েছে কত মানুষ, কত কুকুর, কত ছাগল, কত গরু। আর কে? আর আছে তার সোনার টুকরো দুটি ছেলে। 'মা, মা।' তাকে দেখে ছেলে দুটো চিৎকার করে ডাকে, 'মা, তুমি এখানে এলে কি করে? ইস! আমাদের যে কী খিদে পেয়েছে, পেট সেই তখন থেকে চোঁ চোঁ করছে।'

উনানানা কি আর জানত না? তার মাথা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেদের সে মটরশুঁটি সেদ্ধ খাওয়াতে বসল। ওরা একেবারে খেল হাপুস হাপুস করে। আর আর যারা ছিল তারা সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে এক মুঠ খাবারের জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগল। উনানানা তাদের সবাইকে বকে দিল, 'তোমরা কি গোশত সেদ্ধ করে খেতে পার না? তোমাদের চারদিকেই তো গোশত, আর তোমরা কি-না বোকার মত না খেয়ে মর। বেকুব, আহামমুক কোথাকার।'

তারপর সে করল কি হাতির পেটের ভেতর থেকে বেশ বড় দেখে একটি অংশ কেটে নিল। হাতির পাকস্থলির ভেতর একটুখানি জায়গা করে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে গোশতের সেই টুকরো ঝলসে নিল। পেটের ভেতরকার গোশত, এমনিতে নরম, ঝলসে নেওয়ায় তার স্বাদ হল অপূর্ব। হাতির পেটের ভেতরে যারা ছিল, সেইসব মানুষ বলো, মেয়ে মানুষ বলো, তারপর ধরো গরু, ছাগল, কুকুর—সবাই মিলে মহাসুখে হাতির গোশত খাওয়ার ধুম পড়ে গেল।

ওদিকে পেটের ভেতর কাটাকুটি চলছে, রান্নাবান্না চলছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে হাতি। তার চিৎকারে বনের জন্তু জানোয়ার ছুটে আসতে লাগল, একদন্তী হাতিটার আজ হল কি? এত শক্তিশালী ভয়ঙ্কর ও বিশাল প্রাণীটি এভাবে চ্যাঁচায় কেন? কাতরাতে কাতরাতে হাতি বলে, 'কি জানি ভাই, পেটের ভেতরটা আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে। কি যে হল? আমাদের বনের পাশেই ঐ গ্রামের উনানানা বলে মেয়েটা, ওকে গিলে খাওয়ার পর পরই এই কষ্ট শুরু হয়েছে, পেট যেন কেটে ফালা ফালা করে ফেলল, আবার মনে হচ্ছে আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছে কেউ। কি যে কষ্ট, মনে হচ্ছে সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে ও বাবা। ও মা মাগো আমি গেলাম।' তার কষ্ট কেবল বেড়েই চলে, কেবলি বাড়ে। শেষ পর্যন্ত বিকট জোরে চিৎকার করে হাতি মরে চিৎপটাং হয়ে পড়েই গেল।

উনানানা তখন তার বড় ছুরিটা শক্ত করে ধরে হাড়হাড্ডি, মাংস চর্বি সব কেটে কেটে ঐ পেট থেকে বেরুবার দরজা বার করল। ফাঁক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে গরু, ছাগল, কুকুর এবং মেয়েমানুষ ও পুরুষমানুষের স্রোত। আর আসে তার সোনার মত সুন্দর দুটি ছেলে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বাইরের কড়া সূর্যের আলোয় তাদের সবার চোখ কিছুক্ষণ পিটপিট করতে থাকে। হাতির পেটের ভয়াবহ অন্ধকার কোণ থেকে মুক্ত হওয়ার খুশিতে তারা দারুণ হৈ চৈ করতে লাগল।

জন্তুদের হাতির কবজা থেকে মুক্ত করার জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে তাদের অনেকে হাম্বা হাম্বা করে, কেউ কেউ ভ্যা ভ্যা করে, আবার কেউ কেউ ঘেউ ঘেউ করে

নিজের নিজের ভাষায় উনানানাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল। আর যেসব মানুষ হাতির পেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারল, তারা উনানানার হাত ভরে উপহার দিল।

দুই ছেলেকে নিয়ে উনানানা খালাকে ঘরে ফিরতে দেখে ঐ ভাগ্নিটি আনন্দে আত্মহারা, তার আর খুশির সীমা নেই। সে তো ধরেই নিয়েছিল ওরা বুঝি আর ফেরে না। সেই রাতে বনের ধারে গ্রামটিতে ঐ ছোট কুঁড়েঘরে এক মচ্ছব, বিরাট এক ভোজ। কি দিয়ে এই ভোজ হল, বলো তো? ঠিক ধরেছ, হাতির রোস্টের মত সুস্বাদু খাবার আর কি আছে?

টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ

অনেকদিন আগেকার কথা। পাহাড়ের ঢালে ঝর্ণার ধারে গর্তে বাস করতো এক কুনোব্যাঙ। পাশেই সিমলতার ঝোপ, ঝোপের ধারে কুলগাছে বাসা বেঁধেছিলো একটা টুনটুনি পাখি। দুজনের ভারি ভাব।

একদিন বাজার থেকে ঘুরে এসে কুনোব্যাঙ বললো, 'টুনটুনি, শুনছো? খবর তো ভালো নয়।'

'কেন? কি হয়েছে?'

'বাজারে সবাই খুব বলাবলি করছে কি সামনের শনিবারে নাকি দারুণ ঝড় হবে।'

'এখন উপায়? আমাদের কি হবে?'

'চিন্তা তোমার জন্যে। আমার তো গর্ত আছে, কিন্তু ঝড় হলে তোমার দশাটা কি হবে?'

ঝড়ের কথা কুনোব্যাঙ কিন্তু বললো একদম বানিয়ে বানিয়ে। বাজারে এ নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। কুনোব্যাঙের স্বভাবটাই এরকম, মিথ্যা কথা বলে সবাইকে ভয় দেখিয়েই তার সুখ। আর টুনটুনিটা একেবারে ভীতুর একশেষ। এই খবর শুনে তার মুখ শুকিয়ে গেলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝড়ের আভাস পাওয়া যায় কি-না তাও দেখতে তার সাহস হলো না।

পরদিন শুক্রবার। তারপর শনিবার সকাল থেকে আকাশে গুমোট ভাব দেখে টুনটুনির জানটা ধুকধুক করতে লাগলো। হঠাৎ করে কোথায় মেঘ ডেকে উঠতেই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে টুনটুনি দিলো এক ছুট। ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে পড়লো মস্ত এক চিবিদ গাছের মগডালে। তখনকার দিনে প্রায় সব পাহাড়েই একটা দুটো করে চিবিদ গাছ ছিলো। ঐ চিবিদ গাছে থাকতো এক রোংরাং পাখি। তা এই পাখি আজকাল দেখাই যায় না। চিবিদ গাছেই ছিলো তাদের বাস। তা রোংরাং পাখি মগডালের নিচেই মোটা একটা ডালে বসে ঠোঁট হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছিলো।

টুনটুনি করলো কি রোংরাং পাখির ঠোঁটের ফাঁককে গর্ত ঠাউরে নিয়ে ছিটকে পড়লো তার ভেতরে। রোংরাং চমকে উঠে ঢেকুর তুলে উগরে দিলো টুনটুনিকে। কিন্তু তার ঢেকুরের আওয়াজ বড়ো বিকট। একটা বানর পাশেই একটা গাছের ডালে বসে মস্ত একটা কুমড়ো নিয়ে এই খেতে বসেছিলো। একটা কামড়ও দেয়নি, রোংরাং পাখির বিকট আওয়াজে সে চমকে উঠলে তার হাত থেকে পড়ে গেলো কুমড়োটা। আর পড়বি তো পড় একটা হরিণের পিঠে। সে বেচারা মনের সুখে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিলো। পিঠে কি পড়লো এই ভয়ে তার ঘাস খাওয়া মাথায় উঠলো, এক ভোঁ দৌড় দিয়ে সে ছুটলো বনের দিকে। বনের ধারে টানটান শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলো এক অজগর। হরিণের খুর লাগলো তার লেজের মাথায়। লেজের ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে মাথা তুলে সামনে একটা মুরগির বাসা দেখতে পেয়ে সে জোরে একটা ঢুঁ মারলো সেখানে। মুরগিটা সময় মতো সরে গিয়ে বাঁচলো। কিন্তু রাগে গরগর করতে করতে অজগর মুরগির পনেরোটা ডিম খেয়ে ফেললো। তাই দেখে রাগে দুঃখে মুরগি হায় হায় করতে লাগলো। তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাবে বলে পুরো এক মাস ধরে এক দিন পর পর ডিম পাড়ছিলো, অজগর এক মুহূর্তে তার সর্বনাশ করে গেলো। কিন্তু অজগরকে স্পর্শ করার সাধ্যি কি আর তার আছে? তাই সে তার রাগ ঝাড়লো পাশের পিঁপড়ের ওপর। নখ দিয়ে আঁচড়ে আর খামচে পিঁপড়ের ঢিবিটা সে একেবারে তছনছ করে ফেললো। বাসা ভেঙে দেওয়ায় পিঁপড়ের আর মাথা গোঁজার ঠাঁই রইলো না। রাগে দুঃখে ছুটে গিয়ে সে করলো কি এক হাতির শুঁড়ের আগায় কুটুস করে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলো। দুপুরবেলা এক ঝাড় কলাগাছ খেয়ে হাতিটা একটু শুয়েছে কেবল, ঘুমে তার চোখ জোড়া জড়িয়ে আসছে। এমন সময় পিঁপড়ের কামড় খেয়ে তার ঘুমের দফা রফা, শুঁড়টাও খুব জ্বলতে লাগলো। রাগ করে হাতি এদিক দ্যাখে, ওদিক দ্যাখে, কিন্তু পিঁপড়ে ততোক্ষণে হাওয়া। তবে তার চোখে পড়লো পাহাড়ের ঢাল ভরা পাকা ধান। আমাদের দেশের ঐ এলাকায় পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে ফসল বোনা হয়, ঐভাবে ফসল বোনাকে বলা হয় জুম। তা ঐ জুমে সেবার কষ্ট করে ধান বুনেছিলো এক বিধবা বুড়ি। বেচারি বুড়ির ছেলেমেয়ে নেই, জুমচাষের কাজ করতে হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ একা। তার এতো খাটনির ফসল হাতি খেয়ে সাবাড় করেছে দেখে বুড়ি কষ্টে কেঁদেই ফেললো। কান্না থামলে সে ভাবলো, রাজ্যে কি রাজা নেই? রাজার কি বিচার নেই? বিচার চাইতে সে সোজা চললো রাজার বাড়ি।

বুড়ির ফরিয়াদ শুনে রাজা রেগে টং। তাঁর রাজ্যে এত বড়ো অন্যায়? তিনি হুংকার দিলেন, 'হাতিকে ডাকো।'

ভরপেট খেয়ে হাতি তখন ছড়ার ধারে নরম মাটিতে একটুখানি গড়িয়ে নেওয়ার আয়োজন করছিলো, রাজার হুকুম পেয়ে হেলতে দুলতে এসে শুঁড় তুলে সেলাম করলো। সেলাম না নিয়ে রাজা বললেন, 'হাতি, বহরে বড়ো বলে তোমার এতো সাহস? এই বুড়ির এক জুম ধান তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছো?'

কাঁদো কাঁদো গলায় হাতি বললো, 'মহারাজ। স্বীকার করি ধান আমি খেয়েছি। কিন্তু এক দুষ্টু পিঁপড়ে আমার শুঁড়ে কামড়ে দিয়েছিল বলেই রাগ করে জুমের সব ধান খেয়ে ফেললাম। দেখুন না, আমার শুঁড়ের দশাটা কি। ভালো করে কাঁদতে পারি না মহারাজ, কাঁদতে গেলে চোখের জলে শুঁড়ের জলে এক হয়ে যায়, তখন শুঁড়টা বেজায় জ্বলে।'

রাজা ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ। তিনি ভেবে দেখলেন, তাই তো শুঁড়ে কামড় দিলে কি কারো হুঁশজ্ঞান থাকে? নিজের শুঁড়ের মতো নাকটা চুলকে তিনি দ্বিতীয়বার হুংকার ছাড়লেন, 'ডাকো পিঁপড়াকে।'

পিল পিল পায়ে পিঁপড়ে এসে চটাং চটাং কথা শোনালো, 'মহারাজ, আপনি মারলেও মারতে পারেন, কাটলেও কাটতে পারেন।'

রাজা ধমকে উঠলেন, 'তুমি এক চিমটি একটা জীব, তোমাকে কাটলে মারার জায়গাটা কোথায়? ওসব কথা ছাড়ো। ফাঁসির জন্যে তৈরি হও।'

পাশেই দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জল্লাদের দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে পিঁপড়ে তখন ভয়ে ভয়ে বললো 'মহারাজ। মুরগি আমার বাসা ভেঙে আমাকে পথের পিঁপড়ে করে দিয়েছে বলেই না রাগ করে আমি হাতির শুঁড়ে কামড়ে দিলাম।'

রাজার তলব পেয়ে দরবারে হাজির হলো মুরগি। এসেই হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'মহারাজ তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাবো বলে আমি একমাসে পনেরোটা ডিম পেরেছি। ডিমের ওপর বসতে পারলাম না, মহারাজ, বাছারা আমার দুনিয়ার মুখ পর্যন্ত দেখতে পেলো না। অজগর আমার সবগুলো ডিম গিলে ফেলেছে।'

মুরগির কান্না দেখে মহারাজও চোখ মুছলেন। তিনিও নিঃসন্তান। তাঁর যেসব ছেলে জন্মই নেয়নি তাদের জন্যে একটু কেঁদে তিনি ভারী গলায় বললেন, 'এবার অজগর।'

থ্যাৎলানো লেজ টেনে টেনে আসতে অজগরের একটু দেরিই হলো। দরবারে ঢুকে রাজাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে বললো, 'মহারাজ। একবার দেখুন, হরিণ আমার লেজটার কি দশা করেছে। লেজের কষ্টে রাগ করে আমি সামনে মুরগির ডিম পেয়ে সব খেয়ে ফেললাম। লেজের কষ্ট বড়ো বিষম কষ্ট মহারাজ। আপনার লেজ নেই, এই কষ্ট বুঝবেন কি করে?'

নিজের লেজ নেই বলে রাজা একটু লজ্জা পেলেন। বুঝলেন, সব দোষ ঐ হরিণের। বললেন, 'হরিণ কোথায়?'

হরিণ এসে শিং ঝুঁকে কুর্নিশ করে নিবেদন করলো, 'হতচ্ছাড়া বাঁদর আমার পিঠে মস্ত একটা কুমড়ো ফেলে দিয়েছে বলেই তো আমি ভয়ে দৌড় দিলাম। অজগরের লেজে আমার খুর যে কখন লাগলো বুঝতেই পারিনি মহারাজ।'

বানরের বাঁদরামিতে রাজা আগে থেকেই অতিষ্ঠ। হরিণের নালিশ শুনে ফের হুংকার দিলেন, 'ডাকো বানরকে।'

বানর এসেই দরবার ঘরের জানালার শিক ধরে তিন পাক ঝুল খেয়ে নিয়ে বললো, 'মহারাজ। সব দোষ কি কেবল আমার ঘাড়েই চাপবে? রোংরাং পাখির বিকট আওয়াজ আমার কানে যেতেই ভয়ে আমার হাত থেকে কুমড়োটা নিচে পড়ে গেলো। আমার কি দোষ? অতো পাকা কুমড়োটা, চেখেও দেখতে পারলাম না।'

রাজা দেখলেন, এখানে বানরের দোষ নেই। রাজার এত্তেলা পেয়ে রোংরাং পাখি তার বিরাট ডানা নিয়ে এসে দরবার ছায়া করে বসলো। তারপর বিনয়ে ডানা গুটিয়ে বললো, 'মহারাজ। ডানা ছড়িয়ে চিবিদ গাছের ডালে বসে আমি একটু হাওয়া খাচ্ছিলাম। তো হাওয়া খেতে ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক করে রেখেছিলাম। ঐ টুনটুনিটা কথা নেই বার্তা নেই ঢুকে পড়েছে আমার মুখের ভেতর। তাইতো আমি আঁৎকে উঠে তাকে উগরে দিতে ঢেঁকুর তুললে একটু আওয়াজ হয়েছিলো। তা মহারাজ, দোষ কি আমার?'

তাই তো। মহারাজ বললেন, 'তাহলে টুনটুনি আসুক।'

পেয়াদারা টুনটুনিকে পাকড়াও করে আনলে ভয়ে সে কাঁপতে লাগলো। মহারাজের ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত চিঁ চিঁ করে বললো, 'মহারাজ! ঝড়ের ভয়ে আমি রোংরাং পাখির মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছিলাম।'

মহারাজ এবার আরো রেগে গেলেন। ভীতু মানুষ, ভীতু জানোয়ার, ভীতু পাখি, ভীতু পোকা আর ভীতু মাছ এই পাঁচ ভীতুকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। এবার সবচেয়ে জোর হুংকার ছেড়ে বললেন, 'কেন? ভয় পাবে কেন? আমার রাজ্যে ভয় পাওয়ার কি হলো?'

এই কথায় টুনটুনির ছোট্ট বুকে বল এলো। সে তখন তার কথা পেশ করলো, 'মহারাজ। আমার বন্ধু কুনোব্যাঙ বাজার থেকে ঘুরে এসে বললো কি যে শনিবারে খুব ঝড় হবে। তাই শনিবারে একটু বাতাস বইতেই ঝড়ের ভয়ে আমি দিলাম এক ছুট। চিবিদ গাছে পৌঁছে রোংরাং পাখির হাঁ-টিকে একটা গর্ত ঠাউরে ছিটকে পড়লাম তার ভেতর। কুনোব্যাঙ আমাকে মিছেমিছি ভয় দেখিয়েছিলো মহারাজ।'

'এতো বড়ো কথা?' টুনটুনির কথা ফুরোবার আগেই মহারাজ পঞ্চমবার হুংকার ছাড়লেন, 'আমার রাজ্যে মিথ্যেবাদী? মিথ্যুকটা কোথায়?'

ভীতু আর মিথ্যুক—এই দুই ধরনের প্রাণীই রাজার দুই চোখের বিষ। রাজার পেয়াদারা ছুটলো কুনোব্যাঙকে খুঁজতে।

কুনো ব্যাঙ কি আর সহজে ধরা দেবার বান্দা? রাজার সেপাই এসে সকাল থেকে একে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বেলা থাকতেই সে নিজের গর্তে ঢুকে পড়েছে। সেপাই আর পেয়াদারা তাকে খুঁজে. হয়রান। শেষে এক জাঁদরেল সেপাই গর্তের বাইরে ব্যাঙের লেজ দেখতে পেয়ে বাজখাঁই গলায় ডাক ছাড়লো, 'কুনোব্যাঙ, এই কুনোব্যাঙ। বেরিয়ে আয়। রাজা এত্তেলা পাঠিয়েছেন। বেরিয়ে আয় শিগগির। আয় বলছি।'

গুটিসুটি মেরে ব্যাঙ মিন মিন করে বললো, 'হুজুর। আমার খুব ব্যারাম। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, মাথা তুলতে পাচ্ছি না। পেটেও ব্যথা হয়েছে, হাড়গুলোও কেমন টনটন করছে। আমি কাল যাবো।'

তার তালবাহানা শোনে কে? সেপাই আর পেয়াদারা তার ঠ্যাঙ ধরে টেনে তাকে বাইরে আনলো। সবাই চ্যাংদোলা করে তুলে তাকে নিয়ে চললো রাজার বাড়ি।

রাজা এবার সেদিনের মতো শেষ হুংকার ছাড়লেন, 'কুনোব্যাঙ, তোমার এতো বড়ো সাহস? আমার রাজ্যে বাস করে তুমি মিথ্যা কথা বলো? আবার মিথ্যা কথা বলে ভয় দ্যাখানো তো আরো বড়ো অপরাধ। জল্লাদ। কুনো ব্যাঙের ফাঁসির হুকুম হলো। একে বেঁধে নিয়ে যাও।'

কুনোব্যাঙ বুঝলো এখন আর কোনো অজুহাত চলবে না। হাত জোড় করে সে মিনতি করলো, 'মহারাজ। আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবো না। এবার আমাকে মাফ করে দিন মহারাজ। একবার ফাঁসি দিলে আমার প্রাণটা থাকবে না মহারাজ।'

ব্যাঙের কাকুতি মিনতিতে মহারাজের মন ভিজলো। এরপর সে আর মিথ্যা কথা বলবে না বলে ওয়াদা করায় তিনি একটু সদয় হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। এবার প্রাণদণ্ড থেকে তোমাকে রেহাই দিলাম। কিন্তু তোমার মিথ্যা কথার জন্যে আমার রাজ্যে এতোগুলো জীবের এতো হয়রানি হলো। তোমাকে পঁচিশটা বেত খেতে হবে।'

রাজার হুকুম পেয়ে জাঁদরেল পেয়াদা কুনোব্যাঙকে ভালো করে বেঁধে নিয়ে চললো রাজবাড়ির উঠানে। সেখানে বড়ো একটা কাঁঠাল গাছ। ঐ গাছের সঙ্গে ব্যাঙকে ভালো করে বেঁধে পেয়াদা তাকে সপাসপ বেত মারতে শুরু করলো। যতোই বেত মারা হয়, ব্যাঙ ততোই ফুলতে থাকে। এক একটি বেতের বাড়িতে তার গা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে সাদা সাদা এক ধরনের আঠা। পঁচিশটা বেত খেতে খেতে তার শরীর ভরে গেলো অজস্র দাগে। আর তার শরীরের সাদা সাদা আঠা ছিটকে লাগলো কাঁঠাল গাছের গায়ে।

সেই থেকে কুনোব্যাঙের গায়ের চামড়া এতো খসখসে আর কাঁঠাল গাছের গায়ে এতো সব সাদা ছোপ।

শিক্ষক নির্দেশিকা

উৎকর্ষের কারণে দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যকর্ম ধ্রুপদ সাহিত্য বা চিরায়ত সাহিত্য বলে পরিচিত হয়। বিষয়গত ও শিল্পগত মানের গুণে এই ধরনের সাহিত্যকর্ম কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কালের দাবী মেটাবার পরও তা কালজয়ী হয়। একটি দেশে একটি ভাষায় রচিত হলেও ঐ ভূখণ্ডের এবং ঐ ভাষাভাষীর চাহিদা পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা সমস্ত ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে। চিরায়ত সাহিত্য সর্বকালের সর্বজনের সাধারণ সম্পদ। যুগের পরিবর্তনে, সমাজের বিবর্তনে তার আবেদন হ্রাস পায় না। বরং ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন প্রেক্ষিতে তার নতুন ব্যাখ্যা হয়, নতুন বিশ্লেষণ হয় এবং তা নতুন মাত্রা অর্জন করে।

সভ্যতার অগ্রগতিতে চিরায়ত সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো এবং এর সাহায্যে তার প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ ও গোটা মানবজাতি সম্বন্ধে তার দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করা। চিরায়ত সাহিত্যের পাঠের ফলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সমাজের জীবনযাপন সম্বন্ধে অবহিত হয়, বেঁচে থাকার জন্য তাদের নিরন্তর সংগ্রাম জীবন সম্বন্ধে তাকে সশ্রদ্ধ করে তোলে এবং মানুষের আনন্দ ও বেদনায় ভাগ নিতে সে অনুপ্রাণিত বোধ করে। তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত কিংবা রাষ্ট্রীয় বিভাজন এবং সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষ যে একটি অবিভাজ্য শক্তি—তা উপলব্ধি করার শক্তি সে অর্জন করে।

চিরায়ত সাহিত্যের এই সংকলনে সুদীর্ঘ পৌনে তিন হাজার বছর আগে রচিত মহাকাব্য, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক, আমাদের দেশে প্রচলিত লোকগাথা, বিদেশী লোককাহিনী প্রভৃতি থেকে শুরু করে দেড়শ' বছর আগে লিখিত উপন্যাসের অংশবিশেষের সংক্ষিপ্ত ও অতি সংক্ষিপ্ত গল্পরূপ পরিবেশন করা হল। এগুলো থেকে মূল রচনার স্বাদ গ্রহণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, এখান থেকে

মূল রচনার মানও অনুমান করা যায় না। তবে এই সহপাঠের সাহায্যে মূল রচনাগুলো সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে, এইগুলির সাহায্যে তারা মূল রচনা পাঠে আগ্রহ বোধ করবে।

সংকলিত রচনাগুলির শিক্ষাদানে শিক্ষকদের সহযোগিতা করার লক্ষে প্রত্যেকটি রচনার পাঠদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

দেওয়ানা মদিনা

আমাদের দেশের একটি লোকগাথা দিয়ে চিরায়ত সাহিত্যের পাঠদান শুরু করলে চিরায়ত সাহিত্যের উপাদান ও ভিত্তি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা ধারণা লাভ করবে। গল্পটি পাঠদানের আগে জানাতে হবে যে 'দেওয়ানা মদিনা', 'মহুয়া', 'কাজলরেখা', 'কঙ্ক ও লীলা', 'দস্যু কেনারামের পালা' প্রভৃতি লোকগাথা গত দুই তিন শতাব্দি যাবৎ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় গ্রামের নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। এই শতাব্দির প্রথমদিকে উৎসাহী লোকসাহিত্য সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে তাদের কাছে শুনে এইগুলি সংগ্রহ করেন এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গবেষক ও মনীষী পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ-গীতিকা* নামে সংকলনে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্যান্য গাথার মত 'দেওয়ানা মদিনা'য় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব খুব স্পষ্ট। এ কথা ঠিক যে শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহার ও উচ্চারণে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে তাদের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব যেন না থাকে। 'দেওয়ানা মদিনা'র শিল্পমান নিঃসন্দেহে উচ্চমানের এবং শিক্ষক পাঠদানের সময় এই বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করবেন। এই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত লোকসাহিত্য ও ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, সারি, জারি, গম্ভীরা প্রভৃতির দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। চাষী গৃহস্থের কন্যা মদিনা যে গভীর প্রেম ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছে সে বিষয়ে শিক্ষক গুরুত্ব দেবেন। দেওয়ানপুত্র আলাল ও মদিনার বিচ্ছেদের আলোচনা প্রসঙ্গে আভিজাত্যের মোহ যে কোনো মানুষের জন্যই কল্যাণকর নয় এই সত্যটির ওপর আলোকপাত করবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত *রামায়ণ* ও *মহাভারত* পৃথিবীর অপর দুটি প্রাকৃতিক মহাকাব্য বলে পরিচিত। মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, "ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।" মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে এই গল্পটির পাঠদান শুরু করা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ রাজ্যের রাজাগণ জড়িয়ে পড়েন। একটি মানচিত্রের সাহায্যে এই গল্পে

উল্লেখিত জায়গাগুলির অবস্থান, বর্তমান নাম, প্রভৃতি বুঝিয়ে দিলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে। বিশেষ করে বঙ্গ ও পুণ্ড্র রাজ্য এবং প্রাগজ্যোতিষের অংশবিশেষ আমাদের বর্তমান বাঙলাদেশের অন্তর্গত; এইসব রাজ্যের সেনাবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেছিল; এবং পুণ্ড্রের রাজা পুণ্ড্রক নিজেকে ভগবানের অবতার প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ বলে নিজেকে দাবী করেছিলেন—এইসব তথ্য জানলে দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা সচেতন হবে।

গল্পের কোন চরিত্র শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে শিক্ষক এই প্রশ্ন করে তাদের নিজ নিজ প্রিয় চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দুর্যোধন, দুঃশাসন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম ও কর্ণ চরিত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা করা দরকার, এই সংক্ষেপিত অংশে ঘটনাবলিতে তাদের ভূমিকাই কমবেশি পাওয়া যায়। এঁদের প্রত্যেকের স্বভাবে শক্তি ও দুর্বলতা কি তা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জেনে নিলে ভালো হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত *মহাভারতের* বাংলা অনুবাদ অবলম্বনে গল্পটি লেখা হয়েছে। এখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থাকাকালে তারা অন্তত শশীভূষণ দাশগুপ্তের *ছোটদের মহাভারত* এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *ছেলেদের মহাভারত* যাতে পড়ে শিক্ষক সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

হেক্টর উপাখ্যান

প্রাচীন গ্রীক মহাকবি হোমার রচিত মহাকাব্য *ইলিয়াড*-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র হেক্টরের বীরত্ব, মানবিক আচরণ ও মৃত্যু নিয়ে এই গল্প লেখা হয়েছে। পাঠদানের আগে হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি* উভয় কাব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষক আলোচনা করবেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে কাব্য দুটি পৃথিবীর চারটি প্রাকৃতিক মহাকাব্য বা এপিক অফ গ্রোথের অন্তর্ভুক্ত। কোনো এলাকার বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা কাহিনী সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে বৃহত্তর এলাকা জুড়ে তা বিস্তারিত হয়; চারণ কবিগণ ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার যুক্ত করে কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলেন; এবং পরে অসাধারণ প্রতিভাময় কোনো কবির হাতে তা উন্নত হয় মহাকাব্যে।

শিক্ষক মানচিত্রের সাহায্যে *ইলিয়াড* কাব্যের কাহিনীর ঘটনাস্থল দেখাবেন। এশিয়া মাইনর বা আধুনিক তুরস্কের পশ্চিম উপকূল অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে ট্রয় নগরীর অবস্থান ছিল। ট্রয়ের সঙ্গে গ্রীসের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে এই কাব্যে মানুষের সংগ্রাম ও সুখ দুঃখ আশা বেদনার চিত্র আঁকা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীর কয়েকটি তাদের বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে গ্রীক মনীষী, কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সবাই যে হোমারের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তা বলা দরকার। আলেকজান্ডার বিশ্ববিজয়ের অভিযানে বেরিয়ে *ইলিয়াড* বারবার পড়তেন।

হেক্টরের সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর মানবিক মূল্যবোধ ও তাঁর কোমল অনুভূতির সঙ্গে মহাবীর একিলিসের প্রচণ্ড ক্রোধ, প্রচণ্ড ভালোবাসা ও অহংকার নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ্যানড্রোম্যাকে, প্রায়াম, হেকুবা প্রমুখের সঙ্গে হেক্টরের সম্পর্ক এবং একিলিসের নিঃসঙ্গতা নিয়ে আলোচনা করলে হেক্টরের চরিত্র বিশ্লেষণ স্পষ্ট হবে।

সোহরাব ও রোস্তম

শাহনামা ফারসি ভাষায় লিখিত মহাকাব্য। *সোহরাব ও রোস্তম* পড়াবার আগে *ইলিয়াড* ও *মহাভারত* মহাকাব্য দুইটির সঙ্গে *শাহনামা*র পার্থক্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বোঝানো দরকার। প্রথম মহাকাব্যগুলির মতো *শাহনামা* সুদীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠেনি। সুলতান মাহমুদ শাহ গজনির নির্দেশে কবি ফেরদৌসি পারস্যের ইতিহাস অবলম্বনে তাঁর কবিসুলভ কল্পনা ও প্রচলিত কাহিনীর সাহায্য নিয়ে গ্রন্থখানি রচনা করেন।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস, তাদের জরাথুস্ত্রিয় ধর্মমত প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত সহজ ও আকর্ষণীয় ভাষায় আলোচনা করবেন। পাঠদানকালে রোস্তমের যোদ্ধা জীবনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও বেপরোয়া জীবন বোঝাবার জন্য অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে চলে যাওয়া এবং সন্তানের জন্ম বার্তা পেয়েও তাকে দেখতে না আসার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া দরকার। বীরত্বের সঙ্গে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা সোহরাব চরিত্রে যে মহিমা আরোপ করেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করবে।

সোহরাব ও রোস্তমের কাহিনীর আরো ভাষ্য রয়েছে। জনপ্রিয় একটি ভাষ্য অনুসারে ছেলেকে যুদ্ধে নেওয়া থেকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে তাহমিনা স্বামীকে মিথ্যা সংবাদ জানায় যে তার একটি কন্যা-সন্তানের জন্ম হয়েছে। রুবেন লেভি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত শাহনামা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে সেটি অনুসরণ করা হয়েছে।

আবু হাসানের গল্প

গল্পটি ক্লাসে প্রথমে বলে খলিফা হারুনুর রশিদ ও তাঁর আমলের বাগদাদ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া দরকার। এক হাজার এক আরব্য রজনী থেকে আরও কয়েকটি গল্প বললে ছাত্রছাত্রীরা বইটি পড়তে আগ্রহী হবে। ক্ষিতীশ সরকারের বাঙলা অনুবাদ অবলম্বনে এখানে গল্পটি লেখা হয়েছে, কিন্তু বইটি কিশোরদের উপযুক্ত নয়, তাদের পাঠের জন্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বা লীলা মজুমদারের লেখা আরব্য উপন্যাসের গল্প পাঠের পরামর্শ দেওয়া যায়।

আবু হাসানের চরিত্র বোঝাবার জন্য তার খেয়ালিপনা, আতিথেয়তা, বিরক্ত স্বভাব প্রভৃতি আলোচিত হবে। খলিফা হারুনুর রশিদের কৌতুক করার প্রবণতাও গল্পের আকর্ষণ। খলিফার সঙ্গে আবু হাসানের প্রথম রাত্রি, খলিফা হিসাবে আবু হাসানের আচরণ, মায়ের সঙ্গে তার ব্যবহার, প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া, পাগলা গারদে আবু হাসানের ভোগান্তি, পাগলা গারদ থেকে ঘরে ফেরার পর তার অবস্থা, খলিফার সঙ্গে নিজের ঘরে তার দ্বিতীয় রাত্রি, খলিফার প্রাসাদে তার দ্বিতীয় দিন প্রভৃতি ছোট ছোট ঘটনা শিক্ষার্থীরা পালা করে ক্লাসে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে শোনাবে।

ঝড়

গল্পটি পাঠদানের আগে শেকসপিয়ার সম্বন্ধে পরিচিতিমূলক ধারণা দেওয়ার জন্য *হ্যামলেট* বা *মার্চেন্ট অফ ভেনিস* নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে বললে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে। *ঝড়* একবার পড়ার পর মূল নাটক *দ্য টেম্পেস্ট* থেকে মাঝে মাঝে পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা শেকসপিয়ারের রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এখানে সংলাপের ভঙ্গি, উপমা প্রভৃতি ব্যবহারের সময় শেকসপিয়রিয় রীতি অনুসরণ করা হয়েছে; শিক্ষার্থীদের সে সম্বন্ধে সচেতন করা দরকার। এই গল্পে প্রসপেরোর ওপরেই প্রায় সব আলো ফেলা হয়েছে; প্রসপেরো চরিত্র বিস্তারিত আলোচিত হবে। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, শিশুকন্যাকে নিয়ে তাঁর অনিশ্চিত সমুদ্রপথে যাত্রা এবং একমাত্র কন্যাকে নিয়ে নির্জন দ্বীপে বসবাস প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থাতেও অবিচলিত থাকার ক্ষমতা প্রসপেরোকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। প্রেতাত্মাদের বশে রাখা ও তাদের শাসন করার ক্ষমতার সঙ্গে তাঁর কন্যার প্রতি গভীর স্নেহ, শত্রুদের ক্ষমা করা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিলে বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এরিয়েলের জবানীতে একটি গান ও একটি কবিতা এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে, মূল শেকসপিয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে ভালো হয়। গল্পের শেষে মূল নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ সংলাপ প্রসপেরোর একটি স্বগত কবিতা অনুবাদ করে দেওয়া হল। একটি সুখী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের দিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট ইংগিত এখানে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের এই কবিতাটি ব্যাখ্যা করার সময় ক্ষমতা ব্যবহারের চেয়ে সুখী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই যে বেশি কাম্য—শেকসপিয়ারের এই বক্তব্য সহজ ভাষায় আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

ডেভিড কপারফিল্ড

চার্লস ডিকেনসের বৃহৎ উপন্যাস *ডেভিড কপারফিল্ড* থেকে প্রথম সাত অধ্যায়ের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে পরিবেশিত হল। গল্পটি পড়ার আগে উপন্যাস সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দান এবং বাঙলা উপন্যাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাস থেকে পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ের কিছু কিছু ঘটনা ক্লাসে বললে ছেলেমেয়েরা উপভোগ করবে এবং মূল বই পড়তে আগ্রহ বোধ করবে। এখানে চার্লস ডিকেনসের অন্যান্য বই, বিশেষ করে *এ টেল অফ টু সিটিজ* এর গল্প মাঝে মাঝে বলা যেতে পারে।

ডেভিডের শৈশব ও বাল্যে তার মা ও পেগোটির সঙ্গে তার সুখের জীবনের সঙ্গে মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর তার অসন্তুষ্ট অবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের দিয়েই করানো যায়। মিস্টার মার্ডস্টোন এবং তার বোনের স্বভাব ও আচরণ শুধু ডেভিডের নয়, ডেভিডের মা ও পেগোটিকেও কিভাবে অসুখী করে তোলে তা নিয়ে শিক্ষক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করবেন। সালেম হাউসে ডেভিডের জীবনযাপন, মিস্টার ক্রিকলের নিষ্ঠুর ব্যবহার, মিস্টার মেলের কোমল স্বভাব, স্টিরফোর্থের আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনাকালে এইসব চরিত্র সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তারাই চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করতে শিখবে। দরিদ্র মিস্টার মেলের শিল্পীস্বভাব, তাঁর স্নেহপরায়ণ মনোভাব তাঁকে একজন আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করেছে। তাঁর দুঃখজনক ঘটনাটি যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শিক্ষক সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। স্টিরফোর্থের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও মিস্টার মেলের সঙ্গে তার আচরণ ডেভিড অনুমোদন করতে পারেনি, আবার বন্ধুকে প্রতিবাদ জানাতেও সে পারে না, এ থেকে ডেভিড কপারফিল্ডের সংবেদনশীলতা ও দুর্বলতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার ওপর যথাযথ আলেকপাত হওয়া দরকার।

হাতির পেটে লড়াই

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায়ের এই লোককাহিনীর পাঠদানের আগে আফ্রিকার মানচিত্রের সাহায্যে দেশটির অবস্থান, সেখানকার ক্ষমতাশীল সংখ্যালঘু সরকারের বর্বর ও পশুসুলভ বর্ণবাদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রাণবন্ত আলোচনা করে নেওয়া দরকার। সদ্য কারামুক্ত নেলসন মেনডেলার কথা বললেও ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত বোধ করবে। গল্পটি পড়ার পর আমাদের দেশে এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে কি-না সে বিষয়ে ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করা যায়। আমাদের সঙ্গে আফ্রিকার মিল ও অমিল নিয়ে বলা যেতে পারে।

অত্যাচারী এবং নীতিবোধবর্জিত একটি বৃহৎ জন্তুকে শায়েস্তা করার জন্য তার ভেতরে ঢুকে তাকে চিরকালের মতো খতম করে দেওয়ার কল্পনায় নিপীড়িত মানুষের সাহস ও কৌশলের যে পরিচয় পাই তা তাদের দীর্ঘকালের প্রতিরোধ সংগ্রামেরই ইংগিত দেয়। অরণ্যের তীরে লোকালয়, অরণ্যের ভেতর উনানানার সহজ গতিতে চলা, উনানানা ও তার ছেলেদের খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি আফ্রিকার মানুষের জীবনের প্রতিফলন। আমাদের দেশে প্রচলিত এই ধরনের গল্পের সঙ্গে উনানানার এই গল্পের পার্থক্য কোথায় এই নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রাণবন্ত আলোচনা হতে পারে।

দেওয়ানা মদিনা
মনসুর বয়াতি

লেখক পরিচিতি : বাঙলাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চল, বিশেষ করে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও হবিগঞ্জ জেলার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবাধীন বাঙলায় রচিত গ্রাম্য গাথাকাব্য মৈমনসিংহ গীতিকা বলে পরিচিত। মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম 'দেওয়ানা মদিনা'র রচয়িতা মনসুর বয়াতির জন্ম হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচঙের কদযশ্রী গ্রামে। তাঁর জন্ম সাল সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি দেখে অনুমান করা হয় যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো সময়ে কাব্যচর্চা করেছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস

লেখক পরিচিতি : সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন মহাকাব্য 'মহাভারত' প্রকৃতপক্ষে কোনো একজন ব্যক্তির লেখা নয়। মহাভারতে আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক তর্ক, গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে খৃষ্টপূর্ব ৫ম থেকে ৪র্থ শতাব্দির মধ্যে আদি মহাভারত রচিত হয়। পরবর্তী কালে অনেক কবি নিজেদের নাম গোপন রেখে এই মহাকাব্যে অনেক সংযোজন করেছেন।

হেক্টর উপাখ্যান
হোমার

লেখক পরিচিতি : গ্রীক ভাষার প্রাচীন দুইটি মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এবং 'অডিসি'র রচয়িতা হোমার-এর জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে পাশ্চাত্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী তর্ক চলে এসেছে। গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের অনেকগুলি শহরের অধিবাসীরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নিজনিজ শহরকে হোমারের জন্মস্থান বলে দাবী করেছেন। কোন শহরে তাঁর জন্ম তা এখন পর্যন্ত স্থির করা যায়নি। তবে তাঁর ভাষা, লেখার ভঙ্গি এবং তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি থেকে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে খৃষ্টপূর্ব ৯ম থেকে ৭ম শতাব্দির ভেতর কোনো সময়ে হোমার জীবন যাপন করেছেন।

সোহরাব রোস্তম
ফেরদৌসি

লেখক পরিচিতি : ফারসি ভাষায় রচিত মহাকাব্য 'শাহনামা'র লেখক আবুল কাসিম মনসুরের কবি-নাম ফিরদৌসি। তাঁর জন্ম ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে, জন্মস্থান ইরাণের

খোরাসান প্রদেশে কুস শহর। 'শাহনামা' রচনার জন্য সুলতান মাহমুদ শাহ গজনী তাঁকে এই কাব্যের প্রতি পঙক্তির জন্য এক স্বর্ণ-মুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করেননি। পরে সুলতান নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। কিন্তু প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক হাতে পাওয়ার আগেই ফিরদৌসির মৃত্যু হয় (১০২০ খ্রিস্টাব্দে)।

আবু হাসানের গল্প

লেখক পরিচিতি : 'আবু হাসানের গল্প' আরব্য রজনী বলে পরিচিত 'এক হাজার এক রজনী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এই গল্পগুলির লেখকের নাম বা উৎস জানা যায় না। তবে ১০ম শতাব্দির কোনো কোনো বইতে বইটির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে এইগুলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। 'এক হাজার এক রজনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শাহরজাদ নামে একজন উজিরজাদী স্বেচ্ছায় দেশের নিষ্ঠুর বাদশাকে বিয়ে করেন এবং স্বামীর হত্যাস্পৃহা দূর করার লক্ষ্যে প্রতি রাত্রে তাঁকে গল্প শোনান। এক হাজার এক রাত ধরে বলা গল্পগুলির একটি 'আবু হাসানের গল্প'।

ঝড়

লেখক পরিচিতি : ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়ার ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল এ্যাভন নদীর তীরে ছোট শহর স্ট্র্যাডফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরের গ্রামার স্কুলে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়, কিন্তু স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার আগেই তাঁকে ঢুকে পড়তে হয় পিতা জন শেকসপিয়ারের ব্যবসায়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল অভিনয় করার দিকে, নাটকের আকর্ষণে কিছুদিন পর তিনি লন্ডন শহরে চলে যান। লন্ডনের একটি নাট্যমণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে তিনি অভিনয় করতে শুরু করেন এবং এইসঙ্গে ঘটে নাটক লেখার সূত্রপাত। শেকসপিয়ারের লেখা নাটকের সংখ্যা ৩৭, এর মধ্যে বেশির ভাগই হল মিলনান্তক নাটক। এই ধরনের নাটকের মধ্যে 'কমেডি অব এররস', 'মিডসামার নাইটস ড্রিম', 'মার্টেন্ট অব ভেনিস', 'মাচ এডো এ্যাবাউট নাথিং' এবং টেম্পেস্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিলনান্তক নাটকের চেয়ে তাঁর বিয়োগান্তক নাটকের সংখ্যা কম, কিন্তু তাঁর গভীর জীবনবোধ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতেই। 'জুলিয়াস সিজার', 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' এবং 'ওথেলো' কেবল শেকসপিয়ারের নয়, কিংবা কেবল ইংরেজি ভাষার নয়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির অন্যতম। তাঁর সর্বশেষ রচিত নাটক 'টেম্পেস্ট' বা 'ঝড়' লিখিত হয় ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে। শেকসপিয়ারের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাগুলিও ইংরেজি সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। উইলিয়াম শেকসপিয়ারের মৃত্যু হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল তারিখে।

ডেভিড কপারফিল্ড

চার্লস ডিকেন্স

লেখক পরিচিতি : চার্লস ডিকেন্স ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে মাত্র বারো বছর বয়সেই তাঁকে কাজে ঢুকতে হয় একটি কালির কারখানায়। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই তিনি নিজে নিজে পড়াশোনা করেন। পার্লামেন্টের রিপোর্টার হিসাবে তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু, কিছুদিনের মধ্যেই হাত দেন উপন্যাস রচনায়। 'আলিভার টুইস্ট' তার প্রথম উপন্যাস। 'নিকোলাস নিকলবাই', 'দি ওল্ড কিউরিওসিটি শপ', 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'এ টেল অব টু সিটিজ,' 'গ্রেট এক্সপেক্টেশনস' প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য জীবিতকালেই তিনি বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনযাপন, সামাজিক অনাচার প্রভৃতি বিষয় তাঁর রচনায় সফলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যায় সামাজিক কাঠামোকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ লেখায়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাসে তাঁর নিজের শৈশবের চিত্র অনেকটা চিত্রিত হয়েছে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ডিকেন্সের মৃত্যু হয়।

হাতির পেটে লড়াই

লেখক পরিচিতি : হাতির পেটে লড়াই একটি আফ্রিকান লোকগাথা, এই গল্পটির লেখকের নাম বা উৎস সম্বন্ধে জানা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু ভাষাভাষীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় গল্পসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। জুলু ভাষার লোকগাথা ও লোকসংগীত দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশে, যেমন মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ে ও তানজানিয়ার লোকসংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছে এবং এই গল্পটির ওপর ভিত্তি করে রচিত গল্প, গান ও নৃত্য ঐসব দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়।

ছোটদের জন্য লেখা

মহানবীর কথা

মদীনার ঘরে ঘরে সেদিন শোকের ছায়া। মদীনাবাসী কারো মুখে হাসি নেই। পরম প্রিয়জন হারাবার বেদনায় সবাই কাতর।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) এর পুত্র হযরত ইবরাহিম (রা) ইন্তেকাল করেছেন। নবীজীর ঘরের দিকে শোকার্ত মানুষের স্রোত, মদীনাবাসী সবাই চলেছে হযরত ইবরাহিমের (রা) জানাজায় শরিক হতে।

হযরত ইবরাহিম (রা) ছিলেন মহানবী (স)র শেষ সন্তান। মাত্র দেড় বছরের মাসুম শিশু। তাঁর জন্মের কথা সবার মনে আছে। সেদিন মদীনাবাসীরা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেদিনও নবীজীর ঘরে সবাই ভীড় জমিয়েছিল নবীতনয়কে এক নজর দেখতে। তাঁর জন্মের সাত দিনের দিন দুটি ভেড়া জবেহ করে নবীজী তাঁর আকিকা দেন। হযরত পুত্রের নামকরণ করেন তাঁর পূর্বপুরুষ পয়গম্বর হজরত ইবরাহিম (রা)-এর নামে।

নবীতনয় দেখতে ছিলেন ফুলের মতো, তাঁর মন-ভুলানো হাসি, অবাক চোখের দৃষ্টি, তাঁর হাতপা ছুড়ে খেলা করা—সবই ছিল ভারি মনোহর। আজ মাত্র দেড় বছর হতে না হতে তাঁর অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে সবার বুকে যেন শেল বিঁধে যায়। চোখের পানিতে মানুষের বুক ভাসে।

এদিকে শহরের পথ, বাড়িঘর আবছা অন্ধকারে ঢেকে যায়। কি ব্যাপার? মদীনাবাসী ওপরে চোখ তুলে দেখে সূর্যের অর্ধেকটা কালো হয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে সূর্যের সবটাই কালো মিশমিশে হয়ে গেল। সবাই অবাক। আকাশে মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। অথচ সূর্যের সমস্ত আলো নিভে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল।

নবীতনয়ের মৃত্যুশোকে অধীর [লোকজন] এরকম অকালসূর্যাস্ত দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরাও দিনেদুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে এরকম সূর্য ডুবে যেতে দেখেন নি।

তখন তাঁরা ভাবলেন, হজরত ইবরাহিমের (রা) এন্তেকালে সূর্য বড় আঘাত পেয়েছে। মহানবী তো কেবল মানুষের নন, সমস্ত সৃষ্টির তিনি প্রিয়জন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সবাই তাঁকে ভালবাসে। মদীনাবাসী তাই বলতে লাগল, আমাদের নবীর পুত্রের ইন্তেকালে সূর্য এত ব্যথা পেয়েছে যে আজ আলো দেওয়াও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

নবীজীর কাছে এসে তারা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্। আপনার পুত্র হজরত ইবরাহিম (রাঃ) আজ নেই, আমরা এই শোক ভুলব কি করে? দেখুন, আপনার ছেলের শোকে সূর্যও কালো হয়ে গেছে। দুঃখে সে আজ আলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।'

হাতের ইশারায় নবীজী সবাইকে থামতে বললেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তিনি গভীর দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু তাই বলে শোকে তিনি কখনো ভেঙে পড়েন না। তাঁর বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ এক পলকের জন্যেও বিচলিত হয় না।

গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'তোমরা এসব কি বলছ? আল্লার নবী হলেও আমি একজন মানুষ। সূর্য চন্দ্র ঘোরে প্রকৃতির নিয়মে। প্রকৃতির নিয়মেই তারা অন্ধকার দূর করে, আবার ঐ নিয়মেই তাদের আলো কখনো কখনো ঢাকা পড়ে। কারো জন্মে বা মৃত্যুতে তারা আলো হারায় না। আমার পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যের আজকের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।'

আসলে সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ। সূর্যকে ঘিরে ঘুরে চলেছে পৃথিবী। পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে চাঁদ। সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী নিজেদের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে কখনো কখনো একটি অভিন্ন রেখায় চলে আসে। তখন পৃথিবীর ছায়া পড়লে সূর্যের একটি দিক আড়ালে পড়ে যায়। ঐ সময় পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গা থেকে সূর্যকে দেখা যায় না। ঐ অবস্থাই হল সূর্যগ্রহণ।

আমাদের নবী তাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে তাঁর নিজের সুখদুঃখের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। মহানবী পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে সত্যের পথ দেখাতে। পরম শোকের সময়ও নিজের শক্তি দেখাবার জন্যে তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেন নি। বরং সত্য প্রকাশের মহান দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

এখানেই মহানবীর মহত্ত্ব, এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

বেগম রোকেয়া

আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগের কথা। আমাদের দেশে একটি গ্রামে ছিল মস্ত বড় একটি জমিদার বাড়ি। একদিন বাড়ির ভেতরদিকের একটি ঘরে কি করে যেন আগুন লাগল। তখন দুপুরবেলা। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে শুয়েছিলেন বাড়ির গৃহিনী। আগুনের আঁচ লাগায় তিনি লাফিয়ে উঠলেন। দেখলেন ঘরের জানালায় আগুন ধরে গেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার জন্যে তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু দরজার কাছে হাজির হয়েছে অনেক লোক। তারা এসেছে আগুন নেভাতে। কিন্তু গৃহিনী সেখানে যাবেন কি করে? বড়বাড়ির গৃহিনী, তিনি কি আর পুরুষমানুষের সামনে বের হতে পারেন? তাই ফের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছুটে এসেছে ঘরের ভেতরে। আগুন ধরে গেল আলনায়, আলনা থেকে কাঠের বাকসে। গৃহিনী উপুড় হয়ে ঢুকে পড়লেন খাটের নিচে। তাতে কি আর রক্ষা পাওয়া যায়? খাটেও আগুন ধরতে দেরি হল না। এক নিমেষে মশারি, চাদর, তোষক, বালিশ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আগুন ধরে গেল খাটের পায়ে। দাউদাউ করে পুড়তে পুড়তে গোটা খাট খসে পড়ল গৃহিনীর শরীরের ওপর। তিনি চিৎকারও করতে পারলেন না, বড়ঘরের গৃহিনী তিনি, বাইরের মানুষের কানে তাঁর গলার আওয়াজ গেলে তাঁর অসম্মান হয়। আগুনে পুড়তে পুড়তে মহিলা নীরবে মারা গেলেন।

এটা কোনো কাল্পনিক গল্প নয়, এই মর্মান্তিক ঘটনা লেখা হয়েছে *অবরোধ-বাসিনী* নামে একটি বইতে। সেই সময়ের বাংলার মুসলমান মেয়েদের অনেক দুর্ভোগ আর কষ্টের কথা ঐ বইতে পাওয়া যায়। বইটি লেখেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। শুধু বই লিখেই তিনি হাত গুটিয়ে বসেছিলেন না। মেয়েদের ওপর নানারকম নির্যাতন আর তাদের কষ্ট ও দুর্দশা দূর করার জন্য তিনি একটানা কাজ করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

তখনকার দিনে আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন মুসলমান ঘরের মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করাকে মানুষ পছন্দ

করত না। সবাই ভাবত, ঘরের ভেতর থেকে মেয়েরা খালি ঘরের কাজকর্মই করবে। তাদের লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

মুসলমান মেয়েদের এই দুঃখ মোচনের ভার নিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। শৈশব থেকে তাঁর লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা ছিল প্রবল। কিন্তু বাড়িতে তিনি কেবল বাধাই পেয়ে এসেছেন।

১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে এক বনেদি জমিদার পরিবারে তার জন্ম। তাঁদের বাড়িটি ছিল বিশাল, একটা প্রাসাদ বললেই চলে। বাড়িতে কত ঘর, ঘরে ঘরে দামী আসবাবপত্র। পাইক বরকন্দাজ অনেক। সবই ছিল। ছিল না কেবল মেয়েদের লেখাপড়া করার ব্যবস্থা। ছেলেরা স্কুলে পড়ত, স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়তেও তাদের বাধা ছিল না। কিন্তু আপত্তি শুধু মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে।

বড় হতে হতে রোকেয়ার লেখাপড়া করার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কিন্তু ঐ বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া বলতে বোঝায় সামান্য একটু আরবি শেখা। অথচ জ্ঞান অর্জনের পিপাসা তো রোকেয়ার মেটে না। কিন্তু পড়তে গিয়ে ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি। রোকেয়া তাই পড়তে বসতেন অনেক রাত্রে। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি ঘরে আলো জ্বালিয়ে পড়তেন রোকেয়ার বড়ভাই ইব্রাহিম সাবের। সারা বাড়িতে কেবল এই একটিমাত্র মানুষ রোকেয়ার পড়াশোনার আগ্রহে খুশি। গভীর রাত্রে উঠে এসে রোকেয়া পড়তে বসতেন তাঁর পাশে। ভাই পড়া দেখিয়ে দিচ্ছেন আর বোন পড়ছেন এক মনে। সারারাত ধরে পড়তেন। আবার কেউ টের পাবার আগেই ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে চুপ করে চলে যেতেন নিজের বিছানায়।

একটু বড় হলে রোকেয়ার বিয়ে হল বিহারের সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। স্বামী প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন, রোকেয়াকেই সেবা করতে হত। কিন্তু এর মধ্যেও নিজের লেখাপড়ার কাজ ঠিকই চালিয়ে গেছেন। স্ত্রীর লেখাপড়ার দিকে এই ঝোঁক দেখে সাখাওয়াৎ হোসেন কিন্তু আনন্দিত হন। রোকেয়াকে ইংরেজি শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে।

কিছুদিন পর স্বামীর মৃত্যু হল, রোকেয়া চলে এলেন কলকাতায়। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে নিজে পদে পদে বাধা পেয়েছেন, এবার ঠিক করলেন মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করবেন তিনি নিজেই। স্বামী তাঁর জন্য কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়ে গড়ে তুললেন মেয়েদের স্কুল, নাম দিলেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

কিন্তু স্কুল করলেই কি আর ছাত্রী পাওয়া যায়? অভিভাবকেরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না। তাঁরা ভাবেন বাড়ি থেকে বাইরে বেরুলেই মেয়েদের পর্দা নষ্ট হবে। রোকেয়া ঘরে ঘরে ঘুরে মেয়েদের তাঁর স্কুলে ভর্তি করাবার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করেন, কাকুতি মিনতি করেন। কেউ কেউ তাঁর অনুরোধ

রাখেন, আবার কেউ কেউ ভাবেন স্কুল আর বাড়ি আসা যাওয়া করার সময় মেয়েদের সবাই দেখে ফেলবে, তা হলে পাপ হবে। রোকেয়া তখন তাদের জন্য পর্দা-ঘেরা গাড়ির ব্যবস্থা করলেন।

রোকেয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় স্কুলে মেয়েদের সংখ্যা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। আবার স্কুলে পড়াশোনা করে মেয়েদের ধর্মীয় গোঁড়ামি কাটতে লাগল। তারাও নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে রাজি করিয়ে তাদের মেয়েদের স্কুলে নিয়ে এল।

স্কুলের জন্য রোকেয়ার খাটনির আর শেষ নেই। নিজের শরীরের দিকে নজর দেওয়ার মত সময় কোথায় তাঁর? এত কাজ করার মধ্যেও তিনি আবার সাহিত্যচর্চাও করে গেছেন নিয়মিত। বেশ কয়েকটা বইও লিখেছেন তিনি। ঐসব বইতে আমাদের দেশের মেয়েদের কষ্টের কথা, তাদের ওপর অত্যাচারের কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির ইঙ্গিতও পাই তাঁর প্রতিটি বইতে।

নাটোর ঘুরে আসি

মেজোআপার হাতের ধাক্কায় চমকে উঠলাম। 'দ্যাখ, দ্যাখ, চলন বিল।'

বাসের একটানা দুলুনিতে ঘুম-ঘুম লাগছিল। আপার ডাকে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি রাস্তার দুই পাশে পানি। পানি আর পানি।

এটাই তা হলে চলন বিল? এর কথা কত শুনেছি। 'চলন বিলের বীরু ডাকাত' নামে একটা বইও পড়েছি। কিন্তু এখানে ডাকাত কোথায়? এখন তো দেখছি বিলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। সকালবেলা রওয়ানা হয়েছি বগুড়া থেকে, সেই রাস্তা এসে পড়েছে বিলের ভেতর, তাই ধরে আমাদের বাস চলেছে সোজা নাটোরের দিকে। পেছনের সিট থেকে আব্বা বললেন, 'অন্য সময় বিলে চাষবাস হয়। ধানের সময় ধান, গমের সময় গম। এখন ইরি ধান হয়েছে।'

খেয়াল করে দেখি, তাই তো পানির নিচে ধানের শিস হাবুডুবু খাচ্ছে। যতদূর চোখ যায় কেবলি পানি। বিলের ভেতর উঁচু জায়গাগুলো পানির ভেতর দ্বীপের মতো কোনোমতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ডাঙার মাটি ঝুরঝুর করে পড়ে যায়। বাতাসে একটু একটু কাঁপে কুঁড়েঘরের পাশে কলাগাছের লম্বা সবুজ পাতা। খড়ে-ছাওয়া ঘরগুলোর ভেতর কিছু দেখা যায় না। বাসের সঙ্গে সাঁ সাঁ করে ছুটে যায় দূরের ঘরবাড়ি। অসহায় চোখে পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে গরুবাছুর। পাশে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাখাল ছেলে। আমাদের বাস চলে, বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওড়ে পানকৌড়ি আর সাদা বক।

'ঐ যে মাছরাঙা।' মেজোআপা আঙুল দিয়ে ইশারা করতে না করতে একটি পাখি বিলের পানিতে ছোঁ মেরে ঠোঁটে মাছ নিয়ে উড়ে গেল অনেক ওপরে, ভালো করে দেখতেই পারলাম না। দেখতে দেখতে বাস এসে যেখানে থামল সেখানে কয়েকটি পাকা বাড়ি। কি ব্যাপার, নাটোর কি এসে পড়ল?

না। দোকানপাটের মাথায় ঝোলানো সাইনবোর্ড পড়ে বুঝলাম জায়গাটার নাম সিঙড়া। আব্বা বললেন, 'সিঙড়া। উপজেলা সদর।' বাস থেকে কয়েকজন

যাত্রী নামে। নতুন যাত্রী ওঠে আরো বেশি। বাস ফের চলতে শুরু করে, বিল সরে যায় আরো পেছনে। এবার দুই দিকে গ্রাম। গ্রামের ভেতর বাড়িঘর, মানুষজন আর গরুবাছুর। মাঝে মাঝে ঘন সবুজ গাছের সারি। মাঝে মাঝে গাছড়া আর ঝোপজঙ্গল। বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে গ্রামের ভেতর। রাস্তার পাশে পানির ধার ঘেঁষে বাঁশের মাচায় বসে লোকজন গল্প করে। তাদের কথা শুনতে পাই না, মুখ দেখে অনুমান করি বন্যা তাদের মন খারাপ করে দিয়েছে। ধান ডুবে গেল, সারা বছর খাবে কি?

রাস্তার দুইপাশে পাকা বাড়ির সংখ্যা বাড়ে। কয়েকটা করে রিকশা চোখে পড়ে। একটা সরকারি জিপের পেছনে ট্রাকের ওপর একটা স্পিড-বোট দেখে হেসে ফেলি, আপাও হাসে। এরা নিশ্চয়ই বিলের দিকে যাচ্ছে। আরো কয়েকটা গাড়ি চোখে পড়লে জিপ আর ট্রাকের ওপর স্পিড-বোটের কথা মনে থাকে না। নাটোর এসে পড়লাম। মনটা ছটফট করে। এখানেই ছিল রানী ভবানীর বাড়ি। শুনেছি সে অনেক দিন আগেকার কথা। কাল রাত্রে আব্বা বলেছিলেন, 'দুশো বছরেরও আগে।'

'তখন কি পাকিস্তানী আমল?' আমি জিজ্ঞেস করতেই মেজোআপা হেসেই অস্থির, আমি ভুলভাল কিছু বললেই আপা এইভাবে লজ্জা দেয়। এরকম ঠাট্টা করার মানে হয়? আমি কটমট করে আপার দিকে তাকালে আব্বা বললেন, 'তার অনেক আগে। ব্রিটিশ আমলও তখন শুরু হয়নি।'

সেই দুশো বছর আগের সময় যে কেমন ছিল, কে জানে? ইস। জাদু দিয়ে যদি চট করে একবার ঐ সময়টা দেখে আসা যায় তো কি মজাই যে হত।

বাস থেকে নেমে সবাই মিলে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। এখানকার কাঁচাগোল্লার খুব নাম। কি সুন্দর তার স্বাদ। এক প্লেট খেয়ে আশ মেটে না। কিন্তু আপাটা পিছে লাগল, 'তাড়াতাড়ি নে। শুধু খেতেই এসেছিস নাকি?' কি করি, প্লেট থেকে হাত গুটিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। বাইরে এসে রিকশায় উঠলাম। আব্বা দুটো রিকশা নিলেন, একটায় আমি আর মেজোআপা, অন্যটায় আব্বা। আমাকে আব্বার কোলে বসতে হল না বলে কি যে ভালো লাগছিল।

রিকশা এসে দাঁড়াল বিশাল এক প্রাসাদের ফটকে। রানী ভবানীর বাড়ি এত বড়? না, আব্বা বললেন, এটা রানী ভবানীর বাড়ি নয়। তাহলে? এটা হল দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ি।

আমি ফস করে বলে ফেললাম, 'রাজা দিঘাপতিয়া কি এই বাড়িতেই থাকেন?' মেজোআপার খিলখিল হাসি শুনে বুঝলাম আবার বোকার মতো কথা বলেছি। আপা বলল, 'হ্যাঁ, রাজা রানী তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলে আপা ফের হাসতে লাগল। আব্বা বললেন, 'দিঘাপতিয়া একটা জায়গার নাম। এটা ছিল দিঘাপতিয়ার জমিদারদের বাড়ি। জমিদারি অনেক আগেই উঠে গেছে। জমিদাররাও নেই।'

ফটকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আব্বার কাছেই শুনলাম এই প্রাসাদটির নাম এখন উত্তরা গণভবন। এখন বাংলাদেশ সরকারের অতিথি ভবন। মাঝে মাঝে এখানে মন্ত্রিপরিষদের সভা হয়। বিশাল ফটকের দুই পাশে লম্বা পামগাছের সারি। এর মাঝে দিয়ে ভেতরে গেলে ইট ও পাথরে তৈরি প্রাসাদের মস্ত বড় দালান।

সামনে মস্ত একটা ঘড়ি দেখে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। কত উঁচু ছাদ। ওপরে উঠে একটার পর একটা কামরা পার হয়ে চলতে থাকি, পায়ের নিচে পাথরের মেঝে। উঁচু ছাদের সিলিঙে ঝুলছে বড় বড় ঝাড়বাতি। আমাদের পায়ের আওয়াজে সেখানে টুংটাং প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ঘরে ঘরে সব পাথরের টেবিল, টেবিল ঘিরে জমকালো চেয়ার। দেওয়ালে টাঙানো জলরঙের বড় বড় ছবি। এরই মধ্যে আবার কোথাও কোথাও দেখি আধুনিক আসবাবপত্র, বর্তমান কালের জননেতাদের ছবি। একবার পুরনো দিন, আবার নতুন দিনের জিনিসপত্র। এই সেকাল, আবার এই চলে আসে একাল।

উত্তরা গণভবন থেকে বেরিয়ে ফের রিকশা। এবার নাটোরের রানী ভবানীর বাড়ি। এই প্রাসাদটি আরো পুরনো। এর জীর্ণদশা শুরু হয়েছে। ফটকের ভেতর পা দিয়েই চোখে পড়ে মন্দির। ঐ প্রাসাদেই দেখাশোনার কাজ করেন এক ভদ্রলোক, তিনি আমাদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর গল্প শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে চলি। এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে পৌঁছে যাই আর একটি দালানে। মোটা মোটা দেওয়াল, দেওয়ালের জায়গায় [জায়গায়] লোনা ধরেছে। ঘরগুলো কেমন অন্ধকার অন্ধকার ঠেকে। দেওয়াল থেকে হিমেল হাওয়া লেগে শরীরটা ছমছম করে ওঠে। মনে হয় অদৃশ্য কেউ যেন নিশ্বাস ফেলছে।

দেখতে দেখতে কখন যে একটি ঘণ্টা কেটে গেছে বুঝতেও পারিনি। একটা দালান থেকে নিচে পা দিতেই দেখি সামনে বিশাল পুকুর। এর নাম মায়ের দিঘি। রানী ভবানী কি এর ঘাটে কখনো বসতেন? এখন তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। এখন এখানে মাছের চাষের আয়োজন করা হচ্ছে। দিঘির পাড় দিয়ে রাস্তা 'রে হেঁটে ফের চলে আসি বড় ফটকে। ফের রিকশা। এবার ফেরার পালা। রিকশায় উঠে বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওয়ানা হই।

ঢাকার চিঠি

১৬/৪ আমলিগোলা লেন
লালবাগ, ঢাকা
১৬.৮.১৯৯২

প্রিয় নার্গিস,

বেশ কয়েকদিন হল আব্বা আম্মার সঙ্গে আমি ঢাকায় এসেছি। এবার আমরা উঠেছি মেজচাচার বাসায়। মেজচাচারা থাকেন শহরের পুরনো এলাকায় লালবাগে।

লালবাগে থাকায় আমার খুব একটা সুবিধা কি হল জান? পৌঁছুবার পরদিন সকালেই মেজচাচার সঙ্গে বেরুলাম লালবাগের কেল্লা দেখতে। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে দুই মিনিট হাঁটতেই লাল ইটের মোটা দেওয়ালে ঘেরা লালবাগ কেল্লা। তিনশ' বছর আগে এই কেল্লা তৈরি করেন শায়েস্তা খাঁ। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী আর শায়েস্তা খাঁ ছিলেন বাংলার সুবেদার। এত আগে তৈরি কেল্লায় পাতলা ইটের দালান দেখতে ভারি ভালো লাগে। একদিকে বিরাট চারকোনা পুকুরের পাশে রাখা হয়েছে ভারী ভারী সব কামান। দোতলা একটি দালানের ওপর তলায় সেই আমলের বাসনকোসন, অলঙ্কার আর অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কেল্লার ভেতরেই একটি মসজিদ, মসজিদের দেওয়ালে কি সুন্দর কারুকাজ।

এখান থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম চকবাজার। মোগলদের সময় চকবাজার ছিল ঢাকা শহরের কেন্দ্র। ঐ আমলে তৈরি পুরনো মসজিদের কাছে একটি দোকানে আমরা পনির-দেওয়া বাকেরখানি খেলাম। এই বাকেরখানি খেতে যে কত মজার তা নিজে না খেলে বুঝবে না।

কাছেই একটা পুরনো দালান দেখলাম, নাম বড় কাটরা। এদিকে একটু বেলা হয়েছে আর চকবাজারে ভিড়ও বেড়ে গেছে খুব। বড় ট্রাক, ছোট ট্রাক, ঠেলাগাড়ি,

ভ্যানগাড়ি আর রিকশার ভিড়ে পথ চলাই কঠিন। এইসব কাটিয়ে আমাদের রিকশা চলল ধীর গতিতে। যেতে যেতে মেজচাচা আহসান মঞ্জিলের উঁচু ফটকটা দেখিয়ে দিলেন।

সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে গিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর কত যে নৌকা দেখলাম তা ভাই গুণে শেষ করা কঠিন। টার্মিনালে কিছুক্ষণ পর পর লঞ্চ ভিড়ছে, আবার ছেড়েও যাচ্ছে দেশের কোন কোন ঘাটের উদ্দেশে। সদরঘাটে ভিড়ের মধ্যে হেঁটে চলে গেলাম লক্ষ্মীবাজার বাহাদুর শাহ পার্ক। পার্কের পাশেই বাসস্ট্যান্ড। আমরা উঠতে না উঠতে বাস ছেড়ে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল সাদা একটি গির্জা। গির্জার মাথায় বড় ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িতে সময় দেখার আগেই বাস সামনে এগিয়ে গেছে।

বাস থেকে নামলাম গুলিস্তান সিনেমার কাছে। এখানেও ভিড়। তবে রাস্তা বেশ চওড়া, তাই পুরনো শহরের মতো অতটা ঘিঞ্জি নয়। ফুটপাথ ধরে রাস্তার দুই পাশে দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম স্টেডিয়াম। গোল স্টেডিয়াম ঘিরে দোকানপাট দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা দরজা চোখে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখি কি সুন্দর সবুজ মাঠ। চোখটা জুড়িয়ে গেল। এখানে একটা খেলা দেখার সাধ আমার বহুদিনের। কিন্তু এবারে বোধহয় সেই সাধ আর মিটবে না।

স্টেডিয়ামের পাশেই ঢাকার সবচেয়ে বড় মসজিদ বায়তুল মুকাররম। মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে বাস পাওয়া গেল। বাসে ভিড়, বসার জায়গা নেই। কি আর করি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুদিকের জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি আমাদের বাস চলেছে মস্ত দুটো বাগানের ভেতর দিয়ে। আসলে চওড়া রাস্তার দুইপাশে ঐ দুটো হল রমনা পার্ক আর সোহরোয়ার্দি উদ্যান। বাসের ভেতর থেকে দুদিকের জানালা দিয়ে দেখতে গিয়ে যাত্রীদের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খাই। এক ভদ্রলোক ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকতে পার না?'

শাহবাগে বাস থেকে নেমে একটু হেঁটে আমরা গেলাম জাদুঘরে। জাদুঘরের দালানটা বিরাট, এর সিঁড়িগুলো খুব চওড়া। ভেতরে দেখার জিনিস অনেক, ঘণ্টাখানেক ঘুরে ঘুরে দেখেও বেশির ভাগই বাকি রয়ে গেল। ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তার দোকান থেকে মেজচাচা ফুল কিনলেন। কাছেই কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর। কবরে ফুল দিয়ে রাস্তা পার হলাম। এবার শিশু পার্ক। শিশু পার্কে যাওয়া আমার কতদিনের স্বপ্ন।

শিশুপার্কের ভেতরে ঢুকে কি ভালোই যে লাগল। নাগরদোলায় চেপে একটু ভয় ভয় করছিল, কিন্তু ভয়ের চেয়ে মজাই বেশি। ছোট ট্রেনে চাপলাম। আরো অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পরদিন মেজচাচা চলে গেলেন অফিসে। আমি বেরুলাম আব্বার সঙ্গে। প্রথমে দেখতে গেলাম ঢাকেশ্বরী মন্দির। এটা ঢাকার সবচেয়ে পুরনো মন্দির। এখান

থেকে রিকশা করে সোজা কার্জন হল। ইংরেজ আমলের দালান, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হয়। কার্জন হলের উল্টোদিকে হাই কোর্ট। পাশে শিশু একাডেমি। এখান থেকে ছোটদের অনেক বই প্রকাশ করা হয়। রাস্তার মোড়ে জোড়া দোয়েলের মূর্তি, দোয়েল দেখতে দেখতে উপস্থিত হলাম শহীদ মিনারে। ছবিতে শহীদ মিনার কত দেখেছি। কিন্তু শহীদ মিনারের চত্বরে চারদিকে দেখার আনন্দই আলাদা। এদিকে সবটাই বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-ভবন তখন নিরিবিলি। অপরাজেয় বাংলা নামে মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে আব্বা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে রয়েছেন দৃপ্ত ভঙ্গিতে। আব্বার বোধহয় মনে পড়ে গিয়েছিল আমার বড়চাচার কথা। আমার জন্মের অনেক আগে পাকিস্তানী শত্রুবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হন।

আজ ঢাকায় আমাদের শেষ দিন। আম্মার সঙ্গে স্কুটারে ফুলবাড়িয়া এসে উঠলাম একটা দোতলা বাসে। দোতলায় জানালার পাশে বসে আমার ভারি মজা হল। রাস্তার অনেকটা দেখা যাচ্ছিল। নামলাম চিড়িয়াখানার সামনে। নার্গিস, চিড়িয়াখানটা দেখবার মতো। ভেতরে এলাকা এত বড় যে হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়। বাঘ, ভালুক, জেব্রা, জিরাফ, বানর, অজগর সাপ আর কত রকমের পাখিই যে দেখলাম সব মনে রাখাই মুশকিল। বানরের খাঁচার সামনে ছেলেমেয়েদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শুয়েছিল গম্ভীর হয়ে। খাঁচার ভেতরে থাকাটা তার যে একটুও পছন্দ নয় তা ঐ মুখ দেখেই বোঝা যায়।

ফেরার পথে নামলাম আসাদ গেটে। ঢাকার সবচেয়ে চওড়া রাস্তায় হেঁটে হেঁটে আমরা সংসদ ভবন দেখলাম। এর একদিকে চমৎকার একটি লেক। এখানে আমার আরো বেড়াতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমাদের চারদিকে ফুটে ওঠে অজস্র আলো। বাসে ওঠার জন্যে ফার্মগেট পর্যন্ত হাঁটতে হল। অনেকটা পথ। কিন্তু সাজানো গাছপালা, আলো আর লোকজন দেখতে দেখতে পথ যে কখন ফুরিয়ে গেল টেরই পেলাম না।

আমরা আগামীকাল যাচ্ছি ফরিদপুর। সেখানে তিন দিন থেকে সোজা বাড়ি।

আমরা ভালো আছি। আশা করি তোমার ছুটি ভালো কাটছে। তোমার আব্বা আম্মাকে আমার সালাম দিও। তুমি আমার ভালোবাসা জানবে। ইতি।

আফরিন

নার্গিস আরা ইসলাম
প্রযত্নে জনাব আনিসুল ইসলাম
গ্রাম : ইমামগঞ্জ
ডাকঘর : শৈলকূপা
জেলা : ঝিনাইদহ

বই পড়ার আনন্দ

ছুটির ঘণ্টা বাজল। কাল থেকে স্কুল বন্ধ, গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেল। স্কুল থেকে বেরোতে বেরোতে কবিরকে বললাম, 'ছুটিটা কি এখানেই কাটাবি?'

'কোথায় যাব? কেন, তুই এখানে থাকবি না?'

'না। মামাবাড়ি যাচ্ছি।' বলতে বলতে খুশিতে আমি একেবারে আত্মহারা। বললাম, 'পরশু সকালবেলা ট্রেন। তুই কখনো ট্রেনে চড়েছিস?'

কবির সগর্বে বলল, 'তিন বার।'

'আমি এখনও ট্রেনে উঠি নি।' কিন্তু পরশুই তো উঠব, তাই আর মন খারাপ করলাম না। কবিরের সঙ্গে একটু গল্প করে বাড়ি ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি মার সঙ্গে বসে গল্প করছেন মামা আর মামী। ওদের দেখে আমি অবাক। একটু দমেও গেলাম বৈ কি। ওঁরাই চলে এসেছেন, তা হলে আর আমার মামাবাড়ি যাওয়া হয় কি করে? কাছে গিয়ে সালাম করে বললাম, 'তোমরা কখন এসেছ মামা?'

আমার মাথায় হাত রেখে মামী হাসলেন, 'তোদের এবার যাওয়া হল না, টোকন। একটা জরুরি কাজে আমরাই এখানে চলে এলাম।'

নিজের ঘরে আসতে আসতে আমার চোখে পানি এসে গেল। এর আগে মামাবাড়ি গিয়েছি বাসে, এই প্রথম ট্রেনে যাওয়া হচ্ছে, ট্রেনে যাওয়ার স্বপ্ন আমার কতদিনের। সবাইকে বলেছি এবার মামাবাড়ির আশে-পাশে বনেবাদাড়ে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াব। নাঃ। কিছুই হল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাতে ভালো করে ঘুমও হল না, ছোটোচাচার পাশে শুয়ে ছটফট করে কাটালাম।

পরের দিন সকালবেলা মুখ গোমড়া করে বসে রইলাম। দুপুরে ছোটোচাচা নতুন একটা বই আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো।'

বইটা দেখতে ভারি সুন্দর। মলাটে ঝোপঝাড়ের ভেতর দুটি ছেলেমেয়ের ছবি আঁকা। ভেতরে খুলতেই কি সুন্দর গন্ধ। নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে পড়তে শুরু করেছি নিজেও জানি না।

অপু নামের একটি ছেলে তার বাবার সঙ্গে গ্রামের বাইরে মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাচ্ছে। ঝোপঝাড়ে ঘেরা মাটির সরু পথ। ভাঁটফুল আর বৈঁচির ঝোপে লাফিয়ে পালায় খরগোশ। ছবির বইতে অপু বড় বড় কানের খরগোশের ছবি দেখেছে। ঘাসের ভেতর জ্যান্ত খরগোশের দেখা পেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। নদীর ধারে বাবলা গাছের আড়ালে ভাঙা ইটের পাঁজা। অপুর বাবা বললেন, এখানে ইংরেজদের কুঠিবাড়ি ছিল। কাছেই কুলগাছের নিচু ডালে কুল পেকে লাল হয়ে রয়েছে। বাবলার ডালে বসে দোল খাচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি।

পড়তে পড়তে আমিও যেন নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে লাগলাম। তারপর বইতে কাশবনের ভেতর দিয়ে বোনের সঙ্গে অপু একদিন গেল রেলগাড়ি দেখতে, আমার মনে হল আমিই যেন আমার বোন নাজনীনের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি। পড়ি আর অবাক হই। আমার মামাবাড়ির গ্রাম হুবহু এইরকম। বইয়ের মধ্যে দিয়ে সেই গ্রামটিকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যেসব জায়গা দেখেছি একটু দূর থেকে, বইটা পড়তে পড়তে যেন সেই সব জায়গার ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলাম।

'আম-আঁটির ভেঁপু' পড়া শেষ হলে কেবলি মনে হতে লাগল, আহা, গল্পটার আর একটু যদি থাকত। উঠতে বসতে শুধু বইটার কথাই মনে হয়, অপু, দুর্গা, ওদের বাবা মা সবাই যেন খুব চেনা মানুষ হয়ে গেল। ওদের কথা ভাবি, ভাবতে ভাবতে ফের প্রথম থেকে পড়তে শুরু করি।

ছোটোচাচা আড়চোখে দেখেন, কিছু বলেন না। তিন দিন পর তিনি নিয়ে এলেন আর একটা বই। এই বইটার নাম *'ক্ষীরের পুতুল'*। এর মলাটও ভারি সুন্দর। লেখকের নাম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটা আবার অন্য ধরনের গল্প। এখানে রাজা রানী আছে, রাজবাড়ির কথা আছে। কিন্তু, দুয়োরানীর দুঃখের কথা পড়তে পড়তে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। আবার গল্পে একটা বাঁদর আছে, তাকে মনে হয় খুব চালাক আর ভালো একটা মানুষ। তারপর তারই চালাকিতে ক্ষীরের পুতুল কি করে সত্যিকার ছেলে হয়ে গেল তাই পড়ে কি যে ভালো লাগে। সেই অন্যরকম ঘটনাও আমি যেন চোখের সামনে ঘটতে দেখি। এই বই একবার শুরু করে আর ছাড়তে পারি না। বিকালবেলা খেলার বন্ধুরা এসে ফিরে গেল। বই শেষ করে উঠে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন।

রাত্রে ছোটোচাচার সঙ্গে শুয়ে বললাম, 'ছোটোচাচা, আর একটা বই দাও না।'

চাচা বললেন, 'অত গল্পের বই পড়ে না। হোমটাস্কের অঙ্ক করতে হবে না?'

'অঙ্ক করলে বই দেবে তো?'

চাচা বললেন, 'আগে কর তো। দেখি কটা অঙ্ক কাল সারাদিনে করতে পার।'

সত্যি কথা বলি, গল্পের বই পাওয়ার লোভেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনেকগুলো অঙ্ক করলাম। বিকালে আম্মা বললেন, 'সন্ধ্যাবেলা বাংলা পড়ে আমার কাছে পড়া দিও। ভালো করে পড়লে আজ আমি একটা বই দেব।'

সন্ধ্যা হতে না হতে বাংলা বই খুলে বসলাম, বই থেকে আম্মা পড়া ধরলে ঠিক ঠিক জবাবও দিলাম। আলমারি থেকে আম্মা খুঁজে বের করলেন একটা পুরনো বই,

এটা নাকি তাঁর ছেলেবেলায় পড়া। মলাটটার মলিন চেহারা, ভেতরের পাতাগুলোও একটু লালচে হয়ে এসেছে। অত উৎসাহ পেলাম না। কিন্তু বই পড়ার নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। রাতের খাওয়া সেরেই পড়তে শুরু করলাম। এখানে রাজপুত্র কি সাহসী! কোন দেশের বন্দি রাজকন্যাকে দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করতে নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে সে ছুটে চলেছে কোথায় কোথায়। মশারির ভেতর বসে রূপকথার বই পড়ি আর ভয় ভয় করে। মস্ত এক দৈত্য, তার লম্বা দুটো শিং, আঙুলের নখ সব কোদালের মতো বিরাট বিরাট। রাজকুমারীকে সে বন্দি করে রেখেছে বনের ভেতর রাজপুরীর ছোট একটি ঘরে। রাজকুমার তার খবর পায় ঐ বনের একটা গাছের নিচে বসে। গাছের ডালে বসে গল্প করছিল বেঙ্গমা আর বেঙ্গমী। তাদের গল্প থেকেই জানতে পেরে রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল দৈত্যপুরীর দিকে। দৈত্য ঘোরাফেরা করছিল তার বাড়ির আশেপাশে। রাজকুমারের গন্ধ পেয়ে সে মার মার করে ছুটে এল, বলল, হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।

পড়ি আর আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এই বুঝি দৈত্য এল রে। এসে সে দুজনকেই মেরে ফেলবে। কিন্তু সাহসী রাজকুমার বুদ্ধি করে ঝাঁপ দেয় দৈত্যপুরীর পুকুরে। সেখানে পানির অনেক নিচে একটা বাক্স আছে। বাক্সের ভেতর সোনার কৌটা। সেই কৌটায় লুকানো রয়েছে দৈত্যের প্রাণ-ভ্রমরা। ভ্রমরটি মেরে ফেললেই দৈত্য মারা যাবে। পড়তে পড়তে আমার বুক কাঁপে, রাজকুমার তাকে মারতে পারবে তো?

মামাবাড়িতে যেতে না পারার দুঃখ আমার আর এতটুকু রইল না। বই পড়ে পড়ে মন খুশিতে ভরে উঠল। বড়োআপা খুব কবিতা পড়েন। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে পড়ে ফেললাম কাজী নজরুল ইসলামের ছোটোদের কবিতার বই। 'ঝিঙে ফুল' কবিতাটা এত ভালো লাগল যে বারবার পড়ে একেবারে মুখস্থ করে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছবির অনেকগুলি কবিতাই সবটা বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাতে কি? পড়তে তো ভালো লাগে। আম্মা বলেন, বড় হলে বুঝব। *'আবোল তাবোল'*-এর কবিতা কিন্তু ভারি মজার। পড়তে গেলেই কেবল হাসি পায়।

আব্বা পর্যন্ত আমার বই পড়ার এই ঝোঁক লক্ষ করেছেন। একদিন আমার জন্যে এনে দিলেন নতুন দুটো বই। *'সাগরতলের জগৎ'* আর *'আকাশের রহস্য'*। প্রথম বইটা পড়তে গেলে একটু হোঁচট খাই। এখানে তো ঠিক আগের বইগুলোর মতো কোনো গল্প নেই। কিন্তু কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়তেই সাগরতলের জগৎ আমাকে দারুণভাবে টানতে লাগল। পানির নিচে যে এতসব বিচিত্র প্রাণীর বাস তা আগে কখনো কল্পনাও করি নি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী যে নীল তিমি আর সে যে ডাঙায় না থেকে পানিতেই থাকে তা পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। হাঙর আর কত অজস্র রকমের মাছ, ঝিনুক আর শামুক আর কত সব প্রাণীর কথা জানতে পাই। মনে হয় আমাদের এই ডাঙার পৃথিবীর মতোই আর একটা পৃথিবী পানির নিচে বিরাজ করে। সেখানেও প্রাণীরা আমাদের মতোই জন্ম নেয়, খায় দায়, বড় হয়।

বেঁচে থাকার জন্য তাদেরও কম খাটতে হয় না। আবার ডাঙার মতোই তাদের জগতেও গাছপালা আছে, আমাদের পরিচিত গাছপালার সঙ্গে তাদের মিলও রয়েছে অনেক।

এই বই শেষ করেই হাতে নিই মহাকাশের রহস্য। যে আকাশ রোজ রোজ দেখি তাতে যে এত রহস্য, সেখানে যে আরো বহু হাজার জগতের অস্তিত্ব এসব কে জানত? রাতের বেলা আকাশ ভরা এত তারা দেখি, এই বই পড়ে জানতে পারি যে তাদের সংখ্যা কোটির ওপরে। এদের মধ্যে আছে নক্ষত্র আবার এদের মধ্যেই আছে আমাদের এই পৃথিবীর মতোই কতসব গ্রহ। পড়তে পড়তে ভাবি ঐসব গ্রহের কোনো কোনোটিতে হয়তো আমাদের মতো প্রাণীও বাস করে। তারা দেখতে কেমন? তারা কি আমাদের মতোই ভাবনা চিন্তা করতে পারে? তারাদের কত সব নাম। সপ্তর্ষিমণ্ডল, কৃত্তিকা, বৃশ্চিক, কালপুরুষ। মানুষ তো চাঁদে গিয়ে ঘুরে এসেছে বিশ বছর আগে। পড়েছি, মানুষের পাঠানো নভোযান অন্যান্য গ্রহের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। মানুষ কবে যেতে পারবে? সূর্যকে ঘিরে এই যে আমাদের সৌরজগৎ, একেও তো মানুষ একদিন অতিক্রম করে যাবেই। আব্বার কাছে আমি আবার বই চাই, মহাকাশের আরো কথা জানবার জন্যে খালি ছটফট করি। আব্বা বলেন, 'এখন নয়। আর একটু বড় হও। *'মহাকাশের ঠিকানা'* নামে একটা বই আছে। তোমার সামনের জন্মদিনে দেব।' আমার জন্মদিন তো গেল মোটে তিন মাস আগে। সামনের বছরের জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি।

কবিতা

স্বপ্নে আমার জন্ম

ঘুম
শুধু ঘুম
আমার ছিলুম
সাত বিলিয়ন সাতাশশো ভাই;
শান্ত প্রবল তীক্ষ্ণ হাওয়া এলোমেলো
শিশির শরম, পূর্ব থেকে নরম আলো,
আমার বাবার মোমবাতিকে সবুজ কাঁপাই।
লবণ-লালে বলকানো পাপ আব্বা দিলো শান্ত সাঁতার
কাঁপা কাঁপা, অল্প তবু কি উদ্‌ভ্রান্তি গভীর ব্যথার
হাজারটা ভাই আকাশ উপুড় ওম্বে গাইছে তারার ফোঁটা,
জ্যোৎস্না রাতে ভাসছি সবাই এশার আজান হাওয়ায় লোটা।
গোলাপ থেকে, আপেল আমের আদর থেকে আগুন থেকে মায়ের ফেনা
নিষিদ্ধ সব গলি বেয়ে দিন রাত্রি বয়ে আনে, জীবন নামক জানাজাটা
'তারচে চলো শেষ হয়ে যাই।' ক্রেজি কণ্ঠ কাতর হলুম, 'ভাল্লাগেনা ভাল্লাগেনা'
বলতে বলতে ওয়েনিঙ স্বর তারার মতোন আত্মহত্যা করলো ওরা,
সাধও হলো, বিলীন হলো, দ্যাখো দ্যাখো নেই মানুষের নীরব ঝরা।
'আমিই একা, কী-যে করবো, হায় হায় এই চোপসানো ও লুপ্ত বুকে
ক্লান্ত ক্লাউন, আঁকাবাকা আঁধার ওম্বে একাই মরি ধুঁকে।
আম্মা তখোন বিবমিষায় উপুড় হলো দন্তবিহীন মুখে।
সাগর-শোষা, আগুন-আওয়াজ, কোরান-কালো আলোর গ্রহে
ল্যাজ গুটানো, নেই নেই লোম, ছিন্ন শিশ্ন, কুঁজো হয়ে
এদিক ওদিক করুণ তাকাই, গলিয়ে পড়ি,
সে উনিশশো তেতাল্লিশের ফেব্রুয়ারি।
বমির টুকরো মোহিত মগ্ন
ঘুমের মধ্যে ঘামি
লোনলি লগ্ন
আমি।

লাশ

নদীর ওপার বিজন মাঠে একটি কাঁচের ঘর
ডাক্তার হোসেন কাটছে কাহার লাশ?
উটের গ্রীবার মতোন আঁধার কাঁপালো থরথর
মধ্যরাতে নিলো না নিশ্বাস।
কে ছিলো এই লাশের মালিক? কোথায় ছিলো বাড়ি?
বাপমা ছিলো? বৌ ছিলো? সন্তান?
বলকানো তার লবণ-লালে কে দিয়েছে পাড়ি?
ক্রেজি-কণ্ঠে তিমিরবরণ গান?

বৃষ্টির পর

বৃষ্টি হলে কী ভাল্লাগলো, এখনো শন শন
হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ জুড়ে আলোর ইল্যুশন।
কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাব, উধাও হলুম তাই
পথ-হারাল, আঁধার হলো, মায়া গোটাটাই।

বৃষ্টিতে মন কেমন করে, কোথায় যেন কী
হারিয়ে এলুম, আজও সেটা ধরতে পারিনি।
সঙ্গে খুঁজি. অঙ্গে খুঁজি, একলা হলুম কালে,
নিঃসঙ্গে শূন্য বাতাস জুটল লবণ-লালে।

বৃষ্টি ভারি অচিন করে হঠাৎ হাওয়ার শ্বাস
এই শহরে আজকে আমার হাজার বছর বাস।

না

ক্লান্ত চোখে ক্লান্ত চোখের পাতা
তারো চেয়ে ক্লান্ত আমার পা,
যেথায় দেখি সাধের আসন পাতা
'একটু বসি?' জবাব আসে, 'না।'

এলেমজির জন্য শোক

আমার এল. এম. জি, এল. এম. জি, এলেমজি আজ
কোথায় গিয়েছ তুমি? কতোদূর, বলো কোন লোকে
নিরুদ্দেশ যাত্রা করো? শীতল শরীরে রক্ত শিখা
জ্বেলে দাও অন্ধকারে, ব্রাশ করো কোন সেক্টরে?
তোমার ট্রিগারে কার কিশোর তর্জনী টানে গান,
পূর্বজন্ম, মৃত্যু, সাধ? সুপ্তশিশ্ন ব্যারেলের কাম
এ্যামবুশ করে কার রক্তে? তুমি কার অধিকারে?

এলেমজি, তুমি ছিলে হাত জোড়া, বুক জুড়ে, বুক ভরে ছিলে।
তুমি ছিলে, ক্রোধ ছিলো; প্রতিহিংসা ছিলো; হৃৎপিণ্ডে
ঘৃণা; বাঁচবার নির্লজ্জ স্পৃহা। যাবার বেলায়
মহারাজ, ঠাণ্ডা ঠোঁটে শুষে নিলে সব, তুমিই তো
একদিন দিয়েছিলে। তুমি নাই, প্রতিহিংসা নাই;
ঘৃণা নাই; তুমি নাই, ক্রোধশূন্য বুক আজ ফাঁকা।
হৃৎপিণ্ড নিদারুণ খালি, বুক নাই, চাঁদে চাঁদ
নাই। স্পৃহাশূন্য হাতে কেউ এসে গুঁজে দেবে—নাই।

হে নটরাজ এবার তোমার নাচন থামাও

হে নটরাজ, এবার তোমার নাচন থামাও।
আর কতকাল নাচবে প্রভু? নাচন তোমার ভাল্লাগে না;
আর কতকাল?
আর কতকাল? এবার প্রভু ক্ষান্ত দেবে?
এখন তুমি আমায় ছাড়ো আমার কাছে।

আমার শরীর তোমারই মাল? তাও নিয়ে নাও,
ইচ্ছা হলে তাও নিয়ে যাও—
কেবল তুমি আমায় ছাড়ো আমার কাছে।
আমার দুঃখ আমার ঈর্ষা
আমার সেতার আমার শিরীষ—এবার তোমার নাচন থামাও।
এসব তোমার বিষয়-আশয়? তোমার জিনিস? সব নিয়ে নাও।
আমার যত প্রশ্ন ছিল নিরুত্তরেই ফিরিয়ে নিলাম;
কোরান-কালো জিজ্ঞাসা আর ভণ্ড স্মৃতি,
কাঙ্গাল সকল সাধ-সমাচার
১/১-এ হেয়ার স্ট্রিটের জানালা দিয়ে গড়িয়ে দিলাম।
তোমার বিষয়
তোমায় দিলাম। এবার প্রভু রেহাই দাও হে, রেহাই দেবে?

হে নটরাজ, রঙবাজি তো ঢের করেছো, আর কতকাল?
এখন তুমি আমায় ছাড়ো আমার কাছে।
সবটা তোমার জমিদারি? তাই নাকি হে? সবটা তোমার?
আমার আমি তোমার প্রজা?
তবে আর কি—তাও নিয়ে নাও। কেবল তোমার পায়ে পড়ি,
তোমার নাচন থেকে এখন আমায় বাঁচাও।
হে নটরাজ, এবার তোমার নাচন থামাও।

শোক সংবাদ

আসমত আলি, ৬৯, জীবদ্দশায় ছিল না কাহারো প্রিয়,
তবুও সামিল হয়ো জানাজায়, উহার কবরে এক মুঠি মাটি দিও।

আসমত আলি সরাইলের বিদ্রোহীসন্তান
বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট মুখ
মুখের রেখায় স্রোতবিহীন ভেংচি কেটে গেল
পূর্ণ ৬৯ বৎসর।
দিবসরাত্রি ছিল তাহার কেবলি হামলানো,
'চলবে না এ', 'এটা খারাপ'—
ওপরে পাশে লম্ফঝম্প, ফ্যাসফ্যাসে তার কণ্ঠে কেবল
বাসি এবং অম্ল ধ্বনির তোতলা বিস্ফোরণ,
'ঠিক, ন্ নয় এ', 'ওটা তো ভুল', 'চ্ চলবে না'।
নাটবল্টু ঝরে-পড়া ভাঙাচোরা জড়
জরাজীর্ণ গতর নিয়ে কোথায় ঘোরে
গজকে ভাবে মাইল, ভেবে হাজার মাইল ঝড়ের বেগে ছোটে।

গ্রামের তীরে মেঘনা নদী
বইছে নিরবধি।
রোজ সন্ধ্যায় নদীকে তার শাসানো চাই
'স্ সমুদ্র থাম! সারা আকাশ লাল সিগন্যাল জ্বালিয়ে দিলাম, থ
থামো তো!
আর কতকাল চ চ্লবে তুমি? এবার থামো!

তোমার জন্যে ওপার থাকে সারাজীবন ওপার
এপার থাকে এপার।
তুমি থামো, সমুদ্র হে থামো!'

তালপুকুরের ধারের টিলায় ট্রাফিক পুলিশ সে-ই;
সিগন্যাল দেয়, 'পাহাড়, তুমি স্টার্ট দাও তো, সামনে দ্যাখো
সবুজ জ্বলে বন-উপবন, এবার চলো।'
তোতলাতো সে, 'ট্রাফিক জ্ জাম, এবার চলো।'
'চলো, চলো, চ্ চলো হে, এবার চলো! পাহাড় গেলি?'

ঘুমের মধ্যে ঘুমায় সবাই এই তো নিয়ম। সে
ঘুমের মধ্যে হোঁচট খেয়ে হাঁটে।
'কে দিয়েছে এমন বিধান ঘুমের মধ্যে শোবে?'
কে বলেছে ঐ নিয়মই ভালো?'

২৯ জুন রাত্রিবেলা প্রচণ্ড বর্ষণ
আসমত আলি ঘুমিয়েছিল। ঘুমের মধ্যে উঠে
কোথায় গেল?
মাঠ পেরুলে নদী
মেঘনা নদীর কোন অতলে?
কোন স্রোতটার, কোন ঢেউটার প্রতিবাদে মুখর হয়ে তোতলাতে তোতলাতে
স্রোতের ভিতর গভীর স্রোতে মগ্ন হলো
আসমত আলি কাহার প্রতিবাদে?

ডিসেম্বরের বেলা

ডিসেম্বরের বেলা দেখতে দেখতে টেনে নেয় পাখা।
সূর্য পুরুষটি রোগা হাড্ডিসার, দিনমান গতরটা কুয়াশায় ঢাকা,
কখনো কখনো কাঁথা ছিঁড়ে গেলে পানসে রোদের ঘোলা জল
দেখা যায়, তাও চেটে খায়। কররেখা করে টলমল :
কিছুই তো করা হলো নাকো।

সন্ধ্যার নিয়মে আসে সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যাকাল রাত্রিতে গড়ায়।
'জাগো'—এই অনুরোধ করে এক স্বপ্ন সাবালকদের ঠাসা ভিড়ে
কোথায় গা ঢাকা দিল। কোথায় যে খুঁজি তাকে! চেনা নেই রাস্তাঘাট,
যাইনি তো মাঠে নদীতীরে।
ঘুমের অন্তর্গত ঢুলুঢুলু জাগরণে হাই তুলি, খাঁখা শূন্য বুকে
ভয় পেয়ে ফের ঘন ঘুমের নিভৃতে ঢুকি। চোখের সুমুখে
দেওয়ালে বন্ধ ঘর, বারান্দা কি রক নেই, শুধু ঘেরা ঘর
ঘরের বাহির নেই, চারিদিকে দেখি শুধু ঘরের ভিতর।
হামাগুড়ি দাও আর এপিঠ ওপিঠ করো, ইচ্ছে হলে চিৎ হয়ে থাকো।
দিন কাটে, দিন-চাপা চুল থেকে রঙ ঝরে : কিছুই তো করা হলো নাকো।

মাঠের রাক্ষুসে হাঁয়ে শাঁসজল নিঙড়ে দিয়ে ভাগচাষী ছিবড়ে হয়ে ফেরে,
শাঁসজল অন্যদের খাদ্যদ্রব্য হয়ে ফের পাড়ি দেয় অচেনা বন্দরে।
নিঙড়ানো ফাঁকা চাষা অবশিষ্ট হাড়গোড় দেশমাতৃকার পায়ে দেয় অর্ঘ্যবলি
তুমি ভেবে রাগ করো, ঘুরে দ্যাখো ক্রোধটারই এ-গলি ও-গলি,—
এইসব চাষাভুষো কোনোদিন ফেলবে না সশব্দ প্রবল থুথু? এইসব কালোকিষ্টি
মনুষ্যছায়ারা কবে শরীরপ্রাপ্ত হবে? পদাঘাত দেবে কবে? কবে দেবে অনাছিষ্টি?
ঘরে বসে ভেবে ভেবে প্রেশার বাড়িয়ে তোলো শুগারটা হাই করে রাখো।
ক্রোধ ক্রমে বিরক্তিতে খ্যাক করে, কিছুই তো করা হলো নাকো।

কঙ্কালের দেহতাপে কাঁচামাল পাকে, পাকা পণ্যে পুণ্যের শহর
টাল খায়। সব তাপ দিয়ে থুয়ে হিমদেহ কঙ্কালেরা শক্ত হিমতর
শয্যার জন্যে দিন গোনে। এইসব কঙ্কালের কাঠামোতে সেঁটে
দিতে হবে রক্তমাংস। আর কতকাল পায়ে চেটে
বেড়াবে সায়েবদের? ঝড় তুলে রেস্টুরেন্টে, পত্রিকায়, ব্যস্ত সেমিনারে
সায়েবদের কত ছদ্ম বকি? হঠাৎ কারেন্ট গেলে ইট-চাপা বছর আঁধারে

এসে ফিসফিস করে, সব বন্ধ। নারিন্দার ট্রাফিক জাম, নেই আর এতটুকু ফাঁকও।
বাখোয়াজি করে করে দিন গেলো, রাত কাটে, কিছুই তো করা হলো নাকো।

পদ্মানদীর মাঝি শ্রীচ্যুত কুবের এই জলের শ্যাওলা হয়ে ডাঙায় নেতিয়ে পড়ে রোজ
কোনো কোনো দিন খুব মাথা তুলি, একবার করে দেখি খোঁজ
তার জলেফাঁপা সব আঙুলের ফাঁক দিয়ে তারই ধরা শাদা ইলিশেরা
কী করে গলিয়ে পড়ে, কেন তার শূন্য দুই হাতে ঘরে ফেরা?
মাছ ধরা হয়ে গেলে মাছ আর তার মধ্যে কেন জোড়াহীন বিচ্ছিন্নতা?
এইসব ভেজা হাত অঙ্গুলিকে শক্ত করে দিতে চাই। অনন্তকালের সব প্রথা
ভেঙে ফেলি। উত্তরে অবসাদ। ধারালো কলমে জিভে যত হাঁকো ডাকো—
সংঘাত স্থগিত থাক। জীবন তো একবারই। কিছুই তো করা হলো নাকো।

গান

সবুজ পাতার শয্যা পেতে ঘুমিয়ে ছিলো একটি গোলাপ
তাকে আমি জাগিয়ে দিলাম, তাই কি আমার দুঃসহ পাপ?
খয়েরি কাঁটার সতর্কতা
দেখিনিতো। কে কার কথা
শোনে তখন? ব্যকুল হয়ে তুলে নিলাম রক্ত গোলাপ
তাকাইনি তো কারো দিকে, কে দিয়েছে কি অভিশাপ?
সবুজ পাতার শয্যা পেতে ঘুমিয়ে ছিলো একটি গোলাপ।
গোলাপ আমার করতলে
পাপড়িতে তার আলোক জ্বলে
সৌরভে তার প্রেম আকুতি, চুম্বনে দিই গরীব জবাব।
ঠোঁটে আমার হুল বেঁধালো গোলাপী কীট, আমার কি পাপ?
তাকে আমি জাগিয়ে দিলাম এই কি আমার দুঃসহ পাপ?
সবুজ পাতার শয্যা পেতে ঘুমিয়ে ছিলো একটি গোলাপ।
গোলাপ তোমার পাপড়ি যত
পড়ছে ঝরে অবিরত
তোমার বুকের গোপন কোণে পোকা ও কীট, বিষাক্ত সাপ
তাদের কাছে অপরাধী হয়ে গেলাম, হইনা, আমার নেই অনুতাপ।

ফাহিম

কুয়েত নামের মরুদ্যানেতে থাকেন ফাহিম বাবু
বিপদে আপদে ভয় সংকটে একটুও নন কাবু
গুণ্ডা আসুক, আসুক ডাকাত
এক কোপে তার হয় কুপোকাত
বাঘ ভাল্লুক ভর্তি বনেই ফেলবেন তিনি তাঁবু।

তাঁবু ফেলবেন কারণ সেখানে বাঘ সিংহের বাস
ভীষণ শব্দে কানে আসে শুধু অজগর নিশ্বাস
সব তাঁর কাছে মধুর বাজনা
তাঁকে ঘাবড়ানো কারো কাজ না
তাঁর মুষ্ঠিতে পাকড়ানো সাপ ব্যাঙ করে হাঁসফাঁস।

গণ্ডার দেখে তাঁর চোখদুটো জ্বলে ওঠে ধিকিধিকি
সেই আগুনের ছায়া পড়ে বনে আলো জ্বলে ঝিকিমিকি
যে নিয়মে পড়ে সূর্যের ফাঁদে
আলো জ্বলে ওঠে পৃথিবী ও চাঁদে
ঠিক সে নিয়মে তাঁর তেজে আলোকিত মরু মাঠ দিঘি।

তবে কিনা ধরো চোখে যদি পড়ে দু একটি ফোঁটা রক্ত
ফাহিম বাবুর পক্ষে তখন বুকে বল রাখা শক্ত।
রক্ত দেখলে শ্রীমান ফাহিম
কাঁপতে কাঁপতে একেবারে হিম
আছাড় পড়লে, হাঁটু ছড়ে গেলে কেঁদে নিজে হয় মত্ত।

তারপর ধরো ছুঁচো ও ইঁদুর, টিকটিকি আরশোলা
এসব দেখলে ফাহিমবাবুর বীরত্ব থাকে তোলা
ছাদের ওপরে। কারণ সেথায়
এইসব প্রাণী খুব কমই যায়
ছাদে বসে তিনি নিরাপদে খান বাদাম ভাজা ও ছোলা।

গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা বা হিম
সব ঋতুতেই শ্রীমান ফাহিম
সর্ব কর্মে সমভাবে উৎসাহী

খেতে ও পড়তে, উঠতে বসতে
লিখতে খেলতে, অঙ্ক কষতে
উৎসাহে তার বাপমার প্রাণ ত্রাহী।

বড়ো চাচা তার অকর্মণ্য
মানুষ হিসাবে অতি নগণ্য
কাজ তার শুধু ঘোরাঘুরি আর রাতভর আঁকি বুকি
জন্মদিনে ফাহিমকে সে
লেখা ছাড়া আর কিই বা দেবে
তাই এই খাতা ভরে দিলো, আশা : ফাহিমটা হবে সুখী।

টুম্পারানী

টুম্পারানীর একটুও নেই ভয়
একবার যা সত্য ভাবে তাইতে নিঃসংশয়।
টুম্পা যখন বড়ো হবে, রইবে না আর খুকী
নিজের সত্য অটল রাখতে নেবে অনেক ঝুঁকি।
সেনাপতির হাতে বাজুক অস্ত্রের ঝঙ্কার
টুম্পারানীর চোখে মুখে ছাপ নেই শঙ্কার।

রাজা রানী উজির নাজির দ্যাখাক প্রলোভন
টুম্পা নেবে মুখ ফিরিয়ে, টলবে না তার মন।
টুম্পা রইবে অটল নিজের শক্তি ও বিশ্বাসে
জনপ্রাণী থাকুক কিংবা নাইবা থাকুক পাশে।

ট্রয়ের রানী

পুনম হলো ঝাঁসির রানী, ট্রয়ের রানী রাতুল
ট্রয়ের সাথে বিবাদ করে করেছিলাম যা ভুল!
সবাই দেখি তারই বন্ধু, সবাই রাতুল-ভক্ত
বুড়ো, খোকা, চালাক, বোকা, নরম কিংবা শক্ত।
ফুলভরা গাছ, যমুনার মাছ, আম লিচু টকমিষ্টি
পাহাড় ঝর্না, পদ্মা মেঘনা, ঝড় মেঘ রোদ বৃষ্টি।
রাতুল সবার বন্ধু এবং সবাই ট্রয়ের পক্ষে
কারণটা এই : সবাই সমান রাতুল রানীর চক্ষে।

আমার রোগ

আমার এমন বিদঘুটে এক রোগ
সকাল বিকাল দেখতে আসে লোক,
হাতে পেঁপে কমলালেবু ডাব
চোখে তাদের দুঃখ দুঃখ ভাব।
রোগী দেখে সবাই অসন্তুষ্ট
দেখতে তো এ দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট;
জ্বরকাশি নেই, একটুও নেই ব্যথা
তবে কেন রটে রোগের কথা?
তা যাই বলো রোগটা মজার বটে,
এদিক ওদিক থেকে খাবার জোটে।
সকাল দুপুর বিকাল রাতে খাবার
যত পারো করে ফেলো সাবাড়।

শাস্তি একটি—শুয়ে থাকতে হবে,
কান দেবে না পথের কলরবে।
রোগীর গায়ে নেইকো নাকি বল
তাই তো নিষেধ বাইরে চলাচল।
সবাই বলে, 'কথা কওয়া মানা,
রাগ করবা না, জেদটাও করবা না।'
শুয়ে শুয়ে করি তো ফিসফিস,
এবার রোগের নাম বলি : জনডিস।

টুম্পারানীর জন্মদিনে

দেখতে দেখতে টুম্পারানীর বয়স হলো ছয়
টুম্পা কিন্তু এবারে আর ছোট্টো মেয়ে নয়।
দাদুমণি চার ছেলেকেই দিয়ে দিলেন তাকে
পাকা চুলের ছেলেরা সব তারই কোলে কাঁখে।
জন্মদিনে টুম্পারানী রানী হলো ট্রয়ের
এখন থেকে আমাদের আর নেইকো কিছু ভয়ের।
১৩ই মার্চে নাচছে ফাহিম, মিন্টু ও নাজনীন
স্বাস্থ্য সাহস নিয়ে টুম্পা বাঁচবে অনেক দিন।

সর্দার আর্জান ও বাঘের কবিতা

পার্কসার্কাসে যাদবপুরে
সকাল বিকাল রাতদুপুরে
হালুম হুলুম নানার সুরে
গায়ে ডোরাকাটা ব্যাঘ্ররা গর্জান।
এক গুলিতে সাত আটটা কাৎ
ধনুক পিছু এক কুপোকাৎ
বন্দুক ও তীর নিয়ে হঠাৎ
ঠিকঠাক করে হাজির হলেন সর্দার আর্জান॥
তাঁর হাত ধরে মিস্টার জেঠু
সাগরে হাঙর মারতেই পটু
খান দিনরাত টক ঝাল কটু
কিন্তু বাঘকে করেন তাক তো গুলি ও ধনুক
কম করে হলে দশ বারো হাত
গুলি ছুটে যায় এমনি তফাত
গুলিতে বাঘেতে এতই বিবাদ
বাঘের বদলে জখম হচ্ছে কাক বাঁদরের বুক।।
তাই 'আর্জান কই? কোথা আর্জান?'
ব্যাঘ্ররা শুধু তাঁকেই তো চান।
যাবে যদি যাক তাঁর হাতে জান
জেঠুর হাতের গোলমেলে তাক কারো পছন্দ নয়।
ব্যাঘ্রের দল করল হালুম
'শোনো হে মানুষ, করো হে মালুম'
সারা কলকাতা করে গুমগুম
'সর্দার হাতে যেন আমাদের শ্বাসটি বন্ধ হয়।'

অনূদিত রচনা

মূল : ডিলান টমাস

আলো ভেঙে ভেঙে পড়ে যেখানে কোনো সূর্যই প্রজ্বলিত নয়

আলো ভেঙে ভেঙে পড়ে যেখানে কোনো সূর্যই প্রজ্বলিত নয়;
যেখানে সমুদ্র অপ্রবাহিত, হৃদয়ের জল
জোয়ারে এগোয়;
এবং জোনাকি মাথায় কোরে অসম্পূর্ণ অশরীরিগণ,
আলোকের উপাদান
মাংসে সজ্জিত করে যেখানে কোনোই মাংস সাজায় না হাড়।

মোমবাতি উরুদের মাঝে
যৌবন এবং বীজ উত্তপ্ত করে আর দগ্ধ করে বয়েসের বীজ;
যেখানে কোনো বীজই আলোড়িত নয়,
মানুষের ফল হলো নিরুদ্বিগ্ন-সমতল তারায় তারায়,
চকচকে, ডুমুরের মতো;
যেখানে কোনো মোমই নেই, মোমবাতি আপনার লোমকে দেখায়।

প্রত্যুষ ভেঙে পড়ে চোখের পেছনে;
করোটির মেরু আর পায়ের আঙুল থেকে বাতাসিত রক্ত সমুদ্রের নিঃশব্দে চলে;
অনাবৃত, রক্ষিত নয়, আকাশের আকস্মিক প্রবাহের সব নলে বহির্গত
একটি হাসির মধ্যে কান্নার তৈলাক্তকে ঈশ্বরিত কোরে।
খাপে খাপে রাত্রি আবর্তিত,
কতিপয় অন্ধকার চাঁদের মতো, পৃথিবীর সীমা,
দিবস আলোক করে হাড়,

যেখানে কোনোই শীত নেই, চামড়া ছাড়ানো সব ঝড় খোলে
শীতের গ্রন্থন;
চোখের পাতা থেকে দোলে বসন্তের ছবি।

আলো ভেঙে ভেঙে পড়ে গোপন বিস্তারে,
ভাবনার শীর্ষে শীর্ষে যেখানে ভাবনারা বৃষ্টিতে শোঁকে;
যুক্তিরা যখন গতায়ু,
চোখে হয় পৃথিবীও মাটির গোপন,
সূর্যে রক্ত লাফ দিয়ে ওঠে,
ভোর অবরুদ্ধ হয় নির্ধারিত নষ্ট সব প্রান্তরের 'পরে।

হিপোক্রেটিসের শপথ

রোগ নিরাময়কারী অ্যাপলোর নামে, এসকুলাপিয়াস, হাইজিয়া ও প্যানাশিয়া এবং সকল দেবদেবীর নামে হলফ করে আমার সমস্ত সাধ্য ও বিবেচনা দিয়ে পালন করার জন্য আমি নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করি :

চিকিৎসাশাস্ত্রে আমার শিক্ষাগুরুকে আমি নিজের পিতৃতুল্য জ্ঞান করবো; আমার সম্পদ তাঁর সঙ্গে ভোগ করবো; তাঁর সন্তানদের বিবেচনা করবো নিজের ভাই বলে; তারা আগ্রহ দেখালে পারিশ্রমিক বা লিখিত মুচলেকা ছাড়াই তাদের এই শাস্ত্রে শিক্ষাদান করবো; আমার পুত্রদের, আমার শিক্ষাগুরুর পুত্রদের এবং এই পেশার বিধিপালনে সংকল্পবদ্ধ শিষ্যদের আমি এই শাস্ত্রে বিদ্যা অর্পণ করবো—কিন্তু আর কাউকে নয়। আমার রোগীদের কল্যাণের জন্য আমার সমস্ত সাধ্য ও বিবেচনা অনুসারে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দেবো এবং কারো কোনো অনিষ্ট করবো না। আমি কখনোই কাউকে কোনো মারণৌষধ প্রয়োগ করবো না, এমন কি অনুরুদ্ধ হলেও নয়। কিংবা আমি কাউকে এমন পরামর্শ দেবো না যার পরিণতিতে কেউ মৃত্যুবরণ করে। কোনো মহিলার ওপর এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবো না যাতে তার গর্ভপাত ঘটতে পারে।

শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে আমি আমার শাস্ত্র চর্চা করবো। কিডনির পাথরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর আমি অস্ত্রোপচার করবো না, বরং এই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের হাতে দায়িত্বটি ছেড়ে দেবো। যে গৃহেই যাই, কেবল রোগীর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রবেশ করবো, সেখানে ইচ্ছাকৃত কোনো অনিষ্ট সাধন বা দুর্নীতি, বিশেষ করে মুক্তমানুষ বা দাস নির্বিশেষে নারী বা পুরুষ কাউকে ভ্রষ্ট করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবো। পেশাগত দায়িত্ব পালন করাকালে বা দৈনন্দিন আদানপ্রদানে আমি যাই জানতে পাই, তার অপ্রকাশ্য বিষয় আমি গোপন রাখবো এবং কখনোই প্রচার করবো না।

বিশ্বাসের সঙ্গে এই শপথ পালন করলে দীর্ঘকাল আয়ু এবং আমার শাস্ত্রচর্চা [র ফল] ভোগ করার সুযোগ যেন পাই, তাহলে সকল মানুষ সর্বকালে আমাকে সম্মান করবে। কিন্তু এই শপথ থেকে বিচ্যুত হলে বা এই শপথ লঙ্ঘন করলে আমার ভাগ্যে যেন বিপর্যয় নেমে আসে।

অসমাপ্ত উপন্যাস

বেহেশতের কুঞ্জি-এর খসড়া

১৯২১ সাল মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের জীবনে ৩-টে কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো : ১. গান্ধিজীর অসহযোগের হুজুগে ভাঙামোড়ের প্রফুল্ল বাগচি ও বাঁশদহের অমূল্য সাহার পাল্লায় পড়ে বাঁশদহ বীরেন্দ্রনারায়ণ হাই ইংলিশ স্কুলের দশ আনা ছেলের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' করতে করতে স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক-চান্সে ম্যাট্রিক পাস করার আবাল্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার বিপজ্জনক ঝুঁকি থেকে সে রেহাই পায়। ২. ঐ বছর বাঁশদহ উত্তরপাড়ার অধিবাসী, তখন সেরপুরের পোস্ট-মাস্টার মোহাম্মদ শামসুল হক সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ জেবুন্নেসা খাতুনের সঙ্গে সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এবং ৩. শাদীর মজলিসে হ্যাজাকের শাদা আলোয় শামসুল হক কালো কালির দোয়াতে কলম দুবার ডুবিয়ে ও তিনবার ঝেড়ে নিকাহ্‌নামার বিবর্ণ হলুদ কাগজে তার ২৫ বছর পর্যন্ত প্রচলিত নাম মুংলু পরামাণিক কেটে নতুন নামকরণ করেন মোহাম্মদ গোলাম হোসেন।

৩ নম্বর ব্যাপারটিতে অমূল্য সাহার সায় ছিলো না। তার খাতকদের নাম ও নামের পাশে তাদের দেওয়া ঋণের চক্রবৃদ্ধিহারে স্ফীতকায় অর্থের ঊর্ধ্বগতির বেগ সযত্নে অনুসরণ করার সঙ্গে মানুষের জন্মবারের গুরুত্ব ও জন্মসূত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তার নিষ্ঠা সব সময়েই নিরঙ্কুশ। এটি হল তার বিশ্বাসের অংশ, এখানে কে খাতক আর কে খাতক নয় তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু শামসুল হক সরকারি মানুষ, তাকে না ঘাঁটানোই ভালো। অমূল্য সাহার নেতা প্রফুল্ল বাগচিও আবার মুসলমানের ঘরের ব্যাপারে মাথা ঘামানো পছন্দ করেন না। ভাঙামোড়ের প্রফুল্ল বাগচি হাজার হলেও মহকুমা পর্যায়ে কংগ্রেসের নিম-নেতা এবং থানায় ১ নম্বর লোক। মহকুমা শহরে দেশবন্ধুর সভায় মঞ্চে ওঠার সুযোগ এই ২/৩টি থানার মধ্যে পেয়েছিলেন কেবল তিনিই। এর আগে আগে তিনি খদ্দর ধরেন; মক্কেলদের বসার ঘরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছবি টাঙিয়েছিলেন আরো কয়েক বছর আগে। তাঁর ব্যক্তিত্বে অমূল্য সাহা অভিভূত এবং প্রফুল্ল বাগচির গৌরব প্রচারে তাঁর উদ্যম নিজের

খাতকদের নামে ঋণের হার বৃদ্ধি করার তৎপরতার তুলনায় কম নয়। প্রফুল্ল বাগচির অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মুগ্ধ দেশবন্ধু মঞ্চের ওপরেই প্রফুল্লের কানের কাছে গোলগাল মুখ নিয়ে ফিসফিস করে 'তুমি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে চলে এসো, আমাদের সলিড লোক দরকার' বলেছিলেন, এই কথাটি মঞ্চে না বসেও শুনে ফেলে কেবল অমূল্য সাহা। তা অমূল্য সাহার এই প্রচারে প্রফুল্ল বাগচি বাধা দেননি। স্বল্পবাক পুরুষ, নিজের সম্বন্ধে প্রচারেও কারো ওপর হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে তিনি বরাবরই সংযমী। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া কথা বলা তাঁর প্রায় হয়েই ওঠে না। তাঁর তৎসম শব্দসমৃদ্ধ বাক্যগুলিতে কথার চেয়ে ধ্বনির ব্যঞ্জনা বেশি বলে মানে না বুঝলেও শ্রোতারা নড়েচড়ে বসে, এই নড়াচড়া কখনো কখনো ঠেকে অস্পষ্ট উত্তেজনা। এ সত্ত্বেও এলাকার মুসলমান ছেলেরা দোনোমোনো করছিলো, এইসব উত্তেজনা কিংবা আবেগ কিংবা উস্কানি থেকে তারা একটু তফাতেই ছিলো। এদের নিয়ে প্রফুল্ল বাগচির মাথাব্যথাও এমন কিছু ছিলো না, তাঁর মুসলমান মক্কেলও একরকম নাই বললেই চলে, নিজেদের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি করে তারা সব লাইন লাগায় অক্ষয় সেনের চেম্বারে। কিন্তু দেশবন্ধু ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মিটিঙে বারবার এদের কথা বলছিলেন, এমন কি কমিটিতে সোবহান মুক্তারকে সামনে নিয়ে আসার আভাসও দিয়েছিলেন। লেখাপড়া কম জানলে কি হবে, দেশবন্ধুর মনোভাবে সাড়া দিতে অমূল্য সাহার দেরি হয়নি। প্রফুল্ল বাগচির মতো সে তো আর টাউনে থাকে না, গেরস্থ মুসলমানদের সে ভালোই চেনে। তার খাতকদের মধ্যেও মুসলমানই বেশি। ওদিকে মোকামতলার এরফান হাজির ছোটোভাই এবাদ আকন্দ বছর দুয়েক হলো লগ্নী খাটাতে শুরু করেছে, হাজি বলে এরফান আকন্দ কারবারের মধ্যে সরাসরি না থাকলেও এতে যে তার টাকাও খাটছে এ কথা অমূল্য ভালো করেই জানে। তারপর, এদের কোনো কোনো ঘরের ছেলেরা আজকাল স্কুলে, এমন কি কেউ কেউ কলেজে পর্যন্ত যাওয়া আসা শুরু করেছে; ঐ ছোঁড়ারা ওদের ঘরে এককেটি বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ। এরা যা বলে ওদের চাষা বাবাচাচার কাছে তাই বেদবাক্য। এদের সঙ্গে না নিলে চলবে?

ঝামেলা বাধালো সরকারবাড়ি। সেরপুর থেকে পোস্ট মাস্টার শামসুল হক সরকার বড়ো ভাইকে নাকি চিঠি লিখেছে, ওসব হুজুগে মুসলমানদের [সঙ্গে] ঘেঁষা ঠিক হবে না বড়োভাই মানে খাদেম মৌলবি গাঁয়ের মুরুব্বি মানুষ, উত্তরপাড়ার বিচারে সালিশে তাঁর কথার দাম আছে। ভাইদের সম্পত্তি এখন পর্যন্ত একত্তর আছে তাঁরই দাপটে, সমস্ত সম্পতি দ্যাখাশোনা করেন তিনিই। আবার বাড়ির মস্ত খানকা আর মক্তব চালান, নোয়াখালীর ২ জন মৌলবি বাড়িতে জায়গীর থেকে মক্তবে পড়ায়, এদের ১ জন নাকি দেওবন্দ ফেরৎ। খাদেম মৌলবি এমনিতে মিশুক মানুষ, অমূল্য সাহার সঙ্গে তার খাতির বেশ ভালোই। কিন্তু দেশবন্ধুর মিটিঙে নিজে গেলেও মক্তবের ছেলেদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে অমূল্য সাহার অনুরোধে সাড়া দেয়নি। ঐসব ছেলের বাপচাচারা অনেকেই গিয়েছিলো ; অমূল্য সাহার কাছ থেকে

তারা ধান নিয়েছে, থালাবাসন বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছে, তার সুদের ধাক্কাই সেদিন টাউনের দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছিলো।

দেশবন্ধুর সঙ্গে এসেছিলেন মওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিয়াজী। মওলানার সুললিত কণ্ঠে কোরানের আয়াত আর রসুলুল্লাহ্‌র নসিহতসমৃদ্ধ ভাষণে শ্রোতাদের বাজা-পায়ের ঘা কিংবা কোমরের দাদের চুলকানি শ্রোতাদের মাথায় উঠলো, মাথার ভেতর ঝিমুনি ভাঙা রিমঝিম স্পন্দন বোধ করলো।

খাদেম মৌলবির মক্তবের দেওবন্দি মওলানা পর্যন্ত সিরাজী সাহেবের 'নারায়ে তকবির' হুঙ্কারের জবাবে 'আল্লাহু আকবর' সাড়া তুলছিলো গতর কাঁপিয়ে। মিটিং টিটিং শেষ করে ৩ ক্রোশ পথ ধরে বাড়ি ফেরার সময় খাদেম মৌলবি খুব গম্ভীর হয়ে যায়। এই গাম্ভীর্যের কারণ দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধতা, না কি সিরাজীর হুঙ্কার, না কি গোটা ব্যাপারটাকে আদিখ্যেতা বলে গণ্য করা—সে সম্বন্ধে দেওবন্দি মওলানা নিশ্চিত হতে না পারায় রুজির নিরাপত্তার ভাবনায় সেও চুপচাপ হাঁটে।

সেদিন যতোই চুপচাপ থাকুক, খাদেম মৌলবিকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হুজুগের মধ্যে যেতেই হল। নিজের মক্তবটিকে মাদ্রাসা করার জন্যে খাদেম মৌলবি তদবির করছিলো বছরখানেক ধরে। এ জন্যে মাসে ছমাসে তাকে টাউনে যেতেই হয়। দেশবন্ধু ফিরে যাবার সপ্তাহ দুয়েক পর টাউনে গিয়ে 'বাণীকুঞ্জে' গেলে মওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাকে একরকম ধমক দিলেন, 'নাসারারা আমাদের খেলাফত পর্যন্ত কেড়ে নিলো, এখনো আপনাদের হুঁস হয় না?' নগদ চার আনায় তাঁর 'অনল প্রবাহ' বইয়ের মলিন একটি কপি কিনে তাঁরই দেওয়া চাঁদ তারা মার্কা টুপি নিয়ে গ্রামে ফিরে খাদেম মৌলবি অন্য মানুষ। কোথায় সেই চিরকালের তিলে-ধরা কিস্তি টুপি আর কোথায় লাল তুর্কি টুপির জেল্লাঈ। এর রোশনিতে তার কালোসাদা দাড়িতে ফুটে উঠলো মেহেদির আভা। তারপর তার কেরাত-করা গলায় নারায়ে তকবিরে সাড়া দিয়ে 'আল্লাহ আকবর' বলতে বলতে নাসারার বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে রাস্তায় নামা ছাড়া মুসলমান ছেলেদের আর পথ রইলো না।

রাস্তায়-নামা ছেলেপিলের মধ্যে বয়সে ও দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়ো হরিয়ালমারা চরের মুংলু পরামাণিক। খাদেম মৌলবির ভায়রা এরফান হাজির বাড়িতে জায়গির থেকে বাঁশদহ বীরেন্দ্রনারায়ণ ইংলিশ হাই স্কুলে সে পড়াশোনা করছে আজ ৭/৮ বছর। স্কুল থেকে তার বেরিয়ে যাবার কথা আজ থেকে কয়েক বছর আগে। কিন্তু এক-চান্সে ম্যাট্রিক পাস করার ধ্রুব লক্ষ্যে স্থির থাকতে গিয়ে ক্লাসের এ্যানুয়াল পরীক্ষাগুলোতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ক্লাস টেনে উঠতে উঠতে বয়স ও দৈর্ঘ্যে সমস্ত সহপাঠীদের সে ছাড়িয়ে যায়। নদীর একেবারে ভেতরের দিকের চরের মানুষ বলে যমুনার সাত স্রোতের টান ও ঊনপঞ্চাশ ঢেউয়ের ধাক্কায় তার গলার স্বর এমনিতেই ভারী, জায়গির বাড়িতে ভোরবেলা ঘণ্টা তিনেক এবং বিকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি পর্যন্ত পাঠ্যবইগুলো পালাক্রমে জোরে জোরে পড়ায় এবং উপরন্ত প্রায়ই দুই বছর ধরে এক প্রস্থ বইই বারবার পড়ায় তার কণ্ঠ ক্রমেই

গমগমে হয়ে উঠছিলো। খাদেম মৌলবির নারায়ে তকবিরের জবাবে অনেকগুলো কচিকণ্ঠের ওপরে তার 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ গ্রামের রাস্তা, মাঠ, চাষের জমি, ঝোপঝাড় ও খাল পেরিয়ে খোড়ো ঘরগুলোর চালে ধাক্কা খেয়ে বাড়ি মারতো বৌ-ঝিদের শাড়ি-ঢাকা বুকে; সেখানে তা কোনো কোলাহল তুলেছে কি-না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও তাদের কালো কিষ্টি খড়ি-ওঠা গতর যে শিরশির করে উঠতো তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই আওয়াজ তাদের ধন্দে ফেলতে পারতো, কিন্তু মুংলুর দীর্ঘ দেহ রহস্য থেকে তাদের বঞ্চনার কারণ। তাকে স্পষ্ট দেখতে পারতো সবাই। মুংলুকে দেখতে হলে তাদের হাজা-পড়া পায়ের আঙুলে একটু উঁচু হওয়ার দরকার নাই, ঢ্যাঙা গতরের ওপর তার ছোটো মাথাটা চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। মুংলুকে এমনিতে সবাই চেনে, এই গ্রামে সে পড়াশোনা করছে ৮/১০ বছর। চরের মানুষ, এইসব বির এলাকার মানুষের কাছে তাদের হাঁটাচলায় ধাপধুপটা একটু বেশিই ঠেকে। কিন্তু চ্যাংড়াটা এমনিতে সিধা, বাপচাচাদাদাপরদাদারা সব লাঠিবর্শা দিয়ে একেকটা চর দখল করে বেড়ায়, জিভের ছোবলে যমুনা গ্রামকে গ্রাম চেটে নিলে তারা হামলা করে নতুন চরে। কিন্তু হলে কি হবে, মুংলুর মতো নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ এদিকে একটাও নাই। গ্রামের বৌঝিদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না, নামাজ পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত, রোজার সময় একটা রোজা নষ্ট করে না ; জায়গির বাড়ি আর স্কুল ছাড়া তাকে কোথাও দ্যাখা যায় না বললেই চলে। বাঁশদহ বাজার কি ভাঙামোড় হাটে মিষ্টির দোকানে বসা কিংবা বড়ো রাস্তার মোড়ে বাঁশের মাচায় পা ঝুলিয়ে গল্পগুজব করা, কি জমির ধারে চাষীদের হাত থেকে হুঁকা নিয়ে দুটো টান দেওয়া—না, এসব খাসলত তার একেবারেই নাই। বিকালে বহুবার পড়া বইয়ের ভুলে যাওয়া পাঠ ফের মুখস্থ করতে করতে কখনো কখনো সে যায় স্কুলের ফিল্ডের দিকে; তখন কোনো কোনো দিন ছেলেরা তাকে ফুটবল খেলায় ডেকে নিয়েছে। কালো ও চৌকোনা মুখের পুরু ঠোঁটে একটু লাজুক হেসে সে মাঠে নামে এবং পায়ের কাছে বল এলেই খুব জোরে কিক মারে। বল পায়ে কেরি করার প্রবণতা তার নাই, এই খেলায় তার প্রধান কৃতিত্ব সজোরে বল ছুঁড়ে মারার কাজে। আর একবার বল পেলে একো শটে তাকে পার করে দিতো মাঠ পেরিয়ে ধানখেতের দিকে, কিংবা স্কুল দালানের বারান্দা পেরিয়ে দরজার শালকাঠে, দক্ষিণে ছুঁড়লে মুহূর্তের মধ্যে বল ভাসতে থাকতো পানধোয়া বিলের ঠিক মাঝখানে। এইসব কিকের অতি সামান্য কয়েকটি গোলপোস্টের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে, কিন্তু গোলপোস্টটি কোন টিমের সেদিকে মুংলুর কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। এরকম নিরপেক্ষ হওয়ার মতো উদারতা ঐ এলাকার খেলোয়াড়দের না থাকায় সে এক পক্ষের কৌতুক ও অন্য পক্ষের ক্রোধের লক্ষ্য হলে মাঠের বাইরে এসে মাগরেবের আজান না পড়া পর্যন্ত সে ফের পাঠ মুখস্থ করার কাজে মনোনিবেশ করতো। সুতরাং পাঠচর্চায় তার বিঘ্ন কমই ঘটেছে।

যমুনার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়-গঠিত তার কণ্ঠস্বর গুণগুণ করে পাঠ্যবই পড়া ও নামাজে সুরা বিড়বিড় করার সীমা ছাড়িয়ে মিছিলে ও সভায় ঘন ঘন আল্লাহু আকবর ও বন্দেমাতরম ধ্বনিতে গমগম করে উঠলো। হিন্দুস্থান থেকে নাসারা খেদিয়ে মুসলিম জাহানে খেলাফত কায়েম করার জন্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী ও মওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর খোয়াবে খাদেম মৌলবির ঢুলুঢুলু চোখে সেঁটে গেলো মুংলু পরামাণিকের কালো ও ঢ্যাঙা গতর। এরকম তেজি ও বুলন্দ আওয়াজ, কোরান-কেরাত-না-করেও এরকম গমগম স্বরে গদগদ হয়ে খাদেম মৌলবি তাকে বলতে লাগলো, 'বাবাজী, তুমি সামনে থাকো গো, সামনের দিকে থাকো।' কিন্তু মিছিলের প্রায় সবাই বির এলাকার মানুষ, তাদের কাছে পাত্তা না মেলায় চরুয়া যুবকটির পক্ষে ঐ হুকুম তামিল করা বেশ কঠিন। তাতে কিছু এসে যায় না; মিছিলে সভায় যেখানে থাকুক, কংগ্রেস ও খেলাফতের নিশান ছাড়া আর কিছুই ছিলো না যা কি-না তার ঢ্যাঙা শরীরটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

এক-চান্সে ম্যাট্রিক পাস করার আকাঙ্ক্ষা থেকে রেহাই পেয়ে সকালে তিন ঘন্টা এবং বিকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি পর্যন্ত সরবে পাঠ্যবই পড়ার শক্তির সবটাই নাসারাদের সঙ্গে অসহযোগিতা ও খিলাফত কায়েমের উদ্যমে নিয়োজিত হলে মুংলুর দিন ও রাত্রি সম্মুখযাত্রানিরপেক্ষ গতি অর্জন করে। গতি তীব্রতা পায় প্রফুল্ল বাগচির বক্তৃতায়, ভাঙামোড়েরই বীরেন মাস্টারের কলেজে-পড়া ছেলে অজিত দত্তের আলোচনায় এবং তা তুঙ্গে উঠলো একদিন বাঁশদহ বীরেন্দ্রনারায়ণ হাই ইংলিশ স্কুলের মাঠে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাষণ শুনে।

সেদিন সকাল থেকেই মেঘলা, দুপুরবেলার আগে আগে বৃষ্টি হল, পরে বর্ষণ না করলেও বুক ভরা পানি নিয়ে আকাশ নেমে এসেছিলো অনেক নিচে। স্কুলের বারান্দার নিচে তক্তপোষের ওপর মঞ্চে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসেছিলেন মওলানা সিরাজী। তিনি দাঁড়াবার আগেই খাদেম মৌলবি মঞ্চে উঠিয়ে নিলো ধুতি ও টুপি পরা একটি ছেলেকে। বালক এই এলাকায় নতুন, তার ফর্সা মুখে টিকলো নাকের নিচে গোঁফের পূর্বাভাস। পাতলা ঠোঁটজোড়া প্রথমে একটু কাঁপলো, তারপর মুখস্থ বলতে শুরু করলো একটি কবিতা। কবিতার কয়েকটি পঙক্তি বলার পর একটু থেমে জিভে কামড় দিয়ে কবির নাম বললো, 'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী'। নাম শুনে শ্রোতারা একটু নড়েচড়ে বসলো; এমন কি আজকের প্রধান বক্তা এবং এই কবিতার রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি কি-না তা ঠাহর করতে পারলো না যারা, তারাও চোখ কুঁচকে বিশেষ মনোযোগ দিলো ছেলেটির দিকে। আবৃত্তিকারী কিন্তু কবিতাটি ফের প্রথম থেকে পড়লো না, কবির নাম বলে সে কবিতার বাকি অংশ ঝাড়া মুখস্থ বলে যায়।

আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগৎ বক্ষে

নবজীবনের খর প্রবাহ প্লাবন
আবার জাতীয় সেতু
উড়াও মুক্তির হেতু
উঠুক গগনে পুনঃ. বঙ্কিম তপন!

এর মানে স্পষ্ট না হলেও এবং বন্দেমাতরম বা আল্লাহু আকবরের তুলনায় পানসে হলেও এর ঝাঁজে মুংলুর বুকে চিনচিন করে ওঠে। বুকের এই হাল্কা বেদনার মানেও তার অজানা। মঞ্চের এই ফর্সা বালকের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সে উসখুস করে এবং তার স্পষ্ট আবৃত্তি সত্ত্বেও মুংলুর কাছে কবিতাটির ধ্বনি কোনো শব্দের আকার পায় না। আবৃত্তি শেষ হলে ইসমাইল হোসেন সিরাজী বসে বসেই ফর্সা বালকের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ করেন এবং দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন, 'হাজেরানে মজলিস, পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমার দু চোখের দুই মণি হিন্দু মুসলমান ভাইয়েরা।' তাঁর গম্ভীর ও উচ্চকণ্ঠের এই শব্দমালার প্রবল ধাক্কায় কিংবা বাঙলার ঋতুর স্বভাব অনুসারে হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। ফর্সা ও টিকলো নাকের বালকের আবৃত্তির শহুরে ও অতিশুদ্ধ উচ্চারণে মঞ্চের সঙ্গে শ্রোতাদের বেশ দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিলো বলে কিংবা স্বরাজ বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে বৃষ্টিতে ভেজা যথাযথ পদ্ধতি নয়—এই ধারণা থেকে শ্রোতারা সব উঠে দৌড়ুতে শুরু করে। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করা নিরর্থক, কারণ স্কুলের দালানের বারান্দায় সাজানো রয়েছে চেয়ার ও বেঞ্চের সারি, সেগুলো অতিথি, নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের জন্যে নির্ধারিত। সেখানে যাবার জন্যে মানুষের বুকে বল সঞ্চয় করতে সময় তো একটু নেবেই। কিন্তু এর মধ্যেই খালি গলায়, মাইকের চল হতে তখনো দুই দশক বাকি, মওলানা সিরাজী বৃষ্টির আওয়াজকে দাবিয়ে হাঁক দিলেন, 'ভাইসব, যাবেন না। স্থানত্যাগ করবেন না। আল্লা চাহে এই বৃষ্টি এক্ষুনি থেমে যাবে।' শ্রোতাদের সাহসী অংশটি বারান্দায় ওঠবার আগেই তিনি হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে আরবিতে কি যেন বললেন এবং তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন, 'উঠুক গগনে পুনঃ বঙ্কিম তপন!' তাঁর আরবি কথাগুলো কোনো সুরা কি-না এবং শেষ বাক্যটি তারই অনুবাদ কি-না, এমন কি দেওবন্দি মওলানা পর্যন্ত সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার আগেই, বলতে গেলে শেষ বাক্যের ঐ ইচ্ছা ঘোষণা সম্পূর্ণ হতে না হতে বৃষ্টি থামলো। মেঘ পালিয়ে গেলো না, কিন্তু হঠাৎ-ধমক-খাওয়া বালিকার অশ্রুর মতো তা ঝুলে রইলো আকাশের গায়ে। বিহ্বল ও অভিভূত শ্রোতাদের দিকে প্রধান বক্তা তাঁর দুই হাতে বার তিনেক ঢেউ তুললে যে যেখানে আছে ধপাস করে বসে পড়ে ভিজে ঘাসের ওপর।

মওলানা সিরাজী কিন্তু তাঁর কেরামতি নিয়ে ১টি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। অভিমানী ও নাচার মেঘের দিকে হাত তুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার কাছে শুকরিয়া আদায় করে তিনি শুরু করলেন তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা। তাঁর ১টি শব্দ মানে ১০০ গর্জন, এই গর্জনের ধাক্কায় ধাক্কায় মেঘ আরেকটু ওপরে উঠে গেলো।

বক্তৃতায় কঠিন কঠিন শব্দ থাকা সত্ত্বেও তাঁর আঞ্চলিক টান এবং মাঝে মাঝে স্থানীয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার, কণ্ঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চধ্বনি প্রয়োগ এবং সর্বোপরি মাথার ওপরে শূন্যতার ক্রমপ্রসারমানতার ফলে সভায় অপ্রতিহত নীরবতা। মাঝে মাঝে তাঁরই ইশারায় খদ্দরওয়ালা স্বেচ্ছাসেবকদের 'বন্দেমাতরম', 'নারায়ে তকবির', 'গান্ধিজী কি', 'মওলানা মোহাম্মদ আলী কি' প্রভৃতির জবাবে যথাক্রমে 'বন্দেমাতরম', 'আল্লাহু আকবর', 'জয়', 'জয়' আওয়াজে আওয়াজে সভায় নিরঙ্কুশ নীরবতা নিশ্চিত হচ্ছিলো।

কয়েক মাস আগের সার্ভেস চুক্তিতে তুরস্কের সুলতান তথা মুসলিম জাহানের খলীফার অপমান হলো গোটা মুসলমান উম্মার নাজুক সিনায় জুতা মারার সামিল। মুসলমান ভাইরা নিজেদের বুকের ভেতর তাকালে সেই বুটের চিহ্ন দেখতে পাবেন। আফসোস, মুসলমান চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলে আজ অন্ধ। এক বছর আগে পাঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগে ইবলিসের গোলাম, নাসারা ডায়ারের হুকুমে প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী। সেই গুলিতে জখম আজ শৃঙ্খলিত ভারতমাতার নয়নের পুত্তলি তিরিশ কোটি সন্তান। জালিনওয়ালাবাগের দেওয়াল ভেদ করে মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদ কি তোমাদের কানে পৌঁছয় না? তোমরা কি কালা না বধির? তোমরা কি অন্ধ না বোবা? তোমাদের হাত পা কি পঙ্গু?

সিরাজীর ভাষণ শুনতে শুনতে ভিজে মাঠের বর্ণধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রোতাদের অভিযুক্ত-অন্ধ চোখ কখনো ভাপে কখনো তাপে সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে আসে। নিজ নিজ পাছার নিচে ভিজে মাঠের স্যাঁতসেঁতে স্পর্শের অস্বস্তি সত্ত্বেও তারা শরীরের সংশ্লিষ্ট অঙ্গে চুলকানো স্থগিত রেখে কাঁদতে কাঁদতে ও রাগতে রাগতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাষণ শোনে।

এরপর সভার সভাপতি কংগ্রেসের থানা প্রধান প্রফুল্লচন্দ্র বাগচির বক্তৃতার তৎসম শব্দগুলো দেশী কথার শক্তিও পায় না, ভিজে মাঠে সেগুলো গড়িয়ে পড়তে শুরু করলে তিনি বিবেচনা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মুলতবি-মেঘের তলপেট খুলে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল অঝোর ধারায়। প্রবল বর্ষণের ঝাপটায় বারান্দায় সাজানো চেয়ার বেঞ্চ ভিজে যায়, হ্যাজাকের কাঁচে ভাপ জমে এবং সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয় একটি ক্লাসরুমে। সেখানে অতিথিদের বিশ্রাম ও ভুরিভোজনের আয়োজন। এদিকে চেয়ার বেঞ্চ সরিয়ে নেওয়ার ফলে বারান্দাটি কৌলীন্যমুক্ত হয়েছে, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে সুতরাং সেখানে ভিড় করতে এখন আর কারো তেমন বাধা নাই।

প্রফুল্ল বাগচি, খাদেম মৌলবি, অমূল্য সাহা প্রমুখের সশ্রদ্ধ পরিচালনায় প্রধান অতিথি ঐ ক্লাসরুমে ঢুকলেন ; মঞ্চে পদ্য-বলা ফর্সা ছেলেটিও তাদের অনুসরণ করলো, কিংবা বলা যায় খাদেম মৌলবিই তাকে ভেতরে ঢোকার জন্যে ইশারা দিয়েছিলো। অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে ঐ ঘরে ঢুকতে গিয়েও মুংলু দাঁড়িয়ে রইলো

বারান্দায়। অতিথিদের খাবার পরিবেশন করতে স্বেচ্ছাসেবকরা বারবার ভেতরে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্কুলের পেছনের দিকে প্রাইমারি স্কুলের টিনের ছাপরার নিচে গিয়ে মুংলু ব্যস্ত হয়ে পড়লো হাঁড়ি থেকে পোলাও কোর্মা গামলায় তোলার কাজে। স্বেচ্ছাসেবকদের খবরদারি করছিলো অজিত দত্ত। বীরেন পণ্ডিতের ছেলে অজিত দত্ত পাবনা কলেজে পড়ে, মুংলুকে সে কয়েকবার ঘরের ভেতর যেতে বললেও সে ঐ টিনের চালাতেই কাজকম্ম করতে লাগলো। অমূল্য সাহা অতিথিদের ঘরে ঢুকিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অজিত দত্তকে বলল, 'তুমিও খাবা নাকি?' না, স্বেচ্ছাসেবকদের খাবার জন্যে যথেষ্ট রান্না করা হয়নি। অমূল্য সাহা স্বস্তি পেয়ে বলে, 'খেয়ো না বাবা। দরকার কি?'

পুরু খড়ের ওপর তোশক ও চাদর বিছানো গোরুর গাড়িতে প্রধান অতিথি ও প্রফুল্ল বাগচিকে উঠিয়ে বিদায় দেওয়ার সময়ও মুংলু একটু তফাতেই রইলো।

স্কুলের মাঠ থেকে যখন তারা ফিরছে তখনো টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছেই। খাদেম মৌলবির ছাতার নিচে তার গা ঘেঁষে চলেছে ঐ পদ্য-বলা ফর্সা ছেলেটি। এদের পেছনে মুংলু, খাদেম মৌলবির বাড়ির কয়েকজন কাজের লোক এবং তাদের আত্মীয়স্বজন। বৃষ্টিতে সরু রাস্তার দুই পাশে গাছপালা আরো চেপে এসেছে, হাশেম মাস্টারের পুকুরে রুই মাছ হঠাৎ করে ঘাই দিয়ে নেমে যায় পানির অনেক ভেতরে। খাদেম মৌলবি পেছনে তাকিয়ে ডাকে, 'মুংলু, ছাতির নিচে আসো বাবা। পা চালাও! রাত হলো।' পায়ে গতি একটুখানি বাড়ালেও খাদেম মৌলবির ছাতার নিচে পর্যন্ত মুংলু পৌঁছুলো না। ২ পাশে ২ জনকে নিলে ২ জনের গায়েই বৃষ্টির ঝাপটা লাগবে। শহুরে ছেলেটিকে খাদেম মৌলবি কি ভিজতে দেবে?

'বাবা হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, না? গাঁয়ের পথঘাট তো! এর ওপর আবার বৃষ্টি হলো!' খাদেম মৌলবির এই উৎকণ্ঠার জবাবে ছেলেটি একটু হাসে। হাঁটতে তার কষ্ট কি-না, কিংবা গ্রাম্য পথঘাটে সে কতোটা অভ্যস্ত—এই হাসিতে তার কিছুই বোঝা যায় না।

খাদেম মৌলবি চিৎকার করে আজকের সভায় সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বক্তৃতার প্রায় পুনরাবৃত্তি করে। তার পেছনের সঙ্গীদের সবাই আজ মুগ্ধ, আজকের জনসভায় বৃষ্টি স্থগিত রাখার কেরামতিতে তাদের বিস্ময় ও ভক্তির প্রবল তোড় খাদেম মৌলবির মাধ্যমে প্রচারিত প্রধান বক্তার উক্তি কোথায় ভাসিয়ে দেয়! এই ভক্তিচর্চার বিরতি ঘটে শিমুলতলায় পৌঁছুলে। শিমুলতলায় ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে কে যেন রাস্তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। লোকটির নিচু গলার প্রশ্নের জবাবে খাদেম মৌলবি তার বক্তৃতা পুনর্প্রচারের স্বর অব্যাহত রেখে বলে, 'অজিতকে তো প্রফুল্লবাবুই সঙ্গে নিলো।' লোকটি তবু দাঁড়িয়েই থাকে। মুংলু তার সামনে এলে বীরেন পণ্ডিত জিজ্ঞেস করে, 'মুংলু না? অজিত তো বাড়িত কোনো খবর পাঠালো না। বাবা তুই ঠিক জানিস, ওকি উনাদের সঙ্গেই গেছে?'

তার এই প্রশ্নের জবাব দেয় খাদেম মৌলবিই, অনেকটা এগিয়ে গেলেও এবং তার গতি এতোটুকু শিথিল না করলেও তার চড়া গলা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়, 'আরে পণ্ডিতমশাই, বললাম তো!'

মুংলুর খালি হাই ওঠে। সকাল থেকে এই সভার আয়োজন করার কাজে সে ব্যস্ত, একটা মিনিট বিশ্রাম জোটেনি। বৃষ্টিটা না থাকলে রাস্তার ওপরেই একটুখানি বসে নিতে পারতো। শিমুলতলা থেকে বাঁদিকে জমির ভেতর চওড়া আলের ওপর দিয়ে একটুখানি হাঁটলেই বীরেন চক্রবর্তীর বাড়ি, একবার ভাবে পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে তার বাড়িতে গেলেও তো চলে। কিন্তু পণ্ডিত হঠাৎ হন হন করে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। অন্ধকারে তার ধুতি হলদেটে দ্যাখায়। আবার, কয়েক পা যেতে না যেতে তার গতি একেবারেই নিস্তেজ হয়ে এলে হলদেটে ধুতি ময়লা হয়, কালচে হলদে ধুতির ছায়ায় তার ফর্সা পা'ও কালো হয়ে আসে। লোকটা তার বাড়ির সামনে পুকুরের ধারে পৌঁছুলে তারই লালিত মাঝারি আকারের ১টা মাছ লাফ দিয়ে ওপরে উঠে ডাঙায় অন্ধকারে, এমন কি বীরেন পণ্ডিতের খাটো ধুতি ও লম্বা পায়ের রঙে বিজলির একটুখানি আভাস দিয়ে ফিরে যায় পানির ভেতর। মুংলু হঠাৎ জোরে হাঁটতে শুরু করে, বেশ কয়েক পা হাঁটার পর সে বুঝতে পারে যে, বীরেন পণ্ডিতের বাড়ি-ফেরা দেখতে দেখতে সে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিলো।

২

আগুনের লকলকে শিখায় ফর্সা মুখ লালচে দ্যাখালেও ছেলেটিকে মুংলু ঠিক চিনতে পারে।

ভাঙামোড় হাটে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিলো জিতেনলাল আগরওয়ালার কাপড়ের গদিতে। বিলাতি কাপড় পোড়াবার মচ্ছবে মুংলুও সামিল হওয়ায় ছেলেটিকে দ্যাখার প্রতিক্রিয়া তার চাপা পড়ে আগুনের আঁচ-তপ্ত বুকের অনেক ভেতরে। 'বন্দেমাতরম', 'আল্লাহু আকবর, 'জ্বালাও, শালার সব কাপড় জ্বালায়া দাও', প্রভৃতি ধ্বনিতে অগ্নিশিখা উৎসাহিত হয়, জিতেনলাল নিজে ও তার ছেলে মতিলাল এবং তার কয়েকজন কুলি হাতজোড় করে, কখনো একটু ধমকে, কখনো করুণা ভিক্ষা করে, এমন কি বিনা দামে বিলাতি কাপড় দেওয়ার লোভ দেখিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলো। লাভ হয় না। আগুন বেশ ভালোভাবে জ্বলে ওঠার পরও অগ্নিযজ্ঞে নিজের নিজের সাধ্যমতো বিনীত অবদান রাখতে সবাই তৎপর। জিতেনলালের এক বাঁধা-কুলি মরিয়া হয়ে বলে, 'আরে সাহার আড়ত কি তোমাদের চোখে পড়লো না? ঐ আড়তের মধ্যে পরশোঁ ভি কাপড়ের গাঁট আসলো, পাঁচ পাঁচটো বয়েল গাড়ি ভরকে মাল নামালো, সবই তো বিলাইতি কাপড়!' জিতেনলাল তাকে জোরে ধমক দিয়ে থামিয়ে উৎসাহিত জনতার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে মিনতি করে, 'বাবাসকল, মহাত্মাজীর ফান্ডে তো হাম ভি বিশ রুপেয়া দিয়া! সাহা তো লিজে এসে চাঁদার রশিদ কেটে দিলো!'

এসব বলার আগেই কিন্তু প্রভাত সাহার আড়তের আশেপাশে লোকজন জমে গেছে। এদের মধ্যে খদ্দরওয়ালা স্বেচ্ছাসেবকও অনেক। কিন্তু প্রভাত হলো অমূল্য সাহার খুড়তুতো দাদা; একই বাড়ি, ঠাকুরদার আমলের কোনো কোনো ব্যবসাও নাকি এখন পর্যন্ত একসঙ্গেই রয়েছে। এই আড়তটি অবশ্য প্রভাত সাহার সম্পূর্ণ নিজের। আবার অমূল্য সাহাও আজ হাটে নাই। তবু হাজার হলেও সে কংগ্রেসের লোক। কয়েকদিন আগে বাঁশদহ প্রাইমারি স্কুলের সামনে মিটিঙে হাটে হাটে বিলাতি কাপড় পোড়াবার জন্যে অজিত দত্তের প্রস্তাবের বিরোধিতাও সে করেনি। আজ তারই বাড়ির দোকানে আগুন দিতে এইসব কর্মী ইতস্তত করছে, এমন সময় ৪/৫ জন হাটুরে মানুষ আচমকা ঢেউয়ের মাঝে এসে চিৎকার করলো, 'এক যাত্রাত পৃথক ফল হয় ক্যান?' এদের হাতে আগরওয়ালার গদির আগুন থেকে ধরিয়ে-নেওয়া জ্বলন্ত কাঠ।

প্রভাতচন্দ্র নিজের নামকরণ সার্থক করে ফ্যাকাশে চেহারায় দাঁড়িয়েছিলো আড়তের সামনে। খদ্দরের বেনিয়ান ও খাটো ধুতি পরা লম্বা চওড়া মানুষটি হাতজোড় করে বিড়বিড় করছিলো, 'বাবারা, আমার গুদামে তোমরা ঢুকে দ্যাখো; এক টুকরা বিলাতি ন্যাকড়া পেলেও আমার শরীরে আগুন দিও। এই আড়তেই আমার চিতা হোক, আমার দুঃখ নাই! তোমরা খালি একবার পরীক্ষা কর্যা নাও।'

তার কথা নিচুস্বরের, জোরে কথা বলার অধিকার, দায়িত্ব ও ক্ষমতার পারিবারিক হিস্যা তার ভাইয়ের দখলে। কিন্তু এমন অবস্থাতেও ধীরে সুস্থে এমন ভঙ্গিতে সে কথা বলে যে ইচ্ছা না থাকলেও বিশ্বাস করতেই হয়। বিলাতি কাপড়ের বড়ো পাইকার প্রভাত সাহার আড়তে বিলাতি কাপড় নাই শুনে লোকজন মন খারাপ করে। এর মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, 'শালার গদিৎ মুত্যা দ্যাও। পয়সার পোকা, গুয়ের মধ্যে জিভ দিয়া শালা পয়সা তোলে!' তার কথায় কেউ কেউ সায় দেয়, 'মোতো, সোগলি মোতো!' কিন্তু কারো প্রস্রাবের বেগ না থাকায় কিংবা আগুনের আঁচে সবার তলপেট শুকিয়ে গিয়েছিলো বলে ঐসব নির্দেশ ও সংকল্পের বাস্তবায়ন ঘটে না। বরং ঐ ঘোষণাকারীর উৎসাহে উদ্বুদ্ধ এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক আগরওয়ালার গদি-থেকে-নিয়ে-আসা এক গোছা পাটখড়ির জ্বলন্ত টুকরা ছুঁড়ে দেয় গুদামের টিনের বেড়ায়। টিনে আগুন ধরে না, পাটখড়ির আগুন মাটিতে লুটিয়ে জ্বলতে থাকে মাথা নিচু করে। তখন হলো কি, ঐ পদ্য-বলা শহুরে বালক ধুলায় লুণ্ঠিত একটি জ্বলন্ত পাটখড়ি নিয়ে ছুঁড়ে মারে গুদামের বন্ধ জানলার দিকে। বন্ধ জানলায় ধাক্কা খেয়ে সেটা কিন্তু নিচে পড়ে যায় না, জানলার কাঠে আগুন না লাগলেও জ্বলন্ত পাটখড়ি নিজে নিজেই পুড়তে থাকে জানলার বাইরের দিককার তাকের ওপর।

এটা হলো অমূল্য সাহারই খুড়তুতো ভাইয়ের দোকান, অমূল্য সাহা তাদের নেতাগোছের মানুষ এবং খাদেম মৌলবির বন্ধু—এই গুদামে আগুন দেওয়া যায় কি করে?—এইসব ভাবনা মুংলুকে নিশ্চল দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু পদ্য-বলা ফর্সা বালকের ঐ জ্বলন্ত পাটখড়ি নিক্ষেপে তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে এবং

ঐসব ভাবনাসুদ্ধ সমস্ত ভাবনারহিত হয়ে জানালার তাকে সে ছুঁড়ে ফেলে তার হাতের চটের থলেটি। এই থলেতে তার জায়গীরবাড়ির মাছ নিয়ে ফেরার কথা। চটের থলেতে আগুন ধরে যায় দপ করে এবং পদ্য-বলা ছেলে আর তার চটের থলের আগুন অভিন্ন শিখায় সেঁটে যায় জানলার কাঠে। জিতেনলালের গদি থেকে নিয়ে আসা আগুনে জ্বলে উঠলো প্রভাত সাহার গুদাম। এইভাবে ২জন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর মধ্যে গড়ে ওঠা উষ্ণ অগ্নিবন্ধনের আঁচে তেজ পেয়ে জিতেন্দ্রলাল আগরওয়ালা ও প্রভাতচন্দ্র সাহার কর্মচারীরা যথাক্রমে হিন্দি ও বাংলায় জানিয়ে দেয় যে, বিলাতি কাপড় তো বিক্রি হচ্ছে হাটের উত্তরদিকে, খালের ধারে কাপড়হাটিতে।

খালের ধারে এক সারি তরকারির দোকান, ছোটো ছোটো খড়ের চালা, এগুলোর কোনো বেড়াও নাই। বলতে কি, ঐসব কাপড়ওয়ালারা শীতকালটা জুড়ে তরকারিই বেচে। এই সময়টা লাউ আর ঝিঙা ছাড়া অন্য তরকারি তেমন হয় না বলে অমূল্য সাহার ঘর থেকে টাকা নিয়ে ওরা কাপড় কেনে প্রভাত সাহার আড়তে গিয়ে। এই দোকানদাররা হাটের ঐদিকে আগুন দেখে নিজের নিজের কাপড়ের গাঁট বাঁধাছাদা করছিলো কেটে পড়ার তালে। কিন্তু স্বরাজ ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকদের হাত থেকে রেহাই নাই। দোকানদাররা তারস্বরে চ্যাচায়, 'বাবুরা, আমরা গরিব মানুষ, বাবা! আমাগোরে সব্বোনাশ হয়া যাবো! মাপ করেন বাবা!'

এর মধ্যে এসে পড়েছে অজিত, তার সঙ্গে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। অজিত বলে, 'আপনারা বিলাতি কাপড় বেচেন কেন?'

এক দোকানদার বলে, 'বাবা, কালই বাবুর আড়তের সরকারবাবু কলো, কম দামে ছাড়তিছি, কাপড় নিয়া যাও।'

ততোক্ষণে আগুন ধরে গেছে। এইসব দোকানদারদের প্রায় সবাই মুংলুকে চেনে। তার দিকে তাকিয়ে একজন জানায় যে, প্রভাতবাবুর আড়তে ইঁদুরের উৎপাত, তাই আড়ত সাফ করা দরকার বলে কম দামে কাল সব কাপড় ছেড়ে দিয়েছে। এরা টাকাও নিয়ে এসেছে অমূল্য সাহার ঘর থেকে ; এখন এই টাকা শোধ দেবে কোত্থেকে, আজ এরা খাবেই বা কি?

মুংলু তাদের কাঁদো কাঁদো চোখের স্থগিত অশ্রুতে দ্যাখে, এরা সব শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এদের শূন্য হাতের সঙ্গে শূন্য মুখের ব্যবধান আরেকটু বাড়লো। তার এই ছবি দ্যাখায় বাধা পড়লো ফর্সা শহুরে ছেলেটির এই বাক্যে, 'আপনারা টাকা ধার করে বিলাতি কাপড়ের ব্যবসা করেন! আপনাদের তো ঘর পোড়ানো দরকার ছিলো আরো আগে!' এই ছেলেটির কথার ঝাঁজে মুংলুর নিজের চোখই খচখচ করে, কিন্তু বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে না ফেললে বোধহয় আরো ভয়াবহ, আরো মারাত্মক সর্বনাশ হয়ে যাবে। অমূল্যবাবু, খাদেম মৌলবি, অজিতবাবুর মতো এইটুকু ছেলেটিও দেশ সম্বন্ধে কতো জানে, এই নিয়ে এদের ভাবনা কতো! তার ধরাছোঁয়ার বাইরে এতো সব বড়ো বড়ো ভাবনা তাকেও যদি

কাতর করে—এই ভয়ে এবং যদি কোনদিন কাতর না করে—এই উদ্বেগে মাথার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় মুংলু হঠাৎ চিৎকার করে, 'গান্ধিজী কি'! এর জবাবে কেউ সাড়া না দেওয়ায় সে নুয়ে পড়ে না। কারণ এই আওয়াজে খুচরা দোকানদারদের জন্যে নিজের দরদ বোধ করার লজ্জার মোচন হয়। তার ধ্বনির ধাক্কায় আগুনের শিখা আরেকটু ওপরে ওঠে। অজিত চক্রবর্তী অবশ্য ফের নতুন করে স্লোগানের অবিরাম স্রোত বইয়ে দেয়। এই স্রোতোধারা বাধা পায় খাদেম মৌলবির বিরক্ত বাক্যে, 'এসব কি? এসব কি? ইয়ে সব কেয়া হো রহা?' বাংলা ও উর্দুতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেও তার প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ সবার কাছেই ঝাপসা। ফর্সা পদ্য-বলা শহুরে ছেলেটির দিকে হঠাৎ করে চোখ পড়লে তার প্রথম স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়ে, 'ওয়াহিদুজ্জামান, আগুন থেকে তফাৎ যাও। তফাৎ যাও। আজমল কৈ?'

আজমলকে মুংলু চেনে, খাদেম মৌলবির ছোটোভাই পোস্ট মাস্টারের ছেলে, প্রত্যেক বছর একবার বাড়ি আসে। কিন্তু আজ তো আজমলকে হাটে দ্যাখাই যায়নি। আর ওয়াহিদুজ্জামানের নাম শুনে মুংলু তার দিকে আড়চোখে দ্যাখে। সেদিন পদ্য বলার সময় মঞ্চে তার নাম হয়তো ঘোষণা করা হয়েছিলো, কিন্তু মঞ্চে যাই বলা হয় মুংলু সাধারণত তাতেই মুগ্ধ, সুতরাং কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করা তার পক্ষে কঠিন। এখন ছেলেটির নাম স্পষ্ট শুনতে পেয়ে মুংলু একটুখানি কুঁকড়ে গেলো, নামটা এমন যে নামের মালিকটি আরো অপরিচিত হয়ে যায়। তবে ওয়াহিদুজ্জামানকে নিয়ে ভাববার ঝামেলা থেকে এই মুহূর্তে সে মুক্ত ; কারণ খাদেম মৌলবি তাদের সবাইকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'অজিত, মুংলু, তোমরা এটা কি করতিছ বাবা? আগুন নেভাবার কোনো ব্যবস্থা করো না? আগুন নেভাও। আগুন নেভাও।'

'বিলাতি দ্রব্য তো আমরা বয়কট করছি কাকা! এরা সব বিলাতি কাপড় বেচছে।'

'আরে বাবা, কাপড় তো সব পুড়েই গেলো। ওদিকে আগরওয়ালার গদি তো শেষ! সাহার গুদামেও আগুন ধরে গেছে। আগরওয়ালার গদির আগুন এতোক্ষণে তোরাপ আলির দোকানে ধরেই গেলো বুঝি!'

হাটের ওদিকটায় আগুন ততোক্ষণে জোরেসোরেই ধরে গেছে। লোকজনের আগুন দ্যাখার ইচ্ছা ও আগুন থেকে বাঁচবার তাগিদ সমান প্রবল। তারা সব ছটফট করতে করতে দৌড়াদৌড়ি করছে। কিন্তু তাদের এই গতিময় তৎপরতায় আগুন দ্যাখার ইচ্ছাটা মিটলেও এ থেকে বাঁচার তেমন নিরাপত্তা নাই। তাদের দৌড়ের গতি ও প্রকৃতি এমন যে ঘুরে ঘুরে বারবার কেবলি আগুনের নাগালের প্রায় ভেতরেই পড়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে এই এলোমেলো দৌড়ের ফলেই ১২ বছরের একটি বালক আগুনে পা দিয়ে ফেলে। আগরওয়ালার গদির আগুন তোরাপ আলি সাকিদারের মশলার গুদামে ছনের ছাদ চাটতে শুরু করেছে, বেশ ধিকি ধিকি ধরেছে, মনে হয় বড়ো গ্রাস দরকার হবে না, ছনের চালটা আগুন চেটে চেটেই

শেষ করে ফেলবে। সাকিদারের ৩ স্ত্রীর ১১ জন ছেলের ১০ জনই অস্থির হয়ে লাফালাফি করছে, একই জায়গায় তাদের এই তৎপরতায় ব্যায়ামের অতিরিক্ত কোনো ফল হচ্ছে না।

সুতরাং খাদেম মৌলবির নেতৃত্বে অজিত তার স্বেচ্ছাসেবকদের ৭/৮ জন থেকে ১০/১২ জনের একেকটি গ্রুপে ভাগ করে তাদের দাঁড় করিয়ে দেয় ৪র্থ সারিতে। ১ম সারিটি দাঁড়ায় খালের ধার ঘেঁষে, তারপর খুচরা দোকানদারদের খড়ের চালা পার হয়ে আরেকটি, ৩য় সারিটি অবস্থান নেয় আগরওয়ালার গদির কাছে এবং শেষটি আরেকটু দূরে প্রভাত সাহার গুদামের সামনে। ২য় সারির কর্মীরা নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে হাতে নেয় তরকারিওয়ালাদের পানিভরা মাটির হাঁড়িগুলো। কিন্তু তরকারি সবুজ ও সতেজ রাখার কাজে সেগুলো থেকে অনেকদিন থেকে পানি ব্যবহার করতে করতে হাঁড়িগুলো প্রায় সবই নাজুক হয়ে পড়ায় এবং সর্বোপরি বেকায়দায় ধরার ফলে অনেকগুলোই মটমট করে ভেঙে যায় ; তবে তার কয়েকটি থেকে কয়েক আঁজলা করে পানি খুচরা কাপড়ের দোকানের ভাগে পড়ে। তাতে আগুন নেভে না, বরং অল্প পানির থাপ্পড়ে আগুন রাগে ফুঁসে ওঠে। ২য় ও ৩য় সারির কয়েকজন কোনো নির্দেশের অপেক্ষা না করে মুদির দোকান, মনোহারির দোকান ও কামারের দোকানে হানা দেয় এবং সেসব ঘরের হাঁড়ি পাতিল বালতি সব বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো থেকে গুড়, চাল, ডাল, বাতাসা প্রভৃতি ফেলে দিয়ে কিংবা নিজেরাই মুখে দিতে দিতে এবং বাতাসা বা গুড়ের সঙ্গে বা গুড় ও বাতাসা বাদ দিয়ে চাল ডাল এমন কি মরিচ আদা রসুন পেঁয়াজ প্রভৃতি খেতে খেতে এবং ঐসব মিষ্টি, শস্য ও মশলা কুড়ানো বালকদের এলোপাতাড়ি মিছিল তৈরি করতে করতে তারা পৌঁছে যায় খালের ধারে। এর মধ্যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যুৎপন্নমতি শব্দটি কোনোদিন না শুনেও ঐ গুণের অধিকারী বলে তাদের মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে হাটের দক্ষিণ কোণে কুমারহাটির ছবি। ছটফট ও হায়-হায় করতে-থাকা কুমারদের সামনে থেকে মুহূর্তের মধ্যে তাদের হাতে উঠে আসে সদ্য-প্রস্তুত হাঁড়ি, কলসি, গোরুর জাবনা খাবার চারি, মালসা, সানকি, বদনা, এমন কি প্রদীপ জ্বালাবার বাসন পর্যন্ত। তবে কুমারদের কুমারী অর্থাৎ এখন-পর্যন্ত-অব্যবহৃত অনেকগুলি [পাত্র] আনাড়ি ও উত্তেজিত হাতে পড়ে ভাঙতে ভাঙতে পৌঁছে যায় খালের ধার পর্যন্ত। অক্ষত পাত্রগুলোর কয়েকটি ভাঙে খাল থেকে পানি ভরতে গিয়ে একটির সঙ্গে আরেকটির ধাক্কা খেয়ে এবং কয়েকটি ভাঙে স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন সারির ভেতর চালান দেওয়ার সময়। তবু শক্ত সমর্থ কয়েকটি কলসি পানিতে টইটম্বুর হয়ে খাল থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েক হাত পেরিয়ে অনেকটা পানি ছলকে ফেলে দিলেও শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় আগরওয়ালার গদি পর্যন্ত। ততোক্ষণে আগরওয়ালার গদির প্রায় সবটাই গিলে, পাশেই ওবিদ আলীর খড়ের চাল চেটেপুটে খেয়ে আগুন হামলে পড়েছে ভবেশ দাশের কাঠের দোকানে। এতোক্ষণে আগুনের নাশতা খাওয়া চলছিলো, এবার প্রধান খাদ্য পেয়ে

আগুন গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলো ; কারণ পিঠে বলো পুলি বলো ভাতের বাড়া নেই। কাঠ হল আগুনের ভাত, এই হাভাতে আগুনের বাড়া ভাতে ছাই দিতে দিতে সে নিজেই সব ছাই করে ফেললো। হাটের দোকানদারদের পুরনো এবং কুমারদের নতুন সমস্ত মাটির পাত্র আর একটিও আস্ত রইলো না, সমস্ত হাট জুড়ে পড়ে রইলো ছাই আর ছাইয়ের ভেতর খোলামকুচি।

পরদিন দুপুরে থানা থেকে ঘোড়ায় চেপে আসে দারোগাসায়েব, তার পিছে পিছে সাইকেলে ৩ জন লাল পাগড়িওয়ালা কনস্টেবল। এই পুলিশবাহিনী অকুস্থলে হাজির হলে জিতেনলাল আগরওয়ালা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু হাটের আশেপাশের গ্রামের লোকজন সব উধাও। অমূল্য সাহা, অজিত দত্ত ও খাদেম মৌলবির নামে ওয়ারেন্ট। বিরান পথে বাঁশদহ এসে পুলিশ শোনে যে অমূল্য সাহা তো তিনদিন হলো বাড়ি নাই।

খাদেম মৌলবি কিন্তু বাড়িতেই ছিলো। দারোগা সায়েব মুসলমান এবং পেশাগত কারণে হাফপ্যান্ট পরতে হলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী বলে তাকে উঠতেও হলো এই বাড়িতেই। খাদেম মৌলবির সঙ্গে তার আগে থেকেই আলাপ, মৌলবি বাড়িতে না থাকলেই লোকটা খুশি হতো। এখন বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে 'স্লামালেকুম দারোগা সায়েব' বলে সামনে দাঁড়ালে দারোগা কি করতে পারে? লোকটা একটু বিরক্ত, এইসব হুজুগের ভেতর যাওয়া কি খাদেম মৌলবির ঠিক হল? এসব হিন্দুদের চক্রান্ত এবং মুসলমান ছেলেদের নতুন শিক্ষালাভের ঝোঁকটা নষ্ট করে দেওয়াই এসবের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। বাড়ির সামনে স্কুলে-পড়া বেশ কয়েকটি ছেলেকে দেখে দারোগা অবশ্য তার মতামত ঘোষণা করে একটু নিচু ও বিরক্ত গলায়।

খাদেম মৌলবির খানকা ঘরে দারোগা সায়েবের এবং ঐ ঘরের চওড়া বারান্দায় ৩ জন কনস্টেবলের বিশ্রামের পরিপাটি ব্যবস্থা হল। খাসি জবাই করে তাদের সবাইকে খাওয়াতে খাওয়াতে বিকাল গড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে পুলিশ কনস্টেবলরা গিয়ে অজিত দত্তকে ধরে আনে কোমরে দড়ি বেঁধে। তার বেশ কয়েক হাত পেছনে বীরেন পণ্ডিত। বীরেন পণ্ডিতের ডান হাতে শক্ত করে ধরে-রাখা তার ৮/৯ বছরের মেয়ে সাবিত্রীর হাত। মেয়েটা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে যা বলছে তা এমনিতে বোঝার কথা নয়, কান্না তার কথাকে একরকম চাপা দিয়ে রাখে, কিন্তু দাদার ন্যাওটা বলে এখানে সে এর মধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছে বলে তার 'ও মেজদা, মেজদা, মেজদাকে নিয়ে যাও কেন?'—চিৎকার জায়গাটিতে হঠাৎ নীরবতা চাপিয়ে দেয়। তার ছুটে আসার বেগ সামলাতে গিয়ে বীরেন পণ্ডিতকে বেশ বেগ পেতে হয়, কারণ লোকটা তার কোমরে-দড়ি-বাঁধা ছেলের সঙ্গে দূরত্ব এতোটুকু কমাবে না বলে সংকল্পবদ্ধ। নিজের চোখের জল প্রত্যাখ্যান করার জেদে সে চোখ মুছতে পারে না, চোখের

জলের নুন বাইরে বেরুতে না পেরে উপায় না দেখে ঢোকে তার গলায়। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে গালাগালি করা আপাতত তার পক্ষে অসম্ভব।

মুংলু পরামাণিক ততোক্ষণ বেশ ধাপধুপ করেই চলাফেরা করছিলো ; খাসি জবাই হওয়ার পর থেকে খাবার পরিবেশন করা পর্যন্ত তার তৎপরতা চলছিলো একটু বেশিরকম তেজের সঙ্গে। বীরেন পণ্ডিতের দিকে, কিংবা তার চেয়েও বেশি তার কালো মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে তার ঐ চোখজোড়া ভরে লোনাজল পড়লে সাবিত্রীর মুখ আবছা হয়ে আসে। মেয়েটির 'মেজদা' ডাক তার ঐ লোনাজলের ভেতরে তার বড়দার ছায়া ফেলে; বীরেন পণ্ডিতের বড়ো ছেলে শংকর চক্রবর্তী বছর দুয়েক আগে ভেদবমি হয়ে মারা গেছে। শংকর চক্রবর্তীর লম্বাটে রোগা দেহ, এবং বীরেন পণ্ডিতের চোখের জল ও জড়ানো স্বরে সাবিত্রীর 'মেজদা' বলে হামলানো মুংলুর চোখের সামনে সব ঝাপসা করে তোলে।

তখন অবশ্য বিকাল গড়িয়ে গিয়েছিলো, আষাঢ় মাসের আকাশ সেদিন সকাল থেকে মেঘশূন্য, সন্ধ্যার আগেকার অন্ধকার একটুখানি ধোয়া এবং সেই ধোয়া মোছা অন্ধকার বা ময়লা আলোতে মুংলুর ইচ্ছা করে বাপ ও মেয়েকে জড়িয়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কিন্তু এই অবেলায় ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে তাকে ঝামেলায় ফেলা ঠিক নয় এই বিবেচনায় এবং ওয়াহিদুজ্জামান ও আজমলের চোখে ব্যাপারটা কেমন বা ঠেকে—এই দ্বিধায় সে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। এবং বীরেন পণ্ডিত ও সাবিত্রীর এবং তার মৃত বড়দার জন্যে বেরিয়ে-আসা চোখের জল সে নিবেদন করে খাদেম মৌলবির দুঃখে।

গোরুর গাড়িতে খাদেম মৌলবির উঠতে উঠতে সন্ধ্যাই হলো। তা দারোগাও তাই চাইছিলো। কিন্তু শালার মেঘহীন আষাঢ়ের জ্যোৎস্না আউশের পাকা ধানে কালচে হলুদ তেল মিশিয়ে দিলে ধানখেতের ওপরকার শূন্যতাও ঐ রঙের আভায় চুপচাপ হাসে, দারোগার তাতে একটু ভয়ই করে। কোমড়-বাঁধা অজিতকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিলো, কিন্তু এই ভয়াবহ হাসিতে ঘাবড়ে যাওয়া দারোগা খাদেম মৌলবির একটু অনুরোধেই তাকে গোরুর গাড়িতে ওঠার অনুমতি দেয়। গোরুর গাড়ি চলতে শুরু করলে ওয়াহিদুজ্জামান হঠাৎ চিৎকার করে, 'নারায়ে তকবির!' এর জবাবে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের জটলা থেকে তেমন সাড়া না পেয়েও ছেলেটি তার স্লোগান রিপিট করে। এবার সবাই চিৎকার করে বলে 'আল্লাহু আকবর!' গোরুর গাড়ির ভেতর থেকে অজিত চক্রবর্তী হুঙ্কার দেয়, 'বন্দে মাতরম!' সবাই দ্বিগুণ বেগে সাড়া দিলে সে ফের বলে, 'মহাত্মা গান্ধি কি! মোহাম্মদ আলী কি!'—জবাবে 'জয়' বলতে বলতে মুংলু শোনে 'ভাইজান, বড়ো আব্বার জরদার কৌটা আমার হাতে! বড়ো আব্বার জরদা!'

এই উদ্বিগ্ন কথাগুলো আসছে পেছন থেকে, গোলাঘরের পাশে একটু আড়াল মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েরা। পুরুষ মানুষের দঙ্গল সামনে রেখে এই বাড়ির মেয়েরা এই প্রথম দাঁড়িয়েছে, তাদের আব্রু রাখা ও চোখের জল মোছার

জন্যে প্রায় সবারই ঘোমটা দেওয়া শাড়ির আঁচলে তাদের মুখ ঢাকা। কান্নার আওয়াজ চাপতে গিয়ে খাদেম মৌলবির জন্যে তাদের সমস্ত দুঃখ পরিণত হচ্ছে নিজেদের গলা ও চোখের কষ্টে। শ্লোগানের আওয়াজের সুযোগ না নেওয়ায় গলা ও চোখ—এমনকি কারো কারো কানের কষ্ট পর্যন্ত বাড়ে এবং মনোযোগের বেশিরভাগ সেদিকেই থাকার ফলে ফোঁপানির সঙ্গে খাদেম মৌলবির জন্যে কষ্টও তাদের হতে থাকে ঝাপসা থেকে আরো-ঝাপসা। আবার সেখান থেকেই একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর আসছে দেখে পুরুষরা সবাই সেদিকে তাকায় এবং চোখে-মুখে কাপড় না-দেওয়া একমাত্র মেয়েটি কান্না-জড়ানো গলায় ফের বলে, 'ভাইজান! বড়ো আব্বার জর্দা!' শামসুল হকের ছেলে আজমল মেয়েদের একটু কাছাকাছিই ছিলো, ব্যস্ত হয়ে ওদিকে গেলে মেয়েটি তার হাতে তুলে দেয় জর্দার কৌটা। আজমল এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো, মুংলু একটু এগিয়ে গেলে সে জর্দার কৌটা তুলে দেয়—মৌলবির জর্দার কৌটা।

গোরুর গাড়ি ততোক্ষণে উঠে গেছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় ; দৌড়ুতে গিয়েও হয়তো পেছনে দাঁড়ানো সরকারবাড়ির মেয়েদের সম্মানে মুংলু লম্বা পা ফেলে জোরে জোরে হেঁটে চলে যায় গোরুর গাড়ির দিকে।

খাদেম মৌলবির হাতে জর্দার কৌটা পৌঁছে দিয়ে মুংলু ফিরে আসতে না আসতে মেয়েরা সব ঢুকে গেছে বাড়ির ভেতর। আজমলের বোনটিই কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক আগের জায়গাতেই। পাশে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওয়াহিদুজ্জামান তাকে কি যেন বলছে। এতো কাছাকাছি দুজনকে দেখে মুংলুর পা হঠাৎ গেঁথে যায় মাটির সঙ্গে। স্পষ্টভাবে সে কিছু ভাবে না, কেবল এই ছেলেটির ফর্সা মুখ ও মেয়েটির ফর্সা মুখ জোড়ামুখের শক্তিতে ওর নিজের কালো ঢ্যাঙা গতরটিকে আরেকটু নুইয়ে দেয়। জেবুন্নেসাকে মুংলু আজ কতো বছর পর দেখলো! এরা বছরে একবার করে বাড়ি আসে, কিন্তু পাঁচ ছয় বছর হলো মেয়েটিকে সে দেখতে পায়নি। লাল পাছাপেড়ে শাড়ি-পরা জেবুন্নেসা ও সাদা পায়জামা-পরা ওয়াহিদুজ্জামান একটু দূর থেকেই তাকে ধাক্কা দিলে মুংলু ছিটকে হাজির হয় দহলিজের সামনে, সেখানে লোকজন জুমাঘরের দিকে যাচ্ছে। মুংলু মাগরেবের নামাজ পড়তে না গিয়ে তাকিয়ে থাকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার দিকে। গোরুর গাড়িটা আর দ্যাখা যায় না। পেছনে হাত দিয়ে সাইকেল ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে পুলিস কনস্টেবল, হলদে জ্যোৎস্নায় লাল পাগড়ির রং পাল্টে গেলেও পুলিশ বলে তাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে।

৩

সেরপুরের পোস্ট মাস্টার এম. শামসুল হক খবর পেয়ে বাড়ি এসে মিইয়ে যায়। একজন গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট, তার বড়োভাই যদি সিডিশন কেসে পড়ে তো না হলেও তার সার্ভিস রেকর্ডে কালো দাগ পড়তে কতোক্ষণ? আবার এখানে তার

পৌঁছুবার আগেই খাদেম মৌলবির গ্রেফতারের পরেকার থমথমে ভাবটি ২/৩ দিনেই কাটিয়ে উঠে বাড়িটা তখন উৎসবমুখর হয়ে ওঠায় শামসুল হকের উদ্বেগ ও দুঃখ উপচে ওঠে তার অস্বস্তি। বুড়ো মানুষের মৃত্যুর পর চেহলাম পর্যন্ত আসতে আসতে শোক যেমন পৌঁছে যায় উৎসবে, খাদেম মৌলবির গ্রেফতার এই কয়েকদিনেই এখন গ্রামের ছটফটে গৌরবের কারণ। বড়োভাইয়ের গ্রেফতারের সময় হাজির থাকলে বরং আর দশজনের সঙ্গে দুঃখটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করা যেতো ; সেটি তো হলোই না, আবার এই মচ্ছবে শামিল হওয়া কি তার মতো গবর্নমেন্ট সার্ভিসের লোকের মানায়, না কি এটা তার পক্ষে নিরাপদ?

শামসুল হক বাড়ি এলে যে ধুম পড়ে, আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে বাড়ি ভরে যায়, চাকরি থেকে শুরু করে ইউনিয়ন বোর্ডের ইঁদারা খোঁড়ার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের স্যাংশনের তদবির শুনতে শুনতে সুখের ক্লান্তিতে শামসুল হককে সশব্দ হাই তুলতে হয়—সবই আছে, কিন্তু এবার সব কিছুর সঙ্গে গাঁথা থাকে খাদেম মৌলবির গৌরব। খাদেম মৌলবির ডাকে কে কতো বেশি সাড়া দিয়েছে, ভাঙামোড় হাটে অঞ্চলের নেতাদের মধ্যে একমাত্র উপস্থিত খাদেম মৌলবি অগ্নিযজ্ঞে কি ভূমিকা পালন করেছে এবং সেখানে ঐ চাকরির মতো বা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক রাস্তা কি ইঁদারা তৈরির গঠনমূলক কাজে তদবিরকারীর ভূমিকা সম্বন্ধে শুনতে শুনতে শামসুল হকের হাই তোলা তো দূরের কথা নীরব নিশ্বাসও বন্ধ হবার উপক্রম ঘটে। খেলাফত আর স্বদেশীর তোড় এমনি যে এসব বিষয়ে তার বীতরাগ একদিনেই অসন্তোষ এবং দুদিনেই পরিণত হলো ঘোরতর ভয়ে।

কিন্তু ভয়ের কথা সে বলবে কার কাছে? ছেলের সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক কোনো দিনই ছিলো না, বাপের আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে তার উপেক্ষা না হলেও উদাসীনতা শামসুল হকের অনেকদিন থেকেই মন খারাপ করার একটি কারণ। তবে পরম সৌভাগ্য, আজমল হক এসবের মধ্যে নাই। বরাবরের মতো বেশিরভাগ সময় সে কাটায় বই নিয়ে। এই হৈচৈয়ের মধ্যেও নেলসনের দুটো চ্যাপ্টার ভালো করে পড়ে এখন রিভিশন দিচ্ছে। জিওমেট্রির থিওরেম মুখস্থ করে চলেছে একটার পর একটা।

আউট বুক, বিশেষ করে নাটক-নভেল পড়া শামসুল হকের পছন্দ নয়, তবে স্কুলের হেডমাস্টারের কথা শোনাবার পর আজমলের মাঝে মাঝে ইংলিশ নভেল পড়ায় সে বাধা দেয় না। সায়েবদের ভাষাটা রপ্ত করতে হলে এসব বরং হেল্পই করে। বাড়ি আসার সময় শামসুল হক গত কয়েক দিনের *দি স্টেট্‌সম্যান* নিয়ে এসেছে; ইংরেজি শিখতে হলে স্টেট্‌সম্যানটা খুব কাজে আসে। আজমল হক ইংলিশ গ্রামার আর জিওমেট্রি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে স্টেটসম্যানের বাসি সংখ্যাগুলো সবই পড়ে ফেলছে। না, আলহামদোলিল্লাহ, ছেলেটা তার এই হুজুগে পড়েনি! আজমল হক তার মায়ের ন্যাওটা হওয়ায় এবং বাপের আত্মীয়স্বজনের চেয়ে নানাবাড়ির দিকে তার ঝোঁকটা একটু বেশি থাকায় শামসুল হকের ভেতর স্ত্রীর প্রতি এক ঝলক ভালোবাসা ছলকে উঠলো।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অগ্রন্থিত ছোটগল্প
চিরায়ত সাহিত্যের স্কুলপাঠ্য সংস্করণ
ছোটদের জন্য লেখা
কবিতা
অনূদিত রচনা
অসমাপ্ত উপন্যাস

অগ্রন্থিত ছোটগল্প

সন্তু : *দৈনিক আজাদ*-এর ছোটদের পাতা "মুকুলের মহফিল" ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৮, পৃ. ৮ সদস্য নম্বর ২৩৩৮৪। ইলিয়াসের বয়স তখন ১৫। বগুড়া জেলা স্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়েন। *লিরিক* পত্রিকার সাক্ষাৎকারে যে যতীন নাপিতের প্রসঙ্গ এসেছে এই গল্পে তারই চিহ্ন দেখা যায়। ছাপা হলে গল্পটি যতীনকে সম্ভবত পড়েও শোনানো হয়েছিল।

ঈদ : *দৈনিক আজাদ*-এর "মুকুলের মহফিল"-এ ২৭শে এপ্রিল ১৯৫৮, পৃ. ৭। যদিও *লিরিক*-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস বলেছেন যে "মুকুলের মহফিল"-এ কয়েকটি গল্প ছাপা হয়েছিল, ন্যাশনাল আর্কাইভে ১৯৫৮-৫৯-এর *আজাদ* পত্রিকা ঘেঁটে এই দুটো গল্পই পাওয়া গেল।

বংশধর : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত মাসিক *সওগাত*-এর কার্তিক ১৩৬৬ (১৯৫৯), পৃ. ১৭-২০।

তারাদের চোখ : মাসিক *সওগাত*, পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০), পৃ. ১৩-১৬।

অতন্দ্র : সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল*-এর ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৬৮ (১৯৬১) পৃ. ১৭-২৪। সে সময় ইলিয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা

বিভাগে প্রথম বর্ষের এবং এফ.এইচ. হলের আবাসিক ছাত্র। জলবসন্তে আক্রান্ত হলে তাঁকে কিছুদিন মিটফোর্ড হাসপাতালে থাকতে হয়। সেখানকার পটভূমিই ব্যবহৃত হয়েছে এই গল্পে। তৎকালীন স্বনামধন্য পত্রিকা *সমকাল*-এ প্রকাশিত হওয়ায় ইলিয়াস বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

স্বগতমৃত্যুর পটভূমি : সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল*-এর ৫ম বর্ষ ৯ম-১১শ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ (১৯৬২)। আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত গল্প-সংকলন *সাম্প্রতিক ধারার গল্প*-এ (১৯৬৪) তা সংকলিত হয়। এছাড়া কোলকাতা থেকে ময়ূখ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণবেশ সেন সম্পাদিত *বাংলাদেশের গল্প* সংকলন-এ (১৩৭৯) অন্তর্ভুক্ত হয়।

নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ : আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত *কণ্ঠস্বর* জানুয়ারি ১৯৬৫-র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

চিলেকোঠায় : মুহাম্মদ মুজাদ্দেদ ও সৈয়দ ইকবাল রুমী সম্পাদিত পত্রিকা *আসন্ন*-এ (মার্চ ১৯৬৯) প্রকাশিত। এই গল্পে ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের একটি প্রাথমিক পরিকল্পনার সন্ধান মেলে।

পরিচয় : নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত এবং হেলাল আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত পত্রিকা *উত্তরকাল*-এ (জানুয়ারি ১৯৭৮) ছাপা হয়। এই গল্পেও *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের প্রস্তুতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

চিরায়ত সাহিত্যের স্কুল-পাঠ্য সংস্করণ : এই নাতিদীর্ঘ লেখাগুলো সম্ভবত অষ্টম শ্রেণীর দ্রুতপঠন টেক্সট হিসেবে লেখা হয়েছিলো। অধ্যাপক শফিউল আলম জানান যে এর অন্তত একটি "হেক্টর উপাখ্যান" প্রকাশিত হয় *সাহিত্য মঞ্জুষা* (পূর্বাচল প্রকাশিত দ্রুতপঠন সহপাঠ) শীর্ষক গ্রন্থে (১৯৮২)। প্রতিটি গল্পের সঙ্গেই সংক্ষেপে কাহিনীর এবং সেই সঙ্গে অধিকাংশ গল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং লেখকের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। সবশেষে শিক্ষক নির্দেশিকা, অনুশীলনী, প্রশ্ন ইত্যাদি সন্নিবেশ করে পুরোপুরি স্কুলপাঠ্য বই হিসেবেই লেখাগুলো ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো। তবে অনুশীলনী ও প্রশ্ন রচনার ভার ছিলো অধ্যাপক শফিউল আলমের ওপর।

ছোটদের জন্য লেখা : এই লেখাগুলিও স্কুলপাঠ্য হিসেবে ছাপা হয় ৪র্থ শ্রেণীর টেক্সট বই *আমার বই*-এ। অন্য আরো যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা হলেন আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, মাহবুব সাদিক, শামসুল কবীর ও শফিউল আলম। টাইপ করা কাগজে রচনাকাল উল্লেখ নেই। তবে অনুমান করা যায় এগুলো আশির দশকের শেষভাগে লেখা হয়েছিল।

কবিতা

স্বপ্নে আমার জন্ম : আসাদ চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল সম্পাদিত *স্বাক্ষর*-এর তৃতীয় সংখ্যায় (১৯৬৫) প্রকাশিত। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি পত্রিকায় এই কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। এদের একটি মাহবুব-উল-করিম সম্পাদিত এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত *ত্রি ধারা* (১৯৬৭) বর্ষপূর্তি ও কবিতা সংখ্যায়। এই কবিতার আঙ্গিকে কংক্রিট কবিতার, বিশেষ করে ডিলান টমাস, ই. ই. কামিংস-এর কাঠামো নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

লাশ : *স্বাক্ষর*-এর চতুর্থ ও শেষ সংখ্যায় (১৯৬৭) প্রকাশিত। এই সংখ্যার সম্পাদক রফিক আজাদ ও রণজিত পাল চৌধুরী এবং প্রকাশক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। ইলিয়াসের টাইপ-করা কাগজে এই কবিতার রচনাকাল ১৯৬৬ লেখা হয়েছে।

বৃষ্টির পর : *স্বাক্ষর* পত্রিকার চতুর্থ ও শেষ সংখ্যায় (১৯৬৭) প্রকাশিত। সম্ভবত এই কবিতায় আরো চারটে পংক্তি ছিলো। তিনটে আমার মনে পড়ছে : "নীলার জন্যে মিন্টু যেমন গোলাপ এনে দিতো/অক্টোবরের হাওয়ায় শিমূল জীবনমরণ কাঁপে/আমার কবর শিহরিত আজ সাধ-স্মৃতির উত্তাপে।" ছন্দ, মেজাজ ইত্যাদি নিয়ে এই পংক্তিগুলোর সঙ্গে "বৃষ্টির পর" কবিতারই বেশি মিল। কোনো কারণে হয়তো চূড়ান্ত খসড়ায় এদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

না : এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত *লিরিক : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* সংখ্যার (১৯৯২) ১৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, যদিও কবিতাটি লেখা হয়েছে ১৯৬৭ সালে। ইংরেজ কবি টেনিসনের The Lotos Eaters কবিতার একটি চরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইলিয়াস লেখেন এই কবিতা। খসড়ায় একই ধরনের আরো চারটে পংক্তি ছিলো :

"ক্লান্ত চোখে ক্লান্ত চোখের পাতা/তারো চেয়ে ক্লান্ত আমার পা/যে ঘর দেখি একটুখানি বসি?/জবাব আসে, 'না এখানে না।'" নতুন কিছু যোগ না হওয়ায় সম্ভবত চূড়ান্ত খসড়ায় এরা বাদ পড়েছে।

এলেমজির জন্য শোক : প্রয়াত মাহবুবুল আলম (জিনু)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই কবিতাটি ছাপা হয় ওসমান গণি সম্পাদিত পত্রিকা *বর্ণালী*র (এপ্রিল ১৯৭২) ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায়। কবিতার শিরোনামে জ-এ দীর্ঘ ই-কার ব্যবহৃত হলেও টেক্সট-এ হ্রস্ব-ই কার ব্যবহার করা হয়েছে। সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শিরোনামেও হ্রস্ব-ই কার দেওয়া হলো। এ ছাড়া তৃতীয় চরণে "শক্ত শিখা" মুদ্রণ প্রমাদ মনে করে "রক্ত শিখা" করা হলো।

হে নটরাজ এবার তোমার নাচন থামাও : দেওয়ান শামসুল আরেফীন এবং সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী সম্পাদিত *স্বপক্ষে* ১ম বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা (১৯৭৯)

পৃষ্ঠা ৫৩-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। মাহবুব আলম (জিনু)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই কবিতাটি রচিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে।

শোক সংবাদ : *উত্তরাধিকার* শহীদ দিবস সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৪) পৃষ্ঠা ২৫১-২৫২। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭৩ সাল।

ডিসেম্বরের বেলা : *লিরিক : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* সংখ্যায় (১৯৯২) : পৃষ্ঠা ২৮২ প্রকাশিত। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭৮ সাল।

গান : ১৯৮৫ সালের ডায়েরীর ৬, ৭, ৮, ৯ জুনের পাতায় ঘসামাজা করে লেখা।

ফাহিম : সেজো ভাই নূরুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ও নাজনীনের ছেলে ফাহিমের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের ডায়েরির পাতায় লেখা হয়েছে শিরোনামবিহীন এই কবিতা।

টুম্পারানী : ১৯৮৬ সালের ডায়েরীর ১৩ই মার্চের পাতায় নাজনীন ও নূরুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াসের মেয়ে টুম্পার ১ বছর বয়স পূর্তিতে লেখা।

ট্রয়ের রানী : ১৯৮৬ সালের ডায়েরীর সেপ্টেম্বর ২-৩ পৃষ্ঠায় শিরোনাম বিহীন কবিতার খসড়া। ইলিয়াসের স্ত্রীর বড় ভাই মোশাররফ হোসেন বিশ্বাসের মেয়ে পুনম ও রাতুলের উদ্দেশ্যে লেখা।

আমার রোগ : জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার সময় লেখা (১৯৯১)। *তৃণমূল : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* সংখ্যা (১৯৯৮) পৃষ্ঠা ২৯৪।

টুম্পারানীর জন্মদিনে : ভাইঝির জন্মদিন উপলক্ষে লেখা। প্রকাশিত হয় *তৃণমূল : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* সংখ্যায় (১৯৯৮) পৃষ্ঠা ২৯৪।

সর্দার আর্জান ও বাঘের কবিতা : কোলকাতায় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন (১৯৯৬) গায়িকা মৌসুমী ভৌমিক এবং বিবিসির সাংবাদিক নাজেশ আফরোজের ছেলে আর্জানকে নিয়ে লেখা এই কবিতা প্রকাশিত হয় *তৃণমূল : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* সংখ্যায় (১৯৯৮) : ২৯৬।

অনূদিত রচনা

আলো ভেঙে ভেঙে পড়ে ... : ডিলান টমাসের Light Breaks Where No Sun Shines কবিতার এই বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় *স্বাক্ষর* ২য় সংখ্যায় (১৯৬৪)। সম্পাদক : ইমরুল চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল।

হিপোক্রেটিসের শপথ : এই অনুবাদটি ইলিয়াস করেছিলেন চিকিৎসকদের একটি সংগঠন-এর সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত কোনো পুস্তিকার জন্য। রচনাকাল ১৯৯০।

ইলিয়াসের আর কোনো অনুবাদকর্মের কথা জানা যায় না। অনুবাদে তাঁর আগ্রহও ছিলো কম। তবে আর একটি কবিতা—সম্ভবত জেমস জয়েসের—আমার মনে পড়ে। কবিতাটি ছিলো এরকম : "ঢঙ ঢঙ ঢঙ গীর্জায় ঘন্টাধ্বনি/মা গো আমার বিদায় তোমাকে বিদায়,/পুরনো গীর্জা উঠোনে আমায় কবর দিও গো মনি/বোনটি যেখানে নির্জন নিদ্রায়।/আমার কফিন কালো রঙ দিয়ে আঁকা/পিঠের ওপর ছয় দেবতার পাখা/গাইবে দুজন এবং দুজন মগ্ন প্রার্থনায়/দুজন আমার আত্মাকে নিয়ে দূরে পাখা ঝাপটায়।" ষাটের দশকের মাঝামাঝি ইলিয়াসের কোনো নোট বইয়ে খসড়া আকারে দেখেছিলাম এই কবিতা। এরপর আর এর কোনো হদিস মেলেনি।

অসমাপ্ত উপন্যাস

বেহেশতের কুঞ্জি : ইলিয়াসের ফাইলে টাইপ-করা এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসের কয়েকটি পাতা পাওয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একটি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেও সম্ভবত তা শুরুর পর্যায়েই রেখে দেন। রচনাকাল অজ্ঞাত, তবে অনুমান করা যায় আশির দশকের শেষভাগেই তিনি এই রচনায় হাত দেন। বেশ কয়েকবার পরিমার্জনাকৃত হাতের লেখা এবং টাইপ-করা পৃষ্ঠা থেকে মনে হয় কাহিনীটি তিনি আয়ত্ত করার চেষ্টা করছিলেন।